বিচিত্র কথা

বিচিত্র কথা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

ভাদ্র ১৩৪৮

মূল্য আড়াই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

মুখবন্ধ

'বিচিত্র কথা' নাম দিয়া যে কয়টি প্রবন্ধ, সাময়িক পত্রিকা হইতে তুলিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইল, সেগুলির অধিকাংশই নানা সমস্যামূলক, এবং অপর দুই একটি জল্পনা ও কল্পনামূলক হইলেও, একই সাহিত্যিক মনের সাহিত্যিক চিন্তা সেগুলির মধ্যে নানা আকারে ব্যক্ত হইয়াছে। অতি-আধুনিক বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা ইহাতে আছে তাহার প্রসঙ্গ সাময়িক হইলেও আমি অনেক স্থলে সাহিত্যের মূল-নীতি ও আদর্শের আলোচনাও করিয়াছি; এজন্য এ গ্রন্থ এক অর্থে সাহিত্য-সমালোচনা-মূলকও বটে। 'সংবাদপত্র ও সাহিত্য', 'পুঁথির প্রতাপ', 'অতি-আধুনিক প্রতিভা' ও 'সাহিত্যের শিরঃপীড়া'—এই প্রবন্ধগুলিতে মুখ্যত সাহিত্যের আলোচনাই আছে।

'অতি-পুরাতন কথা' নামে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ গ্রন্থের আরম্ভেই স্থান পাইয়াছে, তাহাতে আমারই সাহিত্যিক ভাব-জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি; সেই হিসাবে ইহা কাহিনীর মতই পাঠ্য। তৎসত্ত্বেও আমি এই রচনাটিতে আর একটি কথা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা এই যে, জীবনের গূঢ়তর অর্থ জীবনের মধ্যেই নিহিত আছে, মানুষের প্রবুদ্ধ জীবন-চেতনায় তাহা যেমন ধরা পড়ে, তেমন আর কোথাও নহে; কেবল সাহিত্যেই তাহাকে কতক পরিমাণে—অপরোক্ষ নয়—পরোক্ষ করা যায়। এই প্রবন্ধ, জীবনের সহিত আমারই সেই সাহিত্যিক সাক্ষাৎকারের যেন একটি Testament, বা সাক্ষীর সাক্ষ্য। গ্রন্থের অন্যত্র আমার নিজের কথা যেখানে যেটুকু আছে, তাহাও আত্ম-প্রচার নয়—সাহিত্যিক আত্মনিবেদন হিসাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' নামক লেখাটিতে আমি যে সকল প্রশ্নের উত্থাপন ও যে ভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছি, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। যেহেতু ঐ সকল প্রশ্নের মূলে আছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত, অথচ তাহাতে তথ্য বা তত্ত্বের মর্য্যাদা-রক্ষা হয় নাই, অতএব—প্রশ্নগুলি গুরুতর বলিয়া—আমি তাহাদের প্রতিবাদমূলক আলোচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিলাম। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াই তাঁহার তুচ্ছতম মতামতেরও মূল্য অল্প নহে, এজন্য আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মত আমি তাঁহারও সেইরূপ উক্তির প্রতিবাদ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই।

'আধুনিক প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধটি এ সময়ে আবার প্রচার না করিলে ভাল হইত; কিন্তু অতি-আধুনিক বাংলাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতির কারণ-নির্ণয়ে ভবিষ্যতে কাজে লাগিতে পারে—অন্তত সে বিষয়ে, একালের একজন সেই স্রোতের বাহিরে বা বিরুদ্ধ মুখে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিয়াছিল, তাহা প্রচার থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া, আমি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে গ্রন্থমধ্যে স্থান দিয়াছি; যাঁহাদের অপ্রিয় বোধ হইবে, তাঁহারা যেন এগুলিকে বিচিত্র-কথা বলিয়াই মনে করেন।

নীলক্ষেত, রমনা।
ঢাকা, ১৩ই ভাদ্র,
১৩৪৮।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সূচী

অতি-পুরাতন কথা

অনেকদিন যাবৎ একটি কথা মনের ভিতরে উঁকি দিতেছে। কথাটি কি, তাহা আগেভাগে না বলাই ভাল ; বলিবার উপায়ও নাই, কারণ এ পর্য্যন্ত আমি তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই ; সেই জন্য আজ কথার ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছি।

কথাটা আর যাহাই হউক, ইতিহাস বিজ্ঞান বা অর্থনীতি ঘটিত নয়—ভূমিও নয়, ভূমাও নয়। তাই আজিকার এই অতি-প্রবল প্রগতির যুগে কথাটা বলিতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।

কিন্তু কথাটা আদৌ নূতন নহে, বরং বড় পুরাতন—উত্থাপন মাত্রেই আপনারা বক্তার প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজিকার দিনে, এই বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে, মানুষের মন যে এত 'প্রিমিটিভ' হইতে পারে, তাহা দেখিয়া আপনারা অনেকেই বিস্মিত হইবেন। যে প্রশ্ন বা সমস্যাকে মানুষ এতদিনে চিত্তপ্রকর্ষ-রূপ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কৃত করিয়াছে—সাবালক হইয়া ভূত ভগবান প্রভৃতির শান্তি করিয়াছে, সেই প্রশ্ন আজও কাহারও চিত্তে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পায়, ইহা ভাবিয়া "মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি"—স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু প্রাণ যে অবুঝ, তাহাকে নিবারণ করা দুরূহ। জানি সব, তবু জন্মগত ব্যাধির হাত হইতে নিস্তার নাই। যে প্রবৃত্তি অস্থিমজ্জাগত, সেই প্রবৃত্তিই প্রভু; প্রবৃত্তি সকলের এক নয়। প্রবৃত্তির বশেই মানুষ যত রকম কর্ম্মভোগ করে। প্রবৃত্তি বহুরূপী, তাই মানুষের অভিজ্ঞতাও বহুরূপ। আমি আমার অভিজ্ঞতার কথাই বলিব—যত বড় পণ্ডিত হউন, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই মানুষের স্বকীয়; যত বড় তত্ত্ব-কথাই হউক, কোনটাই আত্ম-নিরপেক্ষ নয়। আমার কথা আমারই, তবু পরকে বলিতে চাই কেন? না বলিতে পারিলে অস্বস্তি হয়—যাহারা বেশি কথা বলে, তাহাদেরই এই দশা। তবে মনকে চোখ ঠারিবার যুক্তির অভাব নাই। আমার যুক্তিও আছে। আমার মনে হয়, যে প্রবৃত্তি সার্ব্বজনীন, যাহার হাত হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই, তাহারই তাড়নায় জীবনের যে অভিজ্ঞতা আমার ঘটিয়াছে, স্থূলভাবে সকলেরই তাহা ঘটে ও ঘটিবে। সেই স্থূল দিকটা সকলেরই সমান। আমি সকলের সঙ্গে সেই সমভূমিতে অবস্থান করিতেছি। অতএব আমার মধ্যে সেই সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে যে বিশেষ ভাবনার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিগত হইলেও, সহানুভূতিযোগে সকলেরই বোধগম্য। ইহা তো অতিশয় সহজ কথা—এমনই করিয়া ব্যক্তি-সমবায়ে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমানুভূতি বা বোধ-সামান্যের উপরে যে আলাপ নির্ভর করে তাহার বিষয় পুরাতন হইয়া গিয়াছে—এমন কি, সেই সকল ভাবনাকে দুই চারিটি সূত্ররূপে বাঁধিয়া দেওয়াও হইয়াছে; তথ্যের অন্ত নাই, কিন্তু তত্ত্ব আর কয়টি? আমার কথাও নূতন নয়, অতিশয় পুরাতন, এবং পুরাতন বলিয়াই স্বজাতি মানবসমাজে তাহার আলোচনা করিতে বসিয়াছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জালিকাযন্ত্রে পরিস্রুত

হইয়া তাহাতে একটু নূতন রং ধরিয়াছে মাত্র ; সেই নূতন রঙের সাহায্যে পুরাতন হয়তো একটু চিত্তাকর্ষক হইবে, পুরাতনের প্রতি নূতন করিয়া দৃষ্টি পড়িবে—এই মাত্র ভরসা।

আজিকার দিনে, মানুষের মনে—শিক্ষিত, অর্থাৎ চতুর মানুষের মনে—জীবনের একমাত্র সত্য দাঁড়াইয়াছে, 'good living'। আর যাহা কিছু মতবাদ বা তত্ত্ববাদ—হয় তাহারই সৌকর্য্যার্থে, নয় উদ্বৃত্ত মনন-শক্তির তৃপ্তি-সাধনার্থে। কিন্তু প্রবৃত্তির প্রকারভেদে, অথবা তদনুরূপ শক্তির অভাবে, মানুষের অভিজ্ঞতা যখন বিপরীত পথে আকৃষ্ট হয়, মানুষ যখন good living-এ সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া no-living-এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, কিংবা গোড়া হইতেই good, bad যত প্রকার living আছে, তাহাকে নির্ব্বিকারভাবে ভোগ করিয়া, অথবা কেবলমাত্র কৌতূহল সহকারে দূর হইতে দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হয়, তখন অবস্থাভেদে ব্যক্তিবিশেষের সম্মুখে যে প্রশ্ন উদিত হয়, এবং ভাবুক চিন্তাশীল হইলে তাহার সমাধানে যে শক্তি নিয়োজিত হয়, তাহা নিষ্ফল হইতে পারে ; তথাপি তাহার সিদ্ধান্ত মানুষের প্রতিভারই পরিচয় দেয়। সে সকল সিদ্ধান্ত good living-সংহিতার মত খুব ধ্রুব বা কার্য্যকরী সিদ্ধান্ত নয় বটে, কিন্তু সেই জন্য তাহার মূল্য কম নহে। আমার যে কথাটি বলি বলি করিয়াও এখনও বলিতে পারিলাম না, সে কথা আমার মুখে খুব বড় শুনাইতে না পারে, কিন্তু সেই ধরনের কথাই মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রেরণা হইয়াছে—জগৎময়, যুগ-যুগান্তময় মানুষ সেই কথাই কতরূপে ভাবিয়াছে ; স্বপ্নে-জাগরণে, আশায়-নিরাশায়, জয়ে-পরাজয়ে, হর্ষে-বেদনায় মানুষ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতায় তাহারই ভাষ্য রচনা করিয়াছে। আমিও মানুষ, তাই আমিও আমার মতে একটু ভাবিয়াছি।

সে কথা কি? আমিও নিজকে তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কারণ ভাবনাটা এখনও কথার রূপে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—প্রাণের ভিতরে বসিয়া যিনি প্ররোচনা করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি—"সে কথা এখনও নহে, কহিলা সুন্দরী"। অতএব অপেক্ষা করিতে হইবে, হয়তো জবাব মিলিবে, নয়তো শেষ পর্য্যন্ত হাহাকারেই সকল প্রশ্ন অন্তর্দ্ধান করিবে। ইতিমধ্যে good living-সংহিতার প্রবক্তা যাহা বলিতেছেন, তাহাই শুনিতেছি ও বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। তিনি যে নব জীবন-বেদ উদ্ধার করিয়াছেন, প্রলয়পয়োধিমগ্ন এই পৃথিবীকে যে দংষ্ট্রার সাহায্যে উদ্ধার করিবার কৌশল জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে মানুষকে বরাহধর্ম্মী হইতে হয়—আমার প্রশ্ন নিতান্তই হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি, আচার্য্যকল্প মহাপুরুষ না হইলেও, আমি মানুষ; আমি জীবনপথে অনেক দূর আসিয়াছি; মানুষের বলবুদ্ধির আস্ফালন, তাহার হাসি-কান্না, বিত্ত ও পাণ্ডিত্যের দম্ভ—ও তাহার পরিণাম লক্ষ্য করিয়াছি। দিনের পর দিন, পলে পলে, তিলে তিলে, দেহ-মনের সর্ব্বপ্রকার নিপীড়নে মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌পিণ্ডের যত প্রকার অবস্থা হইতে পারে—জরা ও মৃত্যুর দুর্ল্লঙ্ঘ্য শাসন, রোগ-শোকের নিরবচ্ছিন্ন দাহন—সকলই নির্ব্বিকার ও নিরুপায় ভাবে সহ্য করিয়াছি; দিনের আলোকেই ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে অবশে ধরা দিয়াছি, নিশীথের অন্ধকারে ইন্দ্রিয়াতীতের স্বপ্ন-বিভীষিকা ভোগ করিয়াছি। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শনের অনেক কথাই শুনিয়াছি—শুনিয়া বিমূঢ়ের মত অবস্থান করিয়াছি, ইন্দ্রজাল বা বিভীষিকা নিরস্ত হয় নাই। কেবল প্রশ্নই জাগিয়াছে, এক উত্তর হইতে আর এক উত্তরে ঠেকিয়াছি, কথার কারিগরিতে মুগ্ধ হইয়াছি, প্রশ্নের ইতি হয় নাই। প্রাচীনকালের

মহামনীষী ঋষির বাণী 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্' বার বার কানের কাছে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই ; আধুনিক শুক্রাচার্য্যগণের সঞ্জীবন-মন্ত্রও শুনিতেছি—সেই দেহাত্মবাদের বংশীধ্বনি বার বার প্রলুব্ধ করিলেও অভিসারে প্রবৃত্তি হয় নাই। এক দিকে জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করিতে আত্মাই যেমন কুণ্ঠিত হইয়াছে, তেমনই, অপর দিকে মর্ত্ত্যের অসীম ঐশ্বর্য্য অতিশয় বাস্তব মনে হইলেও 'ততঃ কিম্' ভাবিয়া প্রাণ তাহাতে মুগ্ধ হয় নাই। জীবনকে আদৌ অস্বীকার করিলে তাহার আর কোনও অর্থই থাকে না, সকল প্রশ্নই অবান্তর হইয়া পড়ে ; আত্মাকে অস্বীকার করিলে একটা গোঁজামিল-দেওয়া অর্থ হয় বটে, কিন্তু সদর্থ হয় না। প্রাণকে বুঝাই কিসে ?

প্রশ্ন সমাধানের এই দুই দিক মাত্র আছে—তৃতীয় কোনও তত্ত্ববাদ নাই। এক দিকে মায়াবাদী নাস্তিক, অপর দিকে ভোগবাদী চার্ব্বাক। মায়াবাদীর দিন গিয়াছে, চার্ব্বাক আজিও আছে এবং জয়ী হইয়াছে। সেই চার্ব্বাক-নীতি—good living-এর প্রণালী—আরও পাকা হইয়াছে। কিন্তু মায়াবাদী নির্ব্বোধের দল প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়া ঋণ মেলা ভার হইয়াছে—ঘৃতপানের উপায় আর সহজ নহে। তথাপি যেহেতু ঘৃতপান সকলকেই করিতে হইবে, তাই আজ পৃথিবীময় শৃগাল-সারমেয়গণ গগনভেদী কোলাহল তুলিয়াছে। এ কোলাহলের নিবৃত্তি নাই, ইহার একমাত্র পরিণাম এক জগৎব্যাপী নরমেধ-যজ্ঞ ; মহাকাল যথাসময়ে তাহার অনুষ্ঠান করিবে।

কিন্তু আমার উপায় কি ? আমি মায়াবাদীও নই, চার্ব্বাকপন্থীও নই ; জগৎ ও জীবনের বাহিরে কোন সত্যের আশ্বাস আমার নাই ; অথচ আধুনিক বৃহস্পতি মহামুনি চার্ব্বাকের বিশুদ্ধ কাম-বুদ্ধির

ভোগবাদেও আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। তাহার কারণ, মানুষের দেহাভিমানকেই আমি মানবীয় সত্তার সবটুকু বলিয়া বিশ্বাস করিতে অক্ষম—ভিতর হইতে আর একটা কি 'খবরদার' বলিয়া উঠে, বাক্য ও তর্কের গোঁজামিল দিয়া তাহাকে থামাইয়া রাখা আমার পক্ষে দুষ্কর। চার্ব্বাকপন্থীর আত্মপ্রসাদ কি কারণে সম্ভব তাহাও জানি, সে আত্ম-প্রসাদের মূলে আছে একপ্রকার মত্ততা—নিরন্তর good living-এর সুখান্বেষণে নিজকে ব্যাপৃত রাখার মত তীব্র সুরার উন্মাদনা যাহার রক্তে নাই, তাহার পক্ষে ওই ভোগবাদ নিষ্ফল। আবার মানবের ইতিহাস যতখানি স্মরণ করিতে পারি—কালস্রোতে আমারই মত কোটি কোটি মানবসন্তানের উত্থান-নিমজ্জনের যে চিত্রাবলী মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠে, এবং আমারই চারিপাশে, কাল ও আজিকার ব্যবধানে, মনুষ্যচরিত্র ও মানব-ভাগ্য যে নিদারুণ নিষ্ফলতার রঙে কালো হইয়া উঠিতে দেখি, তাহাতে জীবনের কোনও অর্থ বুদ্ধিগোচর হয় না; এবং যাহার কোনও আধিভৌতিক প্রতিষ্ঠা নাই, তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ আদৌ মনঃপুত হয় না। তখন মায়াবাদ-বিদ্রোহী মনও মহাশূন্যের ঘোর নৈরাশ্যে অভিভূত হয়, আমার পরম আস্তিক্যলোভী প্রাণকেও নাস্তিক্যের দিকে ঠেলিয়া দেয়।

তখন যে ভাবনার উদয় হয়—সেই ভাবনা হইতে জীবনের যে একটা নূতন অর্থসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগে, আমার কথার মূলে আছে সেই প্রবৃত্তি। অর্থ করিবার মত স্পর্দ্ধা আমার নাই, কিন্তু প্রবৃত্তি আছে এবং তাহা অনিবার্য্য। জীবনের দিক দিয়াই জীবনের ব্যাখ্যা যাহা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহাতে আদি সমস্যার পূরণ হয় নাই—জটিলতা বাড়িয়াছে মাত্র। স্বীকার করিতে হইবে—এ সমস্যার সম্যক সমাধান

হয় নাই, হয়তো তাহা সম্ভব নয়। গত কয় শতাব্দীর ইতিহাসে প্রাচ্য-জাতির ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া আছে। দেহ ও আত্মা, এই দুইয়ের সংগ্রামে এককালে তাহারা যে আধ্যাত্মিকতার বিরাম-দুন্দুভি তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহা বহুদিন হাত হইতে খসিয়া গিয়াছে মনের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া তাহারা যে নিষ্ক্রমণ-পথ আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাও পরলোক নামক এক ছায়াপুরীর বহির্দ্বারে শেষ হইয়াছে—জাগর-লোক হইতে স্বপ্নলোকে, আলোক হইতে অন্ধকারে প্রস্থান করিয়া যাহারা ভব-ভয় হইতে মুক্ত হইতে চাহিয়াছিল, তাহাদের প্রাণমন বিকল হইয়াছিল মাত্র, আলোক-অন্ধকারের দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্যের মানুষ অতি সহজেই এই পন্থা পরিত্যাগ করিল—ঠিক উল্টা পথে, অন্তর্লোক হইতে বহির্লোকে যাত্রা করিয়া তাহারা প্রখর দিবালোকেই জীবনের সীমা সন্ধান করিয়াছিল। আজ সেই সীমা তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বহিঃপ্রকৃতির বিরাটত্ব তাহাকে অভিভূত করিয়াছে—তাহাতে তাহার জ্ঞানাভিমানের দম্ভ মাত্র চরিতার্থ হইয়াছে, মানুষের মনুষ্যত্ব অতিশয় ক্ষুদ্র তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। এক দিকে দেহকে উপেক্ষা করিয়া আত্মার পক্ষাঘাত, আর এক দিকে আত্মাকে অস্বীকার করিয়া 'দেহের অপঘাত। মানুষের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত তাহার যে নিয়তি পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে জীবনকে, তথা জগৎকে, মানুষের পক্ষে, শ্রদ্ধা করিবার কি আছে?

আমি জানি, মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির যে উপায় আজ উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহাতে সেই ক্ষুধা বিকৃত হইবে মাত্র, কখনও মিটিবে না; বরং ক্ষুধার যে বস্তুকে চূড়ান্ত বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, অন্নকেই যে ব্রহ্ম নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষের বুকের উপরে যে বেদীনির্ম্মাণ হইতেছে,

তাহাতে মনুষ্যত্বের শ্বাসরোধ অনিবার্য্য। অন্ন-ব্রহ্মের—good living-এর—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যাঁহারা তাঁহাদের মতে, গাছ-পাথর, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু-জল প্রভৃতির যে নিয়তি, মানুষেরও তাহাই—মানুষের মধ্যে তাহা চেতনাযুক্ত হইয়াছে মাত্র। এই চেতনাও জড়ধর্ম্ম, তদতিরিক্ত কিছু নহে। যে নিয়তিনিয়মে গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরিতেছে, শীতাতপের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, অণু মহাকায় হইতেছে—মানুষের চিৎ-সত্তাও তাহারই একটা বিবর্ত্ত-বিলাস মাত্র। জন্মমৃত্যুর শাসন-মুক্ত ক্ষয়োদয়রহিত কোনও পৃথক সত্তা নাই—সে একটা অভিমান, একটা ব্যাধি ভিন্ন আর কিছুই নয়। অতএব, "আত্মানং বিদ্ধি" অর্থে নিজকে সেই জড়শক্তিরই একটা ক্ষুদ্র বিকাশযন্ত্র-রূপে জানিয়া লও; দেহ ছাড়া আর কিছুই নাই; মন ও বুদ্ধি এই দেহ হইতেই উৎপন্ন একটা সূক্ষ্মতর পদার্থ। বুদ্ধিরও ক্রমাভিব্যক্তি আছে—আজ এই বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সেই বুদ্ধিমান যন্ত্রটি কতখানি উন্নত হইয়াছে তাহারই নিদর্শন—good living-এর অতি-সূক্ষ্ম নিশ্ছিদ্র বার্হস্পত্য নীতি। সেই চিৎ-যন্ত্র জীবনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছে, তাহা অতিশয় 'অথেণ্টিক', কারণ তাহার মূলে দেহবিজ্ঞান ছাড়া আর কোনও বিজ্ঞান নাই—দেহই দেহের ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছে, আত্মার কুপরামর্শ তাহাতে নাই। ইতিমধ্যে মানুষের ইতিহাসে যে এক মহামন্বন্তর আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বুদ্ধিজীবীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। কারণ, জড়শক্তির বিনাশ নাই, অভিব্যক্তির শেষ নাই, ধ্বংস নবসৃষ্টিরই সূচনা মাত্র। সকলেই মরিবে, মৃত্যুর জন্য দুঃখ নাই, কেবল জীবদ্দশায় সেই জড়শক্তির অবমাননা না হয়। মৃত্যুভয় নাই—একমাত্র ভয়, পাছে ভোগ না করিয়া মরিতে হয়—যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।

বুঝিলাম—সবই বুঝি, কারণ বুদ্ধি আমারও কিছু আছে। বুঝি যে, জীবনের বাহিরে জীবনের কোনও অর্থ নাই, বাঁচিয়া থাকার মত সৌভাগ্য আর নাই। তাই এখন বাঁচাটাই যেমন দুরূহ হইয়াছে, তেমনই 'আপ্‌না-বাঁচা'-র তাগিদও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কোন দিকে চাহিও না—আপনাকে বাঁচাও। জাতিহিসাবে অপর জাতিকে কবলিত কর, সমাজ বা সম্প্রদায়হিসাবে অন্য সমাজ বা সম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধনে মন দাও, পরিবারহিসাবে আপনার স্ত্রীপুত্র ভিন্ন আর সকল আত্মীয়কে দূর করিয়া দাও, ব্যক্তি হিসাবে আবশ্যক হইলে আপনার স্ত্রী-পুত্রকেও বর্জ্জন কর, নহিলে বাঁচিবে না। কারণ good living-এর যে কাম-সংহিতা, তাহার বীজমন্ত্র আত্মসুখসাধন। আরও বুঝিতেছি, এই মন্ত্র সভ্য ও সবল পিশাচের ইষ্টমন্ত্র; মমতাদুর্ব্বল বুদ্ধিহীন অসভ্য মানুষের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য। তাহারাও ইহার সাধনে তৎপর হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সুখসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতেছে না—নাস্তানাবুদ হইতেছে, শেষে আত্মহত্যা করিতেছে। ইহা যেমন সবলের ধর্ম্ম, তেমনই সবল ও নির্ম্মম নর-দানবেরাই জীবনযাত্রার নব বিধিব্যবস্থার প্রণয়ন করিতেছে—গণতন্ত্র, দলতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসংঘ-চালিত পীড়ন-যন্ত্র, তাহার বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কঠোরতা ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে; সেই যন্ত্রের চাপে মানুষের প্রাণ কোথায়ও ফাটিয়া বাহির হইবার রন্ধ্র পাইতেছে না। ব্যাঘ্রের পরিচালনায় মেষদলকেও রক্তলোলুপ হইতে হইবে—পুরস্কারস্বরূপ আমিষখণ্ড মাত্র পাইবার আশা আছে, তাহার ভাগ নাকি সমান হইবে। এ যুগের পণ্ডিত যাঁহারা, জ্ঞানবিজ্ঞানের সারতত্ত্বটুকু যাঁহারা নিঃশেষে সেবন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকলের মধ্যে জড়া প্রকৃতির অমোঘ

শক্তির লীলা দেখিয়া মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হইতেছেন; কার্য্যকারণশৃঙ্খলের জটিলতম রহস্য বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিয়া লইয়া নিরাশার আশাকে বিদ্রূপ করিতেছেন, অজ্ঞান মানুষের আত্মবিশ্বাসজনিত দুর্দ্দশা দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছেন। কারণ, মরিবে—মর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু বুদ্ধিহীন হইও না। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তাহার বিবেক, তাহাই তাহার মূঢ়তার নিদান। অতএব অন্তরের সেই বুদ্ধিবৃত্তিহীন অজ্ঞান অসম্মতি, যাহা মানুষকে সুখে থাকিতে দেয় না, যাহাকে বার বার লঙ্ঘন করিয়াও স্তব্ধ করা যায় না, যাহার উৎপাতে মানুষ বুদ্ধিমান হইয়াও নির্ব্বোধ হইয়া থাকে, তাহাকে সমূলে উচ্ছেদ কর; নহিলে বাঁচিবে কেমন করিয়া?—শূন্য হৃদয়ে ও শূন্য জঠরে good living-এর ধ্যান করিয়াও বাঁচা যায়, যদি গর্ব্ব করিবার মত জ্ঞানবুদ্ধিও থাকে।

আধুনিক ঋষিপ্রোক্ত জীবন-বেদ মোটামুটি ইহাই। স্বীকার করিতেই হইবে, আজ জগতের অবস্থা যাহা হইয়াছে, তাহাতে গত্যন্তর নাই। কিন্তু প্রাচীনের মায়াবাদ, বৈরাগ্য প্রভৃতির সঙ্গে এই জীবন-দর্শন মিলাইয়া দেখিলে কি বুঝি? প্রাচীনের দৃষ্টি ছিল পরপারে, সে একটা মহত্তর জীবনের আশা রাখিত, স্বপ্ন দেখিত—ইহজীবনকেই সে নিরর্থক মনে করিত। আধুনিকের দৃষ্টি এপারে আবদ্ধ, পরপারকে সে খেদাইয়া দিয়াছে, কিন্তু আশা বা স্বপ্ন কোনটাকেই সে এপারেও স্থান দেয় না। জীবনকেও সে কোনও নূতন অর্থে অর্থবান করে নাই, মানুষকে সে একটা সুগঠিত জীব-যন্ত্র-রূপে কল্পিত করিয়াছে। অর্থ দেয় নাই বলিতেছি এই জন্য যে, সে ইহার আদি ও অন্ত সম্বন্ধে কোনও ভাবনা বা থিয়রির ধার ধারে না; বরং সেরূপ কোনও অর্থ ইহার নাই, হইতে পারে না—ইহাই সদম্ভে ঘোষণা করে। তবেই দেখা যায়,

জীবন সম্বন্ধে সে আর এক ভাবে প্রাচীনের সেই মায়াবাদ বা শূন্য-বাদেরই সমর্থন করিতেছে। তফাৎ এই—প্রাচীন একেবারে নাস্তিক হইতে পারেন নাই, সে সাহস তাঁহাদের ছিল না; তথ্যকে বিশ্বাস করিতে না পারিলেও একটা তত্ত্ব গড়িয়া লইয়া এবং তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বিরাট শূন্যতলে নিমজ্জমান 'আত্ম'-কে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক শূন্যবাদী যাহারা, তাহারা কোনও আশ্রয়ের প্রয়োজন বোধও করে না—'আত্ম'-কে সম্পূর্ণরূপে জড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া, মন-বুদ্ধি নামক জড়শক্তির অধীন হইয়া, তাহারা অতিশয় নির্ভীক ও উদ্দাম শূন্যপথযাত্রী হইয়াছে। জীবন ও জগৎ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়া অর্থহীন, নীতিহীন, ধর্ম্মহীন। গাছের যেমন সার্থকতা—মাটি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া তাহার শাখাপ্রশাখার সম্যক বিস্তারসাধন, এবং ফুল বা ফলের পরিণতিতেই তাহার জীবনের সমাপ্তি—তার পরে আর কিছুই নাই; তেমনই, দেহমনের চূড়ান্ত পরিণতি ছাড়া মানুষের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নাই; এবং মানুষের বুদ্ধি বা দেহচেতনা যতই উন্নত ও প্রখর হইবে, ততই ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠা বা আত্মসুখসাধন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। আধুনিক সমাজের শীর্ষস্থানীয় যাঁহারা, যাঁহারা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মনস্বী কর্ম্মবীর, good living-এ যাঁহারা সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাঁহারা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছেন।

তাহা হইলে দাঁড়াইল কি? জগৎ মিথ্যাই। মানুষের স্বকীয় কল্পনার—আত্মা, ভগবান, প্রেম, সত্য প্রভৃতির—কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই, সে পক্ষে জগৎ সত্যই উদাসীন। কত শতাব্দী ধরিয়া মানুষ জগতের সঙ্গে বিরোধ ও সন্ধি দুইই করিয়াছে—কিছুতেই তাহাকে বশ বা আত্মীয় করিতে পারে নাই। কখনও রাগ করিয়া তাহাকে অস্বীকার

করিয়াছে—কাষায় চীবর ধারণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে; কখনও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে—ক্রুসকাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে; কখনও বা কৌশলে তাহার নিকট যতটুকু সম্ভব আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিছুতেই কিছু হয় নাই। 'ভূমা' বা 'আত্মন্' নামক বটিকার সাহায্যে তাহাকে হজম করিতে গিয়া আপনি হজম হইয়া গিয়াছে; ভগবৎ-প্রেম নামক অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া তাহারই নেশায় সর্ব্ব দুঃখ ভুলিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। আজ এতকাল পরে মানুষ সত্যই হাল ছাড়িয়াছে, সে আপনাকে হত্যা করিয়া এই দ্বন্দ্বের অবসান করিতে চাহিতেছে। জগতের সঙ্গে সে পারিয়া উঠিল না। জগৎকে জানিতে গিয়া সে আপনাকে জানিতে ভুলিয়াছে—সে আর এক মোহের বশবর্ত্তী হইয়াছে। ইহাও অন্ধতা। কিন্তু ভোলা কি যায়? দেহের জন্য যাহা করিতেছি, তাহা আসলে আত্মারই জন্য—আমি আছি বলিয়াই জগৎ আছে। জগৎ আমারই দেহ—জগতের মধ্যে যদি আমাকেই না দেখিলাম, তবে দেখিলাম কি? কিন্তু দেহকে বা জগৎকে সে ভাবে সে স্বীকার করিবে না—ইহাই তাহার সঙ্কল্প। মনে করিয়াছে এমনই করিয়া সে মহাকালকে ফাঁকি দিবে! সেই ফাঁকির ফাঁকটা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সেই ফাঁকে মন্বন্তরের প্রলয়-শ্বাস গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। তিন সহস্রাধিক বৎসরের মানব-সভ্যতা ও জীবন-সাধনার পরিণাম এই! এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেষ যুক্তি—অতি ক্ষুরধার বুদ্ধির অন্তিম সিদ্ধান্ত হইল—যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। কারণ এই সুখজীবনের কৌশলই এতকাল পরে জানা গিয়াছে। মানুষ এতকাল সুখসাধন-রূপ নিঃশ্রেয়সের সাধনা করিতে পারে নাই—জানে নাই, অজ্ঞান ও কুসংস্কার তাহাকে ভীরু করিয়াছিল। জীবনের জড়তত্ত্ব আজ পরমতত্ত্বরূপে দেখা

দিয়াছে, মানুষের বিবেক-ভয় ঘুচিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যায়, আজ যে মুনিগণ জীবন-সমুদ্রের দিক্-দেশ নিরূপণ করিয়াছেন, তাঁহারা উপরকার তরঙ্গ-গণনাই করিয়াছেন—নিম্নতলের বিরাট গহ্বর, অতি-গভীর, স্তব্ধ অথচ অতি-প্রবল অন্তঃস্রোত তাঁহাদের গণনার বহির্ভূত বলিয়াই তাঁহাদের এত সাহস, এত দম্ভ! মানুষ যুগে যুগে কোন্ দ্বন্দ্বে অবসন্ন হইয়াছে—আত্মসুখসাধনের জন্যই যে সে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, সে যে কোনও কালে কম বুদ্ধিমান ছিল না—এ কথা আজ আর কেহ ভাবিয়া দেখে না। সেই বুদ্ধি বাড়িয়াছে বলিয়া মানুষের দুঃখ কখনও ঘুচে নাই, সমস্যা যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গিয়াছে, এবং থাকিবে। তোমার বিজ্ঞানও থাকিবে, তন্ত্র-মন্ত্রের কুসংস্কারও থাকিবে; গাঁজাখোর উদাসীনও থাকিবে, পক্কবুদ্ধি D. Sc., F. R. S.-ও থাকিবে। তথাপি মানুষের দুঃখ ঘুচিবে না। দশ জন ভোগ করিবে, কোটি জন চাহিয়া থাকিবে; বুদ্ধিমান নির্ব্বোধের অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইবে, শক্তিমান দুর্ব্বলকে পীড়ন করিবে—জড়া-প্রকৃতির যে নীতি—survival of the fittest—তাহাই জয়যুক্ত হইবে। কথা সেই এক—অতি পুরাতন।

কিছুদিন হইতে এই পুরাতন কথাটাই মনে মনে পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আমি দার্শনিক নই, বৈজ্ঞানিক নই, অর্থনীতি বা ইতিহাসবেত্তাও নই; আমি রোগশোকজর্জ্জরিত সামান্য মানুষ—আমি বনস্পতি নই, অতি ক্ষুদ্র তৃণ। যাহারা প্রায় সর্ব্বত্র সুলভ, উন্নত বা দীর্ঘ না হইলেও যাহারা ধূসরকে শ্যামল করিয়া রাখে—সামান্য ধারাবর্ষণে প্রফুল্ল হয়, দীর্ঘকাল আতপ সহ্য করিয়াও মরে না, বিবর্ণ হয় মাত্র—আমি সেই অতি-সাধারণের একজন। তথাপি, দর্শন-বিজ্ঞানের অত্যুচ্চ তত্ত্বরাজির অনুশীলন বা বুদ্ধিবৃত্তির চরমোৎকর্ষ লাভ না করিলেও

আমি জীবনকে আর এক দিক দিয়া দেখিয়াছি, যাঁহারা জীবনের ব্যাখ্যাতা নন—দ্রষ্টা, মানুষের প্রাণকেই যাঁহারা পরম বিস্ময় ও সশ্রদ্ধ কৌতূহলে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, যাঁহাদের কণ্ঠে মানুষের ব্যথা বাণী হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহাদের সহবাসে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছি। তাই আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, বিজ্ঞান-দর্শন মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির যতই সহায় হউক, এবং আধুনিক কালে বিজ্ঞানের যত বৃদ্ধি হউক, ক্ষুধার্ত্তের ভিক্ষাভাণ্ডে ভস্ম-মুষ্টিই মিলিয়াছে। বরং যে কবিই মানব-সভ্যতার আদি গুরু, যাঁহার দিব্যদৃষ্টি তমসার পারে মহান্ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল—আজ এই অতি-বুদ্ধির যুগেও তাঁহারই বংশধর মানুষের পরম পিপাসার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি-সাধন করিতেছেন। সেই বাণী আজ আর কেবল অবসর-বিনোদনের সামগ্রী নয়, এক এক কবির কণ্ঠে এক এক ঋক্ উচ্চারিত হইতেছে, জীবনরূপ মহারহস্যের ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎবিভা বিচ্ছুরিত হইতেছে। দর্শন বা বিজ্ঞানের মত এই কবি-মনীষীগণের কোনও মতবাদ নাই—তাঁহাদের বাণীতে জীবনের কোনও তত্ত্বব্যাখ্যা নয়, তাহার সহিত সাক্ষাৎকার আছে। সেখানে—"deep calls unto deep" : যাহার চৈতন্যের গভীরতা বা স্ফূর্ত্তি আছে, যাহার সত্যকার পিপাসা আছে, সেই তাহাতে সাড়া দেয়, এবং জীবনের দুর্ভেদ্য রহস্য তাহাকে এক অপূর্ব্ব উপায়ে আশ্বস্ত করে। ইহাকে ভাবসর্ব্বস্ব অজ্ঞতা-বিলাসীর 'মিষ্টিসিজ্‌ম' বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করিবার কারণ নাই ; যাহার ব্যাখ্যা হয় না—কেহ দিতে পারে নাই ;—পারে নাই বলিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিয়া, অথবা তাহার বিষয়ে একরূপ মানসিক ব্যায়ামের বাহাদুরি করিয়া, নিজকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া লাভ কি? বরং ব্যাখ্যার চেষ্টা না করিয়া অনুভূতি ও প্রতীতির পথে তাহাকে একেবারে

আত্মসাৎ করিয়া লইবার যে অপরা শক্তি মানুষের প্রতিভায় প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান নয়, নিরাকরণ করিবার চেষ্টায় ক্ষতি কি? "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো"—প্রাচীন ঋষির কথা তো আজও মিথ্যা হয় নাই। মানুষের মধ্যে যতটুকু মনুষ্যত্ব আছে, এবং কখনও একেবারে লোপ পাইবে না—সেই মনুষ্যত্ব বিত্তের দ্বারা তর্পণীয় নহে। তাই এই বিত্ত বা 'মেটিরিয়াল' সম্পদ আজ মানুষকে যে পরিমাণে লোভাতুর করিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই তাহাকে দিক্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। সুখ নাই, নেশার মত্ততা আছে; যতক্ষণ সেই মত্ততা আছে ততক্ষণ ছুটাছুটি, তার পরেই শেষ। মানুষের অন্তরতম অন্তরের সেই আর্ত্তনাদ আমি আমার মধ্যে শুনিতেছি, তাই বিজ্ঞানের শূন্যগর্ভ পটহ-নিনাদ অগ্রাহ্য করিয়া আমি সেই কবি-ঋষিগণের ঋক্-মন্ত্র হইতে যে আশ্বাস পাইয়াছি তাহারই কথা কিঞ্চিৎ বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু পারিব কি?

২

নিষ্পাপ শিশু দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় দিবারাত্র ছটফট করে, তাহার নাভিশ্বাসের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই যাতনা নিরুপায়ভাবে দেখিয়া থাকি। যখন সব শেষ হইয়া যায়, তখন শোক করিব, কি তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির নিশ্বাস ছাড়িব ভাবিয়া পাই না। এমন কোনও বিজ্ঞান আছে, যাহার দ্বারা দেহের ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠুরতা নিবারণ করা যায়? যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে মানুষ এই পৈশাচিক ব্যবস্থায় অবিচলিত থাকিয়া কেমন করিয়া সুখ-জীবন যাপন করিবে? অবশ্য আদি-অন্তের ভাবনা রোধ করিয়া কেবল বাঁচিবার উদ্দেশ্যেই বাঁচিবার চেষ্টা করিবে—জীবনপথে

কেবল অগ্রসর হইতেই থাকিবে, পথ যেখানেই শেষ হউক। এই যে নিরুপায়ের উপায়, এই যে বাঁচিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকার সঙ্কল্প—ইহাকেই নানা নীতিকথায় মণ্ডিত করিয়া, মানুষ আসল কথাটাকে চাপা দিয়াছে। কিন্তু তবু মন যে মানে না, কেবল অসাড় হইয়া থাকে মাত্র—তাহা সকলেই জানি। জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাই না, শেষে তাহা নিরর্থক, এমন কি অনাবশ্যক বলিয়া, ফাঁসিকাষ্ঠের সম্মুখে গীতা-পাঠের মত মনকে দৃঢ় করিয়া থাকি।

তথাপি মৃত্যুই সবচেয়ে বড় ভয় নয়; মৃত্যুকে ভয় করে না এমন মানুষের অভাব নাই—অবস্থাবিশেষে মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। মৃত্যুকে মানুষ বহু প্রকারে জয় করিয়াছে, কিন্তু জীবনকে জয় করা দুঃসাধ্য। জীবনেরই কারা-প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য, কারণ নিজেরই হৃদ্-দেশে সেই কারারক্ষী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে—মানুষ প্রতিপদে সেই অতি-দম্ভী আত্মাভিমানীর বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। মৃত্যুকে আমরা যে ভয় করি, তার কারণ—"Conscience doth make cowards of us all"; কারাপ্রাচীর একবার লঙ্ঘন করিতে পারিলে ভয় আর থাকে না। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই ভয়—জীবনকে বুঝিতে পারি না বলিয়াই মৃত্যুকে ভয় করি। রহস্যময়ী যদি একবার তাহার অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিত, তাহা হইলে কোনও দুঃখ থাকিত না—তার সেই আবৃত চক্ষুর ক্রূর কটাক্ষ অধরের হাসির ধারায় নির্ম্মল নিরাময় হইয়া উঠিত।

আজ এক ভিখারী আসিয়াছিল। আগে প্রতি মাসের শেষে তাহার অনশনক্লিষ্ট মুখ আমার গৃহদ্বারে দেখা দিত। অতি মলিন শতচ্ছিন্ন অথচ ভদ্রবেশ, দীনতার প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও হয়। দেখিলে কেমন

ভয় হয়—সে যেন মনুষ্য-জীবনের আর এক অতি সাধারণ লাঞ্ছনার প্রতীক। এতদিন তাহাকে দেখি নাই, ভাবিয়াছিলাম বুঝি মরিয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে—বাঁচিয়াছে; মনুষ্যজীবনের ধিক্কার-লজ্জা-লাঞ্ছনার দৃষ্টান্ত যত দূর হয় ততই ভাল। আজ আবার সেই বিভীষিকা! এ যেন মরিবার নয়, দীনহীন অসহায় মনুষ্যত্বের ধ্বজারূপে তাহাকে দীর্ঘকাল লোকালয়ে বিচরণ করিতেই হইবে! বলিল, বড় অসুখ হইয়াছিল তাই সাত-আট মাস আসিতে পারে নাই। কথাটা মিথ্যা নয় নিশ্চয়। কিন্তু সেই অনশনক্লিষ্ট দেহ, সেই ক্ষীণ কণ্ঠ, সেই দুর্ব্বল পদক্ষেপ, কোনটাই একটু বেশি বা কম নয়! সম্ভবত তাহার দুঃখে জোয়ার-ভাঁটা নাই—সুখেরই আছে, দুঃখের থাকে না; দিব্য এক ভাবেই আছে। মন সহসা বিরূপ হইয়া উঠিল, বলিলাম, তোমার মুখ আমি আর দেখিতে চাই না, তুমি আর আসিও না। হতভাগ্য অবাক হইয়া গেল, অতিশয় আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, আমি কি দোষ করিয়াছি? আমি বড় দুঃখী, আপনি গরিবের মা-বাপ, আমার প্রতি নির্দ্দয় হইবেন না। কি দোষ করিয়াছে? সে মানুষের মুখ হাসাইয়াছে, সে মনুষ্যকুলের কলঙ্ক! সে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি বা শক্তির অভাবে, good living-এর ভদ্র-স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে—উত্তর তো অতিশয় সহজ! কিন্তু সে উত্তর আমার মুখে যোগাইল না। আমার চক্ষে সে একটি বিভীষিকা—নিয়তির ক্রুর পরিহাসের আর একটি মর্ম্মভেদী অট্টরব। তাহার মধ্যে আমি মনুষ্যত্বের যে পরাজয় দেখিতেছি, তাহার কারণ আরও গভীর। জগতের মূল বিধির সঙ্গে তাহা জড়িত হইয়া আছে, তাহাকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব। সে আমারই দশান্তরের প্রতিচ্ছবি; তাহার মধ্যে আমি আমারই, বা আমার পুত্র-পৌত্রের, অতি সম্ভব ও অনিবার্য্য নিয়তির প্রকাশ দেখিতেছি।

সেই সহানুভূতিই আমাকে বিকল করিয়াছে—আমারই প্রতি আমার নিদারুণ বিতৃষ্ণার উদ্রেক করিয়াছে। বিমূঢ়ের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, আর কিছু বলিলাম না। পাপিষ্ঠকে বড়ই অবসন্ন দেখিলাম; সে বসিয়া পড়িল, বলিল, এক মুঠা চাল ও একটু জল দিন, আর পারিতেছি না, কাল সমস্ত দিন উপবাস করিয়াছি।

এই তো মানুষ। মনুষ্য-জীবনের তলদেশে যে পঙ্ক রহিয়াছে তাহার দুই অঞ্জলি তুলিয়া দেখাইলাম, এই দুই-ই মানুষের আদি দুঃখ। যাহাদের মতে দেহ ও মনই সর্ব্বস্ব, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত ওই পঙ্কোদ্ধার করিতেই হইবে, কিন্তু এ পঙ্ক কখনও ধৌত হইবে না। চিত্ত-প্রকর্ষ বা মানস-রসায়নের যত প্রক্রিয়াই আবিষ্কৃত হউক, এ পঙ্কের পঙ্কত্ব ঘুচিবে না। কিন্তু বিশ্বাস করি, পঙ্কের উপরে জল আছে, এবং পঙ্কে যে মৃণাল জন্মে তাহা হইতেই জলতল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধমুখী লতা-দণ্ডে, মুক্ত বায়ু ও আলোকের দেশে, পঙ্কজ ফুটিয়া উঠে। ইহা কেবল উপমাই নয়, বাস্তব অর্থেও সত্য। সেই পঙ্কের শোভা যাহারা দেখিয়াছে, তাহার গন্ধ-মধু আস্বাদন করিয়াছে, তাহারাই পঙ্ককে ঘৃণা না করিয়া—মানস-রসায়ন প্রয়োগে তাহাকে শোধন না করিয়া, তাহাকে সহ্য ও স্বীকার করে; আমি সে সৌভাগ্য অর্জ্জন করি নাই, তাই দুর্ব্বল প্রশ্নকাতর প্রাণ ভয়ে শিহরিয়া উঠে।

সেই পদ্মের কথা শুনিয়াছি, তাহার গন্ধ-মধু পরোক্ষে উপভোগ করিয়াছি—ভোগ করি নাই; তাহা যদি করিতাম, তবে আজ এই কথার মালা গাঁথিতে বসিতাম না। ঋষি তাহাকে ধ্যানে অনুভব

করিয়াছেন, কবি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন। যিনি তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন, পান করিয়াছেন—তিনি কে? তাঁহাকে জানিব কেমন করিয়া? যে তাহা করে, সেও বোধ হয় না জানিয়াই করে—আপনাকে আপনি জানে না, পরিচয় দিবে কে?

এই মানুষকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কবি। ঋষি তাহাকে দেখিয়াছেন অতি দূরে—নিকটে চক্ষের সম্মুখে ধরিতে পারেন নাই। কবি তাহাকে অতি নিকটে বুকের কাছে ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি যেটুকু দূর থাকা উচিত—না থাকিলে দেখার অসুবিধা হয়—সেটুকু দূরত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই দূরত্ব-রক্ষার চেষ্টার নাম আর্ট। এই আর্টের কত ভঙ্গিই দেখা গিয়াছে—গান, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস—কাব্যের কত রূপ-বিবর্ত্তনই হইয়াছে! আজও তাহার শেষ নাই। ঋষি ও কবি, দুইজনেই এই পরম বস্তুর সন্ধান করিয়াছেন। একজন দৃষ্টিমুগ্ধ, আর একজন সৃষ্টিলুব্ধ। ঋষির চক্ষে সে একটি জ্যোতি, সৃষ্টির মুকুর-ফলকে তাহা উদ্ভাসিত হয় মাত্র; সে সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র, সৃষ্টি তাহারই প্রপঞ্চ। সে অনির্ব্বচনীয় —"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"। তাই তাহাকে বাণীতে ধরা অসম্ভব; তাহাকে দেখা যায়, কিন্তু দেখানো যায় না। কবিও দেখেন, কিন্তু সে দেখার ভঙ্গি স্বতন্ত্র। তিনি তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে শরীরীরূপে প্রত্যক্ষ করেন, এবং রূপই তাহার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য বাণীরূপ বাহু প্রসারিত করেন। রূপ এমনই যে, তাহা দেখিলেই দেখাইতে হয়; যে দেখাইতে পারে না, সে দেখেও নাই। এই রূপ—মানুষেরই প্রাণের রূপ—কবির ভাষায় যুগে যুগে প্রকাশের পথ খুঁজিতেছে। ঋষি যাহাকে তমসার পারে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন,

কবি সেই ক্ষণ-জ্যোতিকে উর্ব্বশীরূপে এই পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন—বিরহী পুরূরবার অশ্রুজলে সে স্থিরবিম্বিত হইয়া উঠে! কিন্তু কবি ও ঋষির মধ্যে এই ব্যবধান সত্ত্বেও, উভয়ের আদিম সগোত্রতা কখনও ঘুচে নাই। কতকাল ধরিয়া সেই উর্ব্বশী, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তিনীরূপে বিরাজ করিয়া, কবি-ও-ঋষি পুরূরবাকে দিশে দিশে ছুটাইয়া দিশাহারা করিয়াছে—অন্তরে ধরা দিয়াও অন্তরীক্ষে বিচরণ করিয়াছে। মানুষ তাহার জন্য সপ্তলোক সৃষ্টি করিয়াছে, সৃষ্টির সীমার বাহিরে সৃষ্টিলক্ষ্মীর আসন রচিয়াছে; নিজ নাভিগন্ধের কারণ-স্থল নির্ণয় না করিয়া কান্তারে গহনে তাহার সন্ধান করিয়াছে। সৃষ্টির এই আনন্দ-রূপিণীকে ঘটে ও পটে ধরিবার জন্য কবি আকুল, ঋষি তাহার একটা সার্ব্বভৌমিক সত্তার আশ্বাসেই মুগ্ধ। কবির পক্ষে যাহা বস্তু, ঋষির পক্ষে তাহা তত্ত্ব; এবং বস্তু ও তত্ত্বের এই লুকাচুরি—ঋষিভাব ও কবিভাবের এই দ্বন্দ্ব—সাহিত্যে আজিও ঘুচে নাই। সেই যে বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি—মানুষের আত্মা তাহার জন্য চিরদিনই ক্ষুধাতুর; এবং কবিও যেহেতু মানুষ, অতএব রূপের মধ্যে অরূপের, বস্তুর মধ্যে তত্ত্বের, ভূমির মধ্যে ভূমার ভাবনা তিনি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সকল ধর্ম্ম, সকল নীতি, সকল আদর্শবাদের মূলে মানুষের এই আদি আত্মিক সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। ঋষির ধ্যান ও কবির কল্পনা ভিন্নমুখী হইল বটে—উর্ব্বশী অন্তরীক্ষ হইতে নামিয়া ভূমিতেই আসন পাতিল বটে; কিন্তু মানবের জীবনে, মানবের চরিত্রে, কবি যাহার লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার বহুত্বে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; একটা একের আদর্শ তাঁহাকেও পাইয়া বসিল—জীবনের মৃৎ-বিগ্রহ, মানুষের মনুষ্যত্বই, তাঁহার কল্পনাকে চরিতার্থ করিল না। এক

দিকে ঋষির ধ্যান, অপর দিকে কবির প্রেম, এই দুইয়ের কোনটাই স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারিল না—সৃষ্টির রসরূপ বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যায়, বস্তুর বস্তুরূপ রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়। তাই কবিও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, জীবনের একটা অর্থ সন্ধান করিতে হয়। দেহের যে আধি-ব্যাধি, প্রাণের যে সান্ত্বনাহীন শোক অতঃপর কবিচিত্ত মথিত করিল, তাহার সহিত সন্ধি করিবার—তাহাকে সহ্য করিবার একটা উপায় কবিই আবিষ্কার করিলেন। ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ হত্যা করিয়াছে, তাহারই শোকে ক্রৌঞ্চীর আর্ত্ত-চীৎকার শুনিয়া যাঁহার কণ্ঠে আদি-শ্লোক উদীরিত হইয়াছিল, সেই একান্ত ব্যক্তিগত অবিষহ্য ব্যথা যে কবির হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছিল—তিনি কতকাল তাহার ধ্যান করিয়া, অবশেষে সেই ব্যথাকে জয় করিবার ছলে, রামায়ণ রচনা করিলেন। ব্যক্তি ছোট হইয়া গেল, মানুষ মহামানবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইল—জীবন হইল একটা তপস্যা, চারিত্রই হইল একমাত্র সাধনার বস্তু। প্রিয়া-বিরহে একদা যে পুরুষ বিলাপধ্বনিতে কানন-কান্তার প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল, লোকহিতের জন্য সে-ই অতঃপর প্রাণসমা পত্নীকে বিসর্জ্জন করিল—নিজের হৃদ্‌পিণ্ড অনায়াসে উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। মানুষ আর মানুষ রহিল না; দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য কবি যে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাতে ব্যক্তির সুখ-দুঃখ মিথ্যা হইয়া গেল। সে মানুষের কথা নয়—মনুষ্যত্বের কথা, একটা মনঃকল্পিত সর্ব্বমানবীয় ব্যক্তির কথা। কবি এখানে ঋষি, ইহাও কবিত্বের আর্ষ-যুগ।

আমাদের দেশে ইহাই কাব্যের আদি ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মহাভারত মহাকাব্য হইলেও তাহা পুরাণ, কাব্য নহে। তাহার কারণ বোধ হয়

এই যে, তাহাতে ঘটনা তথ্য ও তত্ত্ব এমনভাবে স্তূপীকৃত যে, তাহা কাব্যোচিত রস-পরিণতি লাভ করে নাই; অথবা, তাহার ঘটনা ও চরিত্র কল্পনাপ্রসূত নয়; তাহা ইতিহাস, তাহা বাস্তববিবৃতিমূলক রচনা। কিন্তু সেই বিরাট বিবৃতির মধ্যেই মানবচরিত্রের যে অসংখ্য আলেখ্য, এবং মানব-ভাগ্যের যে বাস্তব-রহস্য গাঢ় ও গভীর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে—কোনও একটি বিশিষ্ট আদর্শের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মানুষের জীবনকে যে বিচিত্র ভঙ্গি ও নানা অবস্থানে দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় সাহিত্যে এই একমাত্র গ্রন্থকে 'মানব-মহাবংশ' বা 'মানবায়ন'-মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। এই কাব্যে এক বিরাট দেশ-কালের মধ্যে কবি মানুষকে স্থাপনা করিয়াছেন; আদর্শ, নীতি ও ধর্ম্মের কথা কিছুই বাদ দেন নাই বটে, কিন্তু মানব-চরিত্র-ব্যাখ্যান হইতে সেগুলিকে পৃথক রাখিয়াছেন, অন্তত কাহিনীর প্রধান অংশে; মানুষের কামনা ও ভাবনা এই দুই-ই পাশাপাশি থাকিয়াও সুস্পষ্ট রেখায় পৃথক হইয়া আছে—ধর্ম্মের কথা ও মর্ম্মের কথা দুই-ই স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় কাব্যে যে ট্রাজেডি অচল, অথচ মানব-মহাকাব্যের যাহা একটি অতিশয় বিশিষ্ট রস, এই মহাভারতে তাহা পূর্ণ-প্রকটিত হইয়াছে। রামায়ণের কবি যাহাকে এক অত্যুচ্চ আদর্শ-কল্পনার গীতিরসে সিঞ্চিত করিয়াছেন, মহাভারতকার তাহাকে বাস্তবজীবনঘটিত নাটকীয় কাব্যরসে উজ্জ্বল করিয়াছেন। পাপ পুণ্য, চরিত্র ও বাহুবল, জ্ঞান প্রেম, মহত্ত্ব ও নীচতা, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপরিসীম দৈন্য—এ সকলের মধ্যে তিনি দুর্ব্বল অসহায় মানুষকেই দেখিয়াছেন; মহামানব নয়—এই পৃথিবীর রক্তমাংসের মানুষ অতিশয় স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি-চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়া মহাকালের

অঙ্গনে যে নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে, তাহার যবনিকা অন্ধকার—মহাভারতে সেই যবনিকা-পাত আছে; এবং তাহা নিরতিশয় দুর্ভেদ্য বলিয়া, মানুষ এই নটলীলায় নিযুক্ত থাকিয়াই যে সকল চিন্তা ও ভাবনা না করিয়া পারে না, যাহা তাহার জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—মহাভারতে তাহাও স্থান পাইয়াছে। তাহাতে মানুষের কামনা ও ভাবনা, তাহার প্রবৃত্তি ও প্রতিভা পরস্পরের পরিপূরক হইয়া মহাকাব্যের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছে।

অতএব মহাভারতকার মানুষকেই দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, মানুষের প্রাণ মন ও আত্মা—এই তিনেরই মিলিত চিত্র এই মহাকবির চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় কবিগণ কাব্যকে একটি কলাবিদ্যারূপে আয়ত্ত করিয়া তাহার অনুশীলন করিয়াছেন; এই সকল কবি মানুষ না আঁকিয়া মানুষের শোভন সুন্দর প্রতিচ্ছবি আঁকিয়াছেন—সাগরে সন্তরণ না করিয়া সরোবরে মনোহর পদ্ম ফুটাইয়াছেন। এ সকল কাব্যকে 'poetry of interpretation' না বলিয়া 'poetry of refuge' বলিতে পারি। বাস্তবকে দূরে রাখিয়া, অথবা তাহার একদেশের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আশ্বস্ত হইবার উপায় ইহাতে আছে; জীবনের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে বুঝিবার প্রবৃত্তি নাই।

তথাপি কাব্যহিসাবে কবির কৃতিত্ব কোন কালেই অল্প ছিল না। বাস্তব জীবন ও সমাজ কবিকল্পনাকে যখন যেমন রসদ জোগাইয়াছে, অথবা যে কালে যে ধরনের জীবন-নীতি বা অধ্যাত্মবাদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কাব্য সেই অনুসারে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয়

জীবন-সাধনায় বস্তু অপেক্ষা তত্ত্বই যখন প্রাধান্য লাভ করিল, তখন কাব্যও নির্ব্বিশেষ রসের আধার হইয়া উঠিল। তথাপি বিশেষই *কবিকল্পনার উদ্দীপন-কারণ; বিশেষকে, ব্যক্তিকে, সৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রকাশগুলির প্রত্যেকটিকে—তাহার স্বকীয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত দেখার যে* দৃষ্টি তাহাই কবিদৃষ্টি, এবং তাহার যে আনন্দ তাহাই রস। রূপের বাহিরে নয়, জীবনকে অতিক্রম করিয়া নয়, ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়া নয়,—তাহাকে স্বীকার করিয়া এবং তাহারই মর্ম্মস্থলে আত্মার পদ্মাসন পাতিয়া সৃষ্টির জয়ঘোষণা—জীবনের স্তোত্রপাঠ—ইহাই কবিধর্ম্ম। কিন্তু এই কবিধর্ম্মে মানুষ আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই, কবিকেও সেজন্য রাষ্ট্র সমাজ বা ধর্ম্মনীতির আনুগত্য করিতে হইয়াছে। তথাপি কবির দৃষ্টি যে জগৎ সৃষ্টি করে, তাহা অবাস্তব-মনোহর এবং মানুষের কল্পনাসুখ-সহায় বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। যিনি চিন্তাবীর বা কর্ম্মবীর—যাঁহারা ধর্ম্ম, সমাজ বা রাষ্ট্রনেতা, তাঁহারা কবিকে বিশ্বাস করেন না। য়ুরোপে যে জাতির কাব্য-প্রতিভা সর্ব্বাগ্রে স্ফুরিত হইয়াছিল, এবং যাহাদের কাব্যে, এক দিকে অতি সুস্থ সৌন্দর্য্য-প্রীতি, ও অপর দিকে মানুষের চরিত্রবল-জনিত অন্তর্দ্বন্দ্ব কবিকল্পনার প্রেরণা হইয়াছিল, সেই জাতিরই এক তত্ত্ববাদী দার্শনিক কবিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই! তথাপি, প্রকৃতি-উপাসক জীবনাবেগ-চঞ্চল এই পাশ্চাত্য জাতিসকলের মধ্যেই কবি-প্রতিভার যে ক্রমোন্মেষ হইয়াছে, তাহাতে কাব্যে জীবনের স্থান অনেকখানি প্রসারিত হইয়াছে। সেইখানেই শেষে এমন এক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, যিনি জীবনকে বুঝিবার অপেক্ষা না করিয়া, তাহার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া, ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিয়া, অথবা স্থির জলতলে মুখচ্ছায়া দেখিয়া—কাব্যে যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে মানুষ শুধুই মুগ্ধ হয় না,

তাহার জীবনাবেগ বর্দ্ধিত হয়—জীবন-সমুদ্রে তলাইয়া গিয়া, অথবা তাহাকে মন্থিত করিয়া, নিজের প্রাণকে নিঃশেষে স্পন্দিত করিয়া তোলে। *সকল তত্ত্বকে নিঃসত্ত্ব করিয়া, সর্ব্বপ্রকার নীতিধর্ম্মের আবরণ ভেদ করিয়া, মানুষের প্রকৃতি ও নিয়তি সেই কবির দিব্যদৃষ্টিতে* স্বতঃপ্রকাশিত হইয়াছে। কাব্যের সেই এক রূপ! আত্মহারা তন্ময় কবি-প্রতিভা—প্রকৃতি ও মানবহৃদয়, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বোত্থিত অপূর্ব্ব বিস্ময়-রসে মূক-মুগ্ধ হইয়া ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছে যে, মানুষই এই মহানাটকের একমাত্র নায়ক, তাহারই হাসি-কান্না জয়-পরাজয়ের ছন্দে এই সৃষ্টি একখানি কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। গগনভেদী বজ্ররবের মধ্যে যে সঙ্গীত—শিশুর কলহাস্য বা প্রণয়ীর গদ্‌গদভাষের মধ্যেও তাহাই রহিয়াছে; মনুষ্যজীবনের ট্র্যাজেডি ও কমেডি একই সুরে বাঁধা। দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সমাধানে প্রয়োজন নাই, রহস্য রহস্যই থাকুক; কারণ এই উপলব্ধিই যথেষ্ট যে, সৃষ্টিমন্দিরের বিরাট চূড়াকেও অতিক্রম করিয়া মানব-হৃদয়চূড়া উচ্ছ্রিত হইয়া আছে; জীবনরস-রসিকতার মত মোক্ষ-মন্ত্র আর নাই। মানুষ যত দুর্ব্বল, যত বিধিবিড়ম্বিতই হউক, সে 'স্বমহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। ভয় নাই, সংশয় নাই; কারণ এই মহানাটকের ঐক্যতানবাদনে কোথাও তালভঙ্গ নাই; চাই কেবল তন্ময়তা, বা সর্ব্বাত্মীয়তার অনুভাব-রসে আত্মনিমজ্জন। শেকস্‌পীয়রের কাব্যলোকে, নীতি ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রঘটিত যত কিছু তত্ত্ব বা মতবাদ জীবনের তরঙ্গভঙ্গে ফেনপুঞ্জের মত ভাসিয়া বেড়ায়—অতল নীল বারিরাশিকে আচ্ছন্ন বা অপরিচ্ছন্ন করিতে পারে না। কিন্তু এই কাব্যরসও মানুষের ব্যক্তিগত চেতনার দুরূহ দুঃখ দূর করিতে পারে না। জীবন-মহানাটকের দ্রষ্টারূপে, এবং

দ্রষ্টার আসনে বসিয়াই, অভিনয়-গত পাত্রপাত্রীর সহিত একাত্মতা লাভের যে রস-মুক্তি, তাহা অতিশয় ক্ষণস্থায়ী। শেকস্‌পীরীয় কাব্যে জীবনকে রস-দৃষ্টিতে দেখার শক্তি চরমে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ইহাও একটা অবস্থাসাপেক্ষ। যে 'সাধারণীকৃতি' রসাস্বাদের পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহাতে পাত্রপাত্রীর সুখদুঃখ সর্ব্বব্যক্তিগত হইয়া উঠে, সেখানে মানুষকে পাই বটে, কিন্তু ঠিক আমাকে পাই না। অতএব, রস-চেতনায় যাহা সম্ভব, ব্যক্তি-চেতনায় তাহা সম্ভব নয়। কাব্যরস এই জীবন ও জগৎ-রহস্য হইতেই উদ্ভূত হইলেও—particular বা বিশেষই তাহার উপজীব্য হইলেও—শেষ পর্য্যন্ত তাহা universal-এর পরিচর্য্যা করিবেই। অতএব খাঁটি রসচর্চ্চাতে মানুষের সেই পরম উৎকণ্ঠা নিবারণের কোনও উপায় নাই। অতিশয় ব্যক্তিগত বিশিষ্ট চেতনার সেই বাস্তব উৎকণ্ঠা দূর করিবারকি মন্ত্র আছে—যাহার বলে, universal-এর আশ্বাস ব্যতিরেকে মানুষ নিজের পাত্র নিজেই ভরিয়া লইতে পারে?—তাহারই সন্ধান করিতেছি।

এই ব্যক্তিগত ক্ষুধা অতঃপর ব্যক্তিত্বের বা আত্মাভিমানের তৃপ্তি-কামনারূপে কাব্যসাধনার মূল প্রবৃত্তি হইয়া উঠিল। কাব্য বাস্তবকে ত্যাগ করিয়া অতিমাত্রায় ভাবতান্ত্রিক হইয়া উঠিল—ব্যক্তিমাত্রের জন্য স্বতন্ত্র জগৎ কল্পিত হইল, এবং সেই জগতে অবাধ আত্ম-প্রসারের স্ফূর্ত্তিই হইল জীবনের উপরে জয়লাভ। বলা বাহুল্য, ইহাও এক প্রকার জীবনকে ফাঁকি দেওয়া। বস্তুজগৎ হইতে দূরে সরিয়া ভাবজগতে বসিয়া এই যে আত্মপূজা—ইহাও এক প্রকার সন্ন্যাস; এই একাকীত্বও মানুষের প্রাণধর্ম্মের বিরোধী। জীবনের সমস্যা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত হইলেও, দুঃখের বাস্তব কারণ ব্যক্তির

মধ্যেই আবদ্ধ নয়। একের সহিত অপরের নানাবিধ সম্পর্ক—বন্ধু-বৈরী আত্ম-পর ভাব—আদি-যুগল হইতে পরিবারে ও সমাজে প্রসারিত সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিড়ম্বনা—ইহাই মানুষের জীবন জর্জ্জরিত করে; তাই একক-মুক্তির ভাব-স্বর্গ ধ্যানী রসিকের পক্ষে উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু যে আধিভৌতিক দুঃখ হইতেই মানুষের প্রাণে অধ্যাত্ম-সঙ্কট উপস্থিত হয়, তাহার পক্ষে ইহা ব্যর্থ বলিতে হইবে।

কিন্তু কবিধর্ম্মের এই পরিণামও অবশ্যম্ভাবী। মানুষের মানস-উৎকর্ষ যেমন ক্রমশই বাড়িয়াছে, ও তাহার ফলে দুঃখবোধ প্রাণের ক্ষেত্র হইতে মনের ক্ষেত্রে যত অধিক সংক্রামিত হইয়াছে, ততই কল্পনা ও বাস্তবের ব্যবধান বাড়িয়াছে—কবি-প্রতিভার স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে। এই যুগে কবিও মতবাদী তত্ত্বপ্রচারক হইয়া উঠিলেন—কবিদৃষ্টির মৌলিকতা জীবনকে ছাড়িয়া তত্ত্বগত হইয়া উঠিল; কেবল ঋষিত্বের দাবি নয়, কবি এক্ষণে তাঁহার সেই ভাব-সত্যের বলে সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দাবি করিলেন। এই যুগেই কবির মুখে এমন উক্তি শোনা গেল—"The poets are the trumpets that sing to battle, the poets are the unacknowledged legislators of the world!" কেহ বা গাহিয়া উঠিলেন—

> We are the music-makers
> And we are the dreamers of dreams,
> Wandering by lone sea-breakers,
> And sitting by desolate streams;—
> World-losers and world-forsakers,
> On whom the pale moon gleams:
> Yet we are the movers and shakers
> Of the world for ever, it seems.

—"Dreamers of dreams, world-losers and world-forsakers" বটে, কিন্তু তথাপি—"movers and shakers of the world" ! কবি এখন ঋষি হইলেও লোক-নায়ক—জগতের ভাগ্যবিধাতা ; তিনি মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে মহামানবত্ব, এবং বাস্তব সৃষ্টির পরিবর্ত্তে এক অবাস্তব অপরা-সৃষ্টির স্বপ্ন দেখিতেছেন। ঋষি হইতে কবি, এবং কবি হইতে ঋষি—আবর্ত্তনের চক্র এতদিনে পূর্ণ হইয়াছে ; এবং শেষে সেই চক্র-পরিধি ত্যাগ করিয়া কবিমানস উৎকেন্দ্রগামী হইয়াছে। ইহারও পরে এই উৎকেন্দ্র-পথে এ পর্য্যন্ত যে কাব্য-সাধনা চলিয়াছে, তাহাতে একটা ব্যক্তি-সর্ব্বস্ব আত্মাভিমানই আছে ; কাব্যে আর বিষয়-মাহাত্ম্য নাই, আছে কেবল কবির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির অতি সূক্ষ্ম ও শূন্যময় কলাকৌশল। যে মানুষ অতিশয় মনোধর্ম্মী, যাহার চেতনা অতি জটিল জড়-সংস্কারের সমষ্টিমাত্র, সেই তথাকথিত আধুনিক মানুষ এইরূপ কাব্যরসে মুগ্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু মানুষের প্রাণ যেমন কোনকালেই মরে না, কবিও তেমনই কোনকালেই মরিবে না ; "The still sad cry of humanity" মানুষের কাব্য-প্রতিভা চিরদিন উদ্বুদ্ধ করিবেই। ব্যথা মানুষকে পাইতেই হইবে, এবং যেমন করিয়াই হউক তাহাকে হজম করিতেও হইবে। মন তাহাকে উড়াইয়া দিতে চাহিলেও, প্রাণ তাহাকে পাইতেই চাহিবে ; যে মানুষ এই ব্যথার সবখানিকে স্বীকার করিয়া ও বক্ষে ধরিয়া, তাহাকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছে, তাহারই কণ্ঠের বাণী শুনিবার জন্য মানুষ উৎকর্ণ হইয়া থাকে। তাই, এ যুগেও

আমরা সেই কবিকণ্ঠের গভীরতর বাণী শুনিতে পাইতেছি। যে বাণী যুগে যুগে রসাবেশের অজ্ঞান-মুহূর্ত্তে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে—অকূল আঁধারে বিদ্যুৎ-রেখার মত চমক লাগাইয়াছে, কিন্তু ভাগ্যবান ব্যতীত আর কাহারও চক্ষে যাহা স্থিররশ্মি হইতে পারে নাই—আজ সেই বাণী প্রাণের নিবিড়তম উৎকণ্ঠায় অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বমানবের শ্রুতিযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। সকল সংস্কার, সকল sentiment পরিহার করিয়া, কবি আজ স্থির অপ্রমত্ত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য হইতেই পৃথিবীর আর এক অংশে এক প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ জাতি জীবনকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইল—মশানের ক্রুস-কাষ্ঠে শূলবিদ্ধ অবস্থায় তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মানুষের ইতিহাসের যে অধ্যায়ে প্রাচ্যজাতি জরাগ্রস্ত, এবং পাশ্চাত্যও জীবন-নাট্যের অভিনয়ে যৌবন-লীলা প্রায় শেষ করিয়াছে—সেই কালেই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আর এক জাতি সংসারে ও সাহিত্যে নূতন পথে যাত্রা করিয়াছে; তাহার ফলে মনুষ্যত্বের ভিত্তিতল নূতন করিয়া উদ্ঘাটিত হইতেছে। নব জীবন-বেদের উদ্গাতা সেই রুশ-জাতির পরিচয় আজ আর কাহারও অবিদিত নাই; আমি, সেই জাতির সাহিত্যে যে কবিগণের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের বাণীর একটু পরিচয় দিব; এবং সে পরিচয় সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য একজন ইংরেজ মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করিব—আমার এ প্রসঙ্গে, তাহার অধিক নিষ্প্রয়োজন।

নব্য রুশ-সাহিত্যিক সর্ব্বত্র একটি প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন—"He is tormented by the desire for an answer to the question : Why is the world of men, what it is ?"

একেবারে সেই গোড়ার কথা—মানব-সংসার যেমন দেখিতেছি তেমন *হইল কেন?* *"He has looked upon it without blinkers,* without rose-coloured spectacles"—সেই যে দেখা সে দেখায় চোখে ঠুলি নাই, রঙিন চশমা নাই। "No other literature brings us into direct contact with life as Russian literature does"—জীবনের সহিত এমন প্রত্যক্ষ পরিচয় আর কোন সাহিত্যে নাই। "Tolstoy on the one hand and Dostoevsky on the other, seem completely to have explored the universe of human action and thought"—মনে হয়, Tolstoy ও Dostoevsky—সে সাহিত্যের দুই দিকপাল—মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের কোনও অংশ দেখিতে বাকি রাখেন নাই; এবং এমন করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন বলিয়াই, এই প্রশ্ন তাঁহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—এ ব্যবস্থা ভগবানের ব্যবস্থা, অতএব ইহাই ঠিক। এই উত্তরে যে-মানুষ আশ্বস্ত হইতে পারে, তাহাকে ভগবানের সাযুজ্যলাভ করিতে হইবে, নতুবা এই ব্যবস্থা যে ঠিক, তাহা বুঝিবার মত দৃষ্টিশক্তি সম্ভব নয়। এজন্য রুশ-সাহিত্যিক সে উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; এইখানেই তিনি সাধারণ মানুষের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই—'herein he shows his loyalty to humanity'। Anton Tchekov বলেন, যদি এইরূপ ব্যবস্থাই ভগবানের অভিমত হয়, তবে—"I must see with the eye of God"; যতক্ষণ তাহা না পারিতেছি, ততক্ষণ আমার পক্ষে এ হেঁয়ালির অর্থ নাই। Dostoevsky, তাঁহার 'The Brothers Karamazov'-গ্রন্থে দুই দিকই দেখাইয়াছেন। সাধারণ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিতে এরূপ মীমাংসা

অর্থহীন। Ivan Karamazov, কোনও একদিন সেই পূর্ণদৃষ্টি লাভ *করিলেও তাহাতে আশ্বস্ত হইবে না, কারণ, "the pain which has been suffered by one single child will make a discord; nothing can atone for it"*—এই ব্যবস্থায় একটি শিশুও যে যাতনা ভোগ করিয়াছে, তাহাতেই সেই সর্ব্ব-সঙ্গতির স্বর ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কিছুতেই সে দোষ কাটানো যাইবে না। কিন্তু এই গ্রন্থের অপর চরিত্র Aloysha-র কথা সম্পূর্ণ বিপরীত। সে এই সত্যকে প্রাণের মধ্যে অপরোক্ষ করিয়াছে, এই জগৎ-ব্যাপারের সঙ্গতি-বোধ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য—"There is no logic in this consummation : it is a miracle"—এই পরম জ্ঞানসিদ্ধি কোনও রূপ যুক্তিবিচারসাপেক্ষ নয়, এ যেন মানুষের চেতনাগহনে একটা অঘটন-ঘটনা। "Nothing short of a change of consciousness, a new way of apprehension could serve—the new way was opened to Aloysha"—জগৎ-ব্যাপারকে বুঝিতে হইলে মানুষের চেতনাকে বিপরীতমুখী করিতে হইবে, বুঝিবার দিক-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইংরেজ মনীষীর মতে রুশ-লেখক Dostoevsky মানবজীবন-গ্রন্থে এক নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া ধরিয়াছেন।

আমার কথায় এখনও আসি নাই, আরও একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলি আমার বড় কাজে লাগিবে, তাই প্রথমে তাহারই একটু আলোচনা করিব, এবং সেই সঙ্গে এই প্রসঙ্গের মূল প্রস্তাব আর একবার সংক্ষেপে উপস্থিত করিব।

৩

আমার এ কথা সত্যই অতি-পুরাতন, তাই নূতন করিয়া বলিতে গিয়া বলা আর হইয়া উঠিতেছে না—কখন সুরু করিয়াছি, এখনও শেষ হইল না! যে ভাবনা মানুষের প্রাণের অতি অন্তরঙ্গ—সকল কামনার অন্তস্তলে থাকিয়া যাহা মানুষকে যেন ভোগের মধ্যেই উদাসীন, ভয়ের মধ্যেই নির্ভয় করিয়া রাখে, তাহাকেই ধরিয়া কথার আকারে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছি। সে ভাবনা কি মানুষ সজ্ঞানে ভাবে? কারণ, সে তো ভাবনা নয়, সে যে প্রাণ-বল্লরীর মূলে নিত্য-সঞ্চারী সঞ্জীবনী রস! তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এইরূপ মনে হয়—কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা ধ্রুব-সত্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে এই জীবনকে মানুষ বরণীয় ও সহনীয় বলিয়া মনে করিতে পারে কি না? কোনও দেবতা নাই, দেবত্ব নাই—কোনও ঐশ্বরিক অভিপ্রায় নাই; কেবল এই জীবন ও জগতের সহিত প্রাণগত পরিচয় মাত্র আছে। মানুষ যাহা তাহাই; ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ জীবনে অপরিহার্য্য, এবং মৃত্যুর শূন্য-গহ্বরই শেষ গন্তব্যস্থান—এই জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুর অপেক্ষা না রাখিয়া, মানুষ জীবনকে সার্থক মনে করিতে পারে কি না? ধর্ম্মশাস্ত্র বা অধ্যাত্মবিদ্যা এ বিষয়ে মানুষকে স্বাভাবিকভাবে আশ্বস্ত করিতে পারে নাই,—তাহার সহজ জীবন-চেতনাকে খর্ব্ব ও তাহার মনুষ্যত্বকে পীড়িত করিয়াছে। মনুষ্যত্ব অর্থে আমি কোনও ভাব-সর্ব্বস্ব আদর্শ, বা কোনও মহত্ত্বের ধারণা করিতেছি না—সার্ব্বজনীন মনুষ্য-প্রকৃতির কথাই বলিতেছি; কারণ, তাহা না হইলে মানুষের মানুষ-হিসাবে বা ব্যক্তিহিসাবে কোনও আশা নাই, জন্ম-মৃত্যুর পরিধির

মধ্যে জীবনের কোনও অর্থ নাই। সে অর্থ বুঝিতে হইলে ইহলোক ও ইহজীবনকে অনির্দ্দেশ কল্পলোকে এবং কালাতীত মহাকালে প্রসারিত করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক তত্ত্বের দ্বারা জীবনকে অর্থবান করিয়া তুলিবার, এবং তদ্দ্বারা সান্ত্বনালাভ করিবার প্রবৃত্তি বা শক্তি যাহাদের নাই, তাহারাই নাস্তিক—আমিও সেই নাস্তিকের দলে। আমি মানুষের ভাগ্যকে কোনও কিছুর দ্বারা শোধন করিয়া লইতে পারি না; এই জীবনের যত-কিছু আধি-ব্যাধিকে মানবাত্মার পরীক্ষা, জগৎকে একটা পাপ-মোচন যন্ত্র, অথবা ক্রমোন্নতির আরোহণী—বলিয়া স্বীকার করিতে আমার বাধে। যদি কিছু সৎ বা সত্য কোথাও থাকে, তবে সে এই জীবনের অস্থির আবর্ত্তের মধ্যেই আছে; যদি না থাকে তবে তাহা কোথাও নাই—এই বুদ্ধি আমার চিত্তে দৃঢ়মূল হইয়াছে। পাপ-তাপ, দুঃখ-দৈন্য দূর হইবার নয়—উহারাই সৎ, উহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনই অনাবশ্যক; আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কামনা বা ভাবনা জীবিতের জীবন-বিকার মাত্র। অনাদিকাল অবধি মানুষের জীবন উহারই দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, উহাকে অস্বীকার করা জীবনেরই বিরুদ্ধাচরণ; এবং যেহেতু বাঁচিতে কেহই অসম্মত নয়, অতএব তাহা মিথ্যাচার। যাহারা দুঃখের সহিত সুখেরও উচ্ছেদ-সাধন করিতে যত্নপর, অথবা যাহারা দুঃখকে ফাঁকি দিয়া কেবল সুখ-সাধনের কৌশল উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত—তাহারা, রাজা, গুরু, ভগবান, রাষ্ট্র, সঙ্ঘ প্রভৃতি নানা নীতির নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া আজ পর্য্যন্ত শান্তি বা সুখের উপায় করিতেছে; কিন্তু এই সকলের তলদেশে মানুষের জীবন, তাহার ব্যক্তিগত ভাব-অভাব লইয়া, যেমন তেমনই বহিয়া চলিয়াছে, নব নব সংস্কারের বজ্র-বন্ধনেও

জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ এতটুকু পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এই যে সত্য, ইহাকে স্বীকার করিতেই হয়। জগতের দিকে চাহিলে ও নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই, জন্মের কারণ যেমন দুর্জ্ঞেয়, মৃত্যুও তেমনই অবধারিত ; এ দুই ঘটনার মধ্যবর্ত্তী যে আয়ুষ্কাল, এবং তাহাই বাহিয়া আমার যে চেতনা—আমার পক্ষে তাহা ছাড়া সত্য আর কিছুই নাই, আদি-অন্তের ভাবনা সম্পূর্ণ নিরর্থক। এই কালটুকুর মধ্যে যাহা আমার প্রত্যক্ষগোচর তাহাই সৃষ্টি, হয়তো বা সে আমারই সৃষ্টি—আমার বাহিরে সে কোথাও নাই, আমি না থাকিলে সে-ও থাকিবে না। আমি মানুষ বলিয়াই তাহাকে প্রত্যক্ষ করি, এবং মানুষ বলিয়াই সুখ-দুঃখময় জীবন ভোগ করি। আমার সেই মনুষ্যত্ব যত দুর্ব্বল, ততই আমি সুখ-দুঃখ আশা-ভয় প্রভৃতির দ্বন্দ্বে অবসন্ন হই ; আবার সেই মনুষ্যত্ব যত বলিষ্ঠ, ততই, হয় দুঃখ-নিবৃত্তির, নয় সুখ-সাধনের প্রাণান্ত প্রয়াস পাই। শেষ পর্য্যন্ত জীবন অর্থহীনই থাকিয়া যায়।

কিন্তু আমার মত নাস্তিক সুখ-দুঃখকে স্বীকার করিয়া, এবং কোনটাকেই অধিকতর মর্য্যাদা না দিয়া, জীবনে কেবল একটি মাত্র আশ্বাস চায় ; অমৃত নয়, সমস্যাপূরণ নয়, তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা নয়—আমি এই দুঃখের গ্লানি ও লাঞ্ছনার মধ্যেই, জীবনে যদি এমন কিছু প্রত্যক্ষ করি, যাহাতে যাইবার সময় দুই বাহু তুলিয়া বলিতে পারি—আমি ধন্য ! জীবন বৃথা হয় নাই, সেই এক বস্তুর সাক্ষাৎলাভে সকল ক্ষতি, সকল পরাজয়, সকল দুর্ভোগের মূল্য পাইয়াছি ! আমি তাহা করিয়াছি, তাই আমার কোনও দুঃখ নাই—জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করি না, মৃত্যুর মহাশূন্যে বিলীন হইতেও কাতর নহি। এই বস্তু কি, অতঃপর তাহাই

বলিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কাব্য-সাহিত্যে তাহার যে যুগ-যুগ সন্ধান ও চকিত-পরিচয়ের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, তাহার বাকিটুকু শেষ করিব।

কারণ, আমারই কথা মানুষ যে কতরূপে ভাবিয়াছে তাহার প্রমাণ ঐ কবিগণের মুখেই পাওয়া যায়—যদিও মূল কথাটি বেড়িয়া বেড়িয়া তাঁহাদের কল্পনা বার বার দূরে ঘুরিয়াছে। আমি কবিদের মানব-পূজার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি—মানব-পূজা জীবনেরই পূজা। কিন্তু এই জীবন-পুষ্পের মধু-সৌরভে একান্ত মুগ্ধ ও লুব্ধ হইলেও, কবির কল্পনা-ভৃঙ্গ মধুপাত্রে লগ্ন থাকিতে পারে নাই, গুঞ্জন করিবার জন্য ঊর্দ্ধে পরিক্রমণ করিয়াছে—বস্তুকে ছাড়িয়া, ভাবের অথবা ভাবনার আতিশয্যে দিশাহারা হইয়াছে। আধুনিক কবি জীবনকে এত সহজ নিশ্চিন্ত ভাবে বরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না—পূর্ব্বকালের অপেক্ষা একালের কবির জীবন-নিষ্ঠা আরও নিবিড় হইলেও, মন এক মুহূর্ত্ত হৃদয়কে বিশ্রাম দেয় না। আমাদের আধুনিক কাব্যেও এই দ্বন্দ্ব ভাল করিয়া জাগিয়াছে। 'বিসর্জ্জনে'র কবি জয়সিংহের জবানিতে যাহা বলিতেছেন, তাহা আনন্দের কথাই বটে ; কিন্তু সে আনন্দবাদ যেন নিষ্ফল বিদ্রোহের নিরুপায় সান্ত্বনার মতই শুনাইয়াছে। অথচ এই কথাগুলির মধ্যে জীবনের গূঢ় সত্যের আভাস রহিয়াছে। জীবনের দুঃখই যে সত্য নয়—সর্ব্বদুঃখের মধ্যে দুঃখবিস্মৃতির একটা নিরন্তর প্রেরণা বা প্রবৃত্তিই তাহার প্রমাণ। কবি বলিতেছেন—যাহা কিছু সত্য তাহাই দুঃখময়, সত্যের ভাবনা দূর না হইলে আনন্দ সম্ভব হয় না। মিথ্যাই আনন্দের কারণ—জীবনে যেখানেই সহজ আনন্দ আছে, সেখানেই বঞ্চনা আছে, মিথ্যা আছে—অতএব মিথ্যারই উপাসনা কর। মানুষ যে হাসে, আনন্দ-উৎসব করে, তাহার কারণ, জীবনের সেই স্তরে বা সেই অবস্থায় সত্যের ভাবনা থাকে না ;

এবং যেহেতু এত দুঃখ এত লাঞ্ছনা এত হিংস্রতার মধ্যেও জীবন-স্রোত কলহাস্যমুখরিত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে, ইহার মূলে কোথায়ও সত্য নাই—

সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি—তাই গাহিতেছি গান,
ওই দেখ পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোট কথা নিয়ে
এতই কৌতুক হাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী!
সত্য যদি হ'ত, তবে হ'ত কি এমন?
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা?
তাহা হ'লে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়
বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে,
মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি!
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়—
ফেটে গিয়ে সঙ্গীত নীরব হ'ত তার।
মিথ্যা ব'লে তাই এত হাসি; শ্মশানের
কোলে বসে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান; হিংসা-ব্যাঘ্রিণীর খর নখতলে
চলিতেছে প্রতি দিবসের কর্ম্মকাজ।
সত্য হ'লে এমন কি হ'ত!

—অর্থাৎ, জীবনে সহজ আনন্দ সম্ভব বটে, কিন্তু তাহার মূলে কোনও সত্য নাই। এই আনন্দ মিথ্যা, দুঃখই সত্য—এ কথা নাটকীয় চরিত্রমুখে ব্যক্ত হইলেও তাহা লিরিক-কবির আত্মগত উৎকণ্ঠারই নিদর্শন। জীবনের দুঃখ-সুখের কোন অর্থ নাই—এ কথা যেমন সত্য, তেমনই অর্থ

নাই বলিয়া, জীবন যে মিথ্যা—এই চিন্তাই সহজ জীবনধর্ম্ম হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিয়াছে। অতএব উপরি-উদ্ধৃত কবি-বাক্যে, আমার কথার ইঙ্গিত আছে মাত্র, পূর্ণ সমর্থন নাই। তথাপি ওই ইঙ্গিতটুকুর জন্যই আমি উহা উদ্ধৃত করিলাম—উহাও একপ্রকার সাক্ষ্য।

কাব্যে জীবনের কথাই মুখ্য হইলেও, কবির কল্পনা বা কাব্য-প্রেরণার যতই প্রসার ঘটিয়াছে, ততই প্রেম ও সৌন্দর্য্য—এই দুইটি ভাব, মানুষের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কবির ধ্যান-ধন হইয়া উঠিয়াছে; কায়া অপেক্ষা ছায়ার মোহ বাড়িয়াছে; আমরা যাহাকে জীবন বলি, তাহাকে একটা মায়াবরণে আবৃত করিয়া, কিংবা তাহাকে স্পষ্ট অস্বীকার করিয়া, একটি অপ্রাকৃত রসলোকের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; কবির কল্পনা-শক্তিই কবিকে একরূপ জীবন্মুক্তির অধিকারী করিয়াছে। প্রথম দিকে, কাব্যে মনুষ্যত্বের একটা আদর্শ, বা একটা অসাধারণ মহত্ত্বের পূজা চলিয়াছিল; পরে মনুষ্যত্বকেও দূরে ফেলিয়া ব্যক্তি-স্বতন্ত্র ভাব-সাধনাই কবিধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই জন খুব বড় ইংরেজ কবির কথা আমরা জানি—এক জন কীট্‌স, অপর জন শেলী। কীট্‌সের কবিকর্ম্মের পরিচয় অনাবশ্যক; কিন্তু তাঁহার কবিজীবনের সাধনা ও সমস্যা-সঙ্কটের কাহিনী নিরতিশয় চমকপ্রদ। কীট্‌সের ধ্যান ছিল—সুন্দরের। রূপ-জগতের রহস্য—ইন্দ্রিয়দ্বারে রস-দেবতার যে সাক্ষাৎকার—তাহারই আনন্দ-আবেশে, এই মূরতি-রতিরস-বিহ্বল কবি সর্ব্ব সংশয় নিরাকরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পায়ু সাধক সাধনার এক সোপান হইতে অন্য সোপানে দ্রুত আরোহণ করিবার কালে সহসা জীবনের যে মূর্ত্তি প্রাণ-চক্ষে

দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মানস-অভিমান ধূলিসাৎ হইয়া গেল; অবশেষে জীবনরসরসিক মানুষের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া তিনিই আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"They seek no wonder but the human face"। শেলীও সৌন্দর্য্য-ভাবসাধনার কবি; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য ঠিক রূপ-রস নয়—তাহা রূপাতীত, চিন্ময়। শেলীর প্রেমও তাই অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক। সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধারভূতা, সৃষ্টির নেপথ্যবাসিনী, 'আত্মমধ্যা' 'স্বয়ংস্থিতা', মর্ত্ত্যমলিনতামুক্ত সেই চিন্ময়ী-সত্তার ধ্যানে তিনি বাস্তবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন; এই মাটির জীবন, মাটির মানুষ তাঁহার অশেষ করুণা ও সহানুভূতি উদ্রেক করে সত্য, কিন্তু তাহার সেই অবস্থাই তাঁহাকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে; তাহার সেই মৃন্ময়তাই তাঁহার অশান্তি ও অধীরতার কারণ, তিনি তাহা এক মুহূর্ত্ত সহ্য করিতে পারেন না। তাই শেলীর কাব্য অবাস্তব ভাব-স্বপ্নেই মনোহর; সে গানের সুর নক্ষত্রলোকে প্রতিধ্বনিত হয় বটে, কিন্তু মানুষের মানবীয় আকুতির পক্ষে তাহা নিষ্ফল হইয়া আছে।

প্রেম ও সৌন্দর্য্য, কবি-কল্পনার এই দুই ভাব-বস্তু, এ পর্য্যন্ত সাহিত্যে নানা আকারে ও নানা ভঙ্গিতে বিচিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু মানুষের বাস্তব হৃদয়-বেদনার স্বরূপ ও তাহার মূল্য, কবিই কতক পরিমাণে অনুধাবন করিলেও, কবির কাজ হইয়াছে প্রধানত রসসৃষ্টি—ফুলকে ত্যাগ করিয়া ফুলের শোভা ও সৌরভের স্বপ্নজাল-রচনা। কবি ঠিক মানুষের সম-গোত্র নহেন, কবির দৃষ্টিতে যে নেশা আছে তাহা আমাদের আয়ত্ত নহে; কবির কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আমাদিগকেও কয়েক ধাপ উপরে উঠিতে হয়। কবির দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টিই বটে, তাই সে দৃষ্টি সাধারণ মানবের পক্ষে সত্য নহে। তথাপি আমরা এতকাল এই দৃষ্টির সাহায্যেই

জীবনের মহিমা ও মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছি। আজিও সেই কবি-প্রতিভাই জীবনকে আরও গভীর ও ঘনিষ্ঠ করিয়া আমাদের হৃদয়গোচর করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আমি সেই প্রসঙ্গেই রুশ-সাহিত্যের কথা তুলিয়াছি। এই সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ—'loyalty to humanity', এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কোনও নেশা নয়, কোনও রূপরসপিপাসার ঘোর নয়—মানুষকে একেবারে তাহার স্ব-প্রকৃতিতেই সৎ-রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার যে প্রাণময় দৃষ্টি—ইহাই সে সাহিত্যে কবি-প্রতিভার নূতনতম সাধনা। শেক্‌স্‌পীয়ারের কবি-কল্পনার objectivity বা তন্ময়তার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতেও আমরা রসাবেশের সাহায্যে একপ্রকার জীবন্মুক্তির অধিকারী হই—বাস্তবজীবনের বাস্তবতায় আশ্বস্ত হই না ; সাধারণ মানুষের পক্ষে সে অবস্থা দুর্লভ না হইলেও ক্ষণিক। আধুনিক কবি-কল্পনার মন্ময়তা বা subjectivity যে অপূর্ব্ব ভাব-রসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেও 'loyalty to humanity' নাই, কারণ তাহাও মানুষের বাস্তব হৃদয়-সংবেদনার ক্ষেত্রে অমূলক বলিয়াই মনে হইবে। আধুনিক ভারতীয় কবি-প্রতিভা, একান্ত ভারতীয় ভাবদৃষ্টির সাহায্যে, যে অপূর্ব্ব গীতি-রস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেও জীবন ও জগৎকে অতি ঊর্দ্ধগ কল্পনায় আত্মসাৎ করিবার পন্থা রহিয়াছে—অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব যেমন আর নাই, তেমনই বাহিরের বাস্তবতাও লুপ্ত হইয়াছে। এ কাব্যে, সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও প্রাণের পিপাসা অন্যোন্যসাপেক্ষ হইয়া এমন একটি তৃপ্তি ও আশ্বাসের সন্ধান দিয়াছে, এবং আত্মপ্রসাদ বা আত্মমহিমার উল্লাস এমন ভঙ্গিতে উদ্গীত হইয়াছে—যেমনটি বোধ হয় আর কুত্রাপি হয় নাই। সে কবির কণ্ঠে যখন শুনি—

যাবার দিনে এই কথাটি বলে' যেন যাই,
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতি-সমুদ্রমাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই,
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে' দিন তাই,
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥

—তখন মনে হয়, এই তো!—জীবনকে পরম আশীর্ব্বাদরূপে, এক মহাপূজার নির্ম্মাল্যরূপে, মাথায় করিয়া লওয়ার—জীবনের অতিরিক্ত আর কিছু আকাঙ্ক্ষা না করার—এমন বাণী যখন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? "এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে' দিন তাই"—ইহাই তো জীবনরস-রসিকতার—জীবনের মধ্যেই পূর্ণ চরিতার্থতা-লাভের চরম সাক্ষ্য! কিন্তু ইহাতেও 'loyalty to humanity' নাই; এ বাণী যে দিব্য-চেতনা হইতে উৎসারিত হইয়াছে, তাহার অধিকারী ভাব-সাধক কবি—সাধারণ জীবন-যাত্রী মানুষ নহে। 'বিসর্জ্জনে'র কবির পক্ষেই এ অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে; অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বকে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বরূপে উপলব্ধি করিয়াই, একটি ভাব-সত্যের উপলব্ধির দ্বারা সেই দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হওয়ার যে সাধনা, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জগৎ ও জীবনকে আত্মগত আদর্শে রূপান্তরিত করাই স্বাভাবিক—এই আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি সহজ জীবনধর্ম্মের আয়ত্ত নয়।

এই প্রত্যক্ষ বাস্তব মানব-সংসার ও মর্ত্ত্যসঙ্কটময় জীবন-যাত্রাকেই কবি যদি একান্তভাবে গ্রহণ করিতেন, তবে তিনি এত সহজে চরিতার্থ হইতে পারিতেন না। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-কল্পনা সীমাতেই সন্তুষ্ট নয়—সীমাতীত বিশ্বের, ও কালাতীত চিরন্তনের—এক অতি গভীর আত্মপ্রত্যয়লব্ধ আশ্বাসের বলে, তিনি জীবন ও মৃত্যুকে মিলাইয়া লইয়াছেন, এবং সর্ব্বভয় ও সর্ব্বসংশয় হইতে মুক্ত হইয়া এমন আনন্দ-বাদের কবি হইয়াছেন। *আমার সন্ধান—জীবনের মধ্যেই জীবনের* চরিতার্থতা, সর্ব্ব দুঃখ সর্ব্বনাশের মধ্যেই প্রাণের আশ্রয়লাভ; জীবনের রূপান্তর নয়, তাহাতে কোনও ভাব-সত্য বা ভাব-সৌন্দর্য্য যোজনা নয়—মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের মধ্যেই—সকল ক্ষতি সকল নিষ্ফলতার মধ্যেই—বলিতে পারি কিনা—

> অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে,

এবং—

> এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে' দিন তাই।

—কোনরূপ ভাব-সিদ্ধি নয়, সে হইবে বাস্তব জীবন-চেতনার ফল।

রুশ-সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম; সে সাহিত্যের প্রধান প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের আরও দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিব। এ সাহিত্যে, জীবনের সঙ্গতি-বোধ—সৌন্দর্য্য-সাধনার ফল নহে; এখানে মানব-ভাগ্যের বাস্তব রহস্য-ভেদের প্রয়াসই কবিধর্ম্ম—কবিকল্পনা এক নূতন পথের পথিক হইয়াছে। মানুষের মনঃপ্রাণ, তাহার চরিত্র বা কর্ম্মের মধ্য দিয়াই জীবনে যে রূপ পরিগ্রহ করে—তাহার ব্যক্তি-সত্তার সেই গূঢ়তম রহস্যকে পরম শ্রদ্ধা ও অসীম মমতার সহিত মানিয়া লওয়াই এ

সাহিত্যের প্রধান প্রেরণা। এজন্য, beauty নয়—good-এর এক নূতন অর্থ এই সকল লেখককে বিশেষভাবে ভাবিত করিয়াছে। আমাদের ভাষায় এই good-এর অর্থ সৎ—real বা true ; যাহা কিছু আছে তাহাই যে সৎ বা সদনুবিদ্ধ, এ চিন্তা আমাদের দেশে নূতন নয়। রুশ-সাহিত্যিক মানুষের জীবন বা মানবীয় সত্তাকেই সত্য-রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। টলস্টয়, ডস্‌টয়েভ্‌স্কি ও চেহভ-এর এই দৃষ্টিকে ইংরেজ সমালোচক বলেন—"an attitude of complete acceptance, that is to say, an apprehension of human life as something which in all its manifestations exists in its own right"। 'In all its manifestations'—অর্থাৎ, সে সৎ কোনও ভাব-সত্য বা বিশ্ব-সত্যের সৎ নয়, সর্ব্ববিধ ব্যক্তি-সত্তায় তাহা বিদ্যমান আছে। বহু ও বিচিত্রকে একের অনুগত করিয়া দেখা যেমন 'complete acceptance' নয়, তেমনই এক 'রস'কেই বহু ও বিচিত্রের মধ্যে আস্বাদন করাও 'complete acceptance' নয়। এই 'complete acceptance'-ই—loyalty to humannity ; ডস্‌টয়েভ্‌স্কির সাহিত্য-সাধনায় ইহার পরিচয় আছে। ডস্‌টয়েভ্‌স্কি তাঁহার সমগ্র সাহিত্যিক জীবন ধরিয়া ইহারই সন্ধান করিয়াছিলেন ; এবং Ivan Karamazov-এর মত মানুষের পক্ষে—অর্থাৎ, মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুই-ই প্রখর বলিয়া, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব যাহার মধ্যে প্রবল—সেই আধুনিক মানুষের পক্ষে, এই complete acceptapce দুরূহ হইলেও, ডস্‌টয়েভ্‌স্কি শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে জীবনধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুগত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছিলেন—Aloysha-চরিত্র তাহারই দৃষ্টান্ত। "How can man be reconciled to life? Is reconciliation and acceptance possible?"

ডস্‌টয়েভ্‌স্কির উত্তর—হাঁ, কিন্তু তার জন্য চাই—"a direct intuition of an essential harmony"। ইহাও একরূপ মিষ্টিক যোগ-পন্থা। ডস্‌টয়েভ্‌স্কির শেষ গ্রন্থ, The Brothers Karamazov অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে—*শেষ কথাটি তিনি বোধ হয় শেষ করিতে পারেন নাই।* আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কোথায় গিয়া পৌঁছিতেন, কে জানে? জীবন-রহস্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার মর্ম্মাঙ্কুর উৎপাটন করিতে কেহ পারে নাই—সেই রহস্যই সকল দুঃসাহসিককে গ্রাস করিয়াছে।

ইংরেজ সমালোচক এই প্রসঙ্গে, সেক্‌স্‌পীয়ার, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স, এমন কি বায়্‌রনের কাব্য-সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন—সকল কবির মধ্যেই এই প্রশ্নের সমাধান-প্রয়াস ছিল; তাঁহার মতে, রুশ-সাহিত্যেই সে সমাধান মিলিয়াছে। আমার মন তাহাতে সায় দেয় নাই—প্রয়াসের চূড়ান্ত হইয়াছে বলিতে আপত্তি নাই, কিন্তু উহাই যদি সমাধান হয়, তবে পাশ্চাত্য মানুষের পক্ষে তাহা নূতন হইতে পারে, আমাদের নিকটে নয়। আমি যে রুশ-সাহিত্যের উল্লেখ ও আলোচনা করিলাম, তাহার কারণ, সে সাহিত্যে সমস্যার সমাধান যেমনই হোক, তাহাতে যে 'loyalty to humanity' রহিয়াছে তাহা অপূর্ব্ব, আমার চিত্ত তাহাতেই আশ্বস্ত হইয়াছে। ডস্‌টয়েভ্‌স্কির কথাই বলিব। মানুষের ব্যক্তি-সত্তা ও সেই সত্তার নিয়তিকে সৎ বলিয়া বুঝিবার—তাহা যেমন তেমনই হইবার অধিকার যে তাহার আছে—ইহা ধারণা করিবার যে দিব্য প্রতিভা, তাহাই ডস্‌টয়েভ্‌স্কির গৌরব। কিন্তু ডস্‌টয়েভ্‌স্কির খ্রীষ্টান-সংস্কার এতবড় বিশ্বাসকে সুস্থ থাকিতে দেয় নাই; মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে এই

সৎ-বুদ্ধি দুঃখকে ভেদ করিতে পারে নাই। তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-সাধনায় এই দুঃখই সবচেয়ে বড় সমস্যা হইয়া আছে। খ্রীষ্টের পূর্ণ-মানবতাও তাঁহার চক্ষে, এই দুঃখের নিকটে পরাস্ত হইয়াছে—সেই অপরিসীম কারুণ্যের পরিণাম লক্ষ্য করিয়া তিনি হতাশ হইয়াছেন। The Idiot-নামক উপন্যাসে তিনি চরিত্রবিশেষের মুখে সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। হল্‌বাইন-(Holbein)-অঙ্কিত খ্রীষ্টের একখানি ছবি—কথাগুলি তাহারই সম্বন্ধে। ছবিখানির বিষয়—'ক্রুশ হইতে অবতরণ'। খ্রীষ্টের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ক্রুশকাষ্ঠ হইতে সদ্য নামাইয়া লওয়া হইয়াছে—সেই রক্তাক্ত বিকৃত মুখমণ্ডলে কি অসহ্য যাতনার চিহ্ন, শূন্য অক্ষিতারকায় সে কি অপরিসীম অসহায় ভাব! সচরাচর এরূপ চিত্রে, অসীম যাতনার মধ্যেও খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলা হয়; কিন্তু এই চিত্রে মানুষ-খ্রীষ্টের যত কিছু লাঞ্ছনা, দেহ-মনের অশেষ দুর্গতি, সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। "এই মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট ক্ষতবিক্ষত মুখ দেখিলে স্বতই মনে হয়—মৃত্যু এতই ভীষণ ও দুর্দ্দান্ত যে, যে-মহাপুরুষ তাঁহার জীবিতকালে অলৌকিক শক্তিবলে মৃত্যুকে আজ্ঞাবহ করিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তিনিও তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ইহার পানে চাহিলে, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত কি পৈশাচিক শক্তির সাক্ষাৎ-দর্শন ঘটে! সে যেন একটা অতিকায় দানব—যেমন মূক, তেমনই দুর্ব্বার! অথবা, সে যেন একটা আধুনিক কলকব্জাগঠিত বিরাট শক্তি-যন্ত্র; সেই যন্ত্র এমন এক বস্তুকে নিষ্পেষিত করিয়া গ্রাস করিয়াছে—সমগ্র জগৎ এবং তাহার যত কিছু তত্ত্ব অপেক্ষা যাহা মূল্যবান, সারা সংসার যাহার তুলনায় তুচ্ছ; এমন কি যাহার পদস্পর্শে পূত হইবার জন্যই যেন এই পৃথিবীর সৃষ্টি

হইয়াছিল!" উক্ত গ্রন্থের নায়ক Prince Muishkin-এর মধ্যে ডস্‌টয়েভ্‌স্কি মানব-রূপী খ্রীষ্টের পরম কারুণ্য ও তাহার চরম নিষ্ফলতা প্রকটিত করিয়াছেন। মানুষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার যেমন অন্ত নাই, তেমনই ওই এক প্রশ্ন তাঁহাকে বিকল করিয়াছে—"How can man be reconciled to life?" যে যোগ-সমাধির পন্থা—"direct intuition of an essential harmony"-র কথা ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন, ডস্‌টয়েভ্‌স্কি যে তাহা ভাবিয়াছিলেন, ইহা সত্য। তিনি এক আশ্চর্য্য উপায়ে তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের মৃগী-রোগ ছিল, ঐ রোগের আক্রমণকালে, যাতনায় অচৈতন্য হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে, তিনি দেহ-চেতনার ঊর্দ্ধে আর এক চেতনার আভাস পাইতেন—Prince Muishkin-এর তাহাই হইত। সে অবস্থার যে বর্ণনা তাহার মুখে শুনি, তাহা পাঠ করিয়া আমারও রোমাঞ্চ হয়; কারণ, আমাদের দেশেও, অতি অল্পদিন পূর্ব্বে এক সাধক মহাপুরুষের জীবনে ঠিক এইরূপ দৈহিক বিকার এবং তাহার ফলে ঠিক এই অবস্থার কথা আমরা শুনিয়াছি। আমি ডস্‌টয়েভ্‌স্কির কথাগুলির ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।—

These moments, short as they are, when I feel such extreme consciousness of myself, and consequently more of life than at other times, are due only to the disease—to the sudden rupture of normal conditions.

—ইহাও ব্যাধির ফল বলিয়া, তাঁহার সন্দেহ হইত যে, এ চেতনা উচ্চস্তরের নয়—নিম্নস্তরের; কিন্তু তখনই আবার মনে হইত, ব্যাধিই হউক আর যাহাই হউক—

—the moment seems to be one of harmony and beauty in the highest degree, unbounded joy and rapture and completest life—these instants were characterised by an intense quickening of the sense of personality.

—এ কথাও নূতন নহে—বহু পুরাতন; এমন যে ঘটে, তাহা বহির্জ্ঞানসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য মানুষের নিকটে অদ্ভুত মনে হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্জ্ঞানলুব্ধ প্রাচ্যের মানুষ ইহাতে চমকিত হইবে না। ব্যাধি বলিয়া যে সংশয়, সে সংশয় শেষে আর ছিল না—The Brothers Karamazov-গ্রন্থে Aloysha-র জীবনে তাহা অতি সহজ হইয়া দেখা দিয়াছে। অতএব এ কথা ঠিক যে, শেষ পর্য্যন্ত বাস্তব মানবজীবন-জিজ্ঞাসু এই মহাপ্রতিভাবান লেখক মিষ্টিক-পন্থার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

আমি ইহাই ডস্টয়েভ্স্কির প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করি না। মিষ্টিক-উপলব্ধি যতই সত্য হউক, তাহা মানুষমাত্রের সহজলভ্য বা সহজসাধ্য নহে। "An intense quickening of the sense of personality"-র কথা জানি—সে অবস্থা যতই উর্দ্ধস্তরের হোক, তাহা অ-স্বাভাবিক, এবং সে অবস্থায় জীবনের সহজ অনুভূতি লোপ পায়। এই যে ব্যক্তি-চেতনার অত্যধিক স্ফূর্ত্তি—ইহাতে ব্যক্তির যেমন মুক্তি ঘটে, তেমনই জীবনীবৃত্তিরও উপশম হয়, জগৎ ছায়া হইয়া যায়। অতএব ইহাও একপ্রকার সৃষ্টিকে অস্বীকার করা। কিন্তু ডস্টয়েভ্স্কির প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এই যে, তিনি শেষ পর্য্যন্ত যে তত্ত্বেই উপনীত হউন, জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—তেমন গভীর দৃঢ় ও নির্ভীক দৃষ্টি এ পর্য্যন্ত আর কোথাও মেলে নাই। জীবনের ব্যক্তিগত ও বস্তুগত মূল গ্রন্থিটিকে তিনি সজোরে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছেন, দুঃখকে

তিনি নস্যাৎ করিবার চেষ্টা করেন নাই, মানুষকে ছাড়িয়া প্রেম-সৌন্দর্য্যের ধ্যান করেন নাই, জীবনকে মার্জ্জিত পরিচ্ছন্ন করিয়া লইবার জন্য কোনও ভাবগত আদর্শ বা নীতিবাদের বশীভূত হন নাই। আধুনিক রুশ-সাহিত্যের মূলে যে সৎ-এর ভাবনা রহিয়াছে, তাহার কারণ—জীবনকে পূরাপূরি স্বীকার করিবার আকাঙ্ক্ষা। এই সৎ, জীবনের ঊর্দ্ধে বিরাজ করিতেছে না, মানুষের মনুষ্যত্বের মূলে অধিষ্ঠান করিতেছে। মানুষ যে দুঃখ পায়, তাহার কারণ সে সৎ—তাহার কোন কর্ম্মে সে তাহার সেই সৎ-প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করে না। সেই কর্ম্মের বিচারে কোনও বহির্গত নীতি নাই—তাই তাহা পাপও নহে, পুণ্যও নহে। কর্ম্মের ফল দুঃখ বলিয়াই, কোনও কর্ম্ম কু নহে। দুঃখ স্বতন্ত্র বস্তু, বরং এই দুঃখই তাহার আত্মচৈতন্য বা সৎ-চৈতন্য প্রবুদ্ধ করে। সকল কর্ম্মফল-ভোগের মূলে এই আস্তিক্যনীতি আছে, অতএব—"Human life in all its manifestations exists in its own right"।

আবার সেই দুঃখের কথাই আসিয়া পড়িল—মানুষের জীবনে উহার চেয়ে সত্য আর নাই, উহাই যেন একমাত্র কথা! বুদ্ধ হইতে ডস্‌টয়েভ্‌স্কি—প্রায় আড়াই হাজার বৎসর—ওই দুঃখের কথাই মানব-মনীষার একমাত্র উপজীব্য হইয়া আছে। তার পূর্ব্বে দুঃখ বোধ হয় এত বড় হইয়া উঠে নাই—মানুষের জীবন অপেক্ষাকৃত চিন্তা-মুক্ত, অতএব সুস্থ ছিল। আজ আমার মত একটা নগণ্য মানুষ এই দুঃখের ভাবনাকেই বড় করিতে চাহে না, আড়াই হাজার বৎসরের সংস্কার আমার মধ্যে বিদ্রোহ করিতেছে! বুদ্ধ, দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য, জীবনকে নির্ব্বাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন,—মানুষকেই নিঃসত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন; রুশ-সাহিত্যিক দুঃখকেই বরণ করিয়া

জীবনকে বা আত্ম-সত্তাকে আরও গভীর করিয়া আস্বাদন করিতে গিয়া, ক্ষুদ্র 'আমি'টা—সাধারণ মানুষের সহজ জীবন-সংস্কারটাই—. হারাইতে বসিয়াছিলেন। প্রাচ্য চায় দুঃখের নিবৃত্তি, পাশ্চাত্য চায় দুঃখের নেশা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সন্ধি ঘটাইয়াছে রুশীয় প্রতিভা। দুঃখকে সে যেমন অবস্তু বলিয়া পরিহার করিতে চায় না, তেমনই একটা অন্ধ দুঃখ-মত্ততাও তাহার নাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের একটি মন্তব্য বড়ই অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, ডস্‌টয়েভ্‌স্কি-প্রমুখ লেখকগণের অন্তরে রহিয়াছে—"the feeling that there is a secret of life which can be discovered only by a strange sacrifice, and that life must remain unintelligible until it is discovered"। কথাটা সুন্দর বটে, এবং মনে হয়, আমার কথাও যেন কতকটা তাই। কিন্তু এই 'Sacrifice' কথাটার অর্থ কি ? আমি যাহা ভাবিয়াছি, এবং ভাল করিয়া ভাবিবার জন্য এই লেখার ধুয়া ধরিয়াছি, উহা কি তাহাই ?

৪

"Secret of Life" বলিতে জীবনের কোনও অর্থ বুঝায় না, অর্থাৎ তাহাকে তর্ক-বুদ্ধির দ্বারা বুঝিয়া লওয়া যায় না ; সে একটা অপরোক্ষ অনুভূতি, এ কথা মানি। কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিবার—আবিষ্কার করিবার নয়, দেখিবার—দেখাইবার নয়। "Life must remain unintelligible"—এ ভাষাও ঠিক হয় নাই। Intelligible-কথাটাই

যে খারাপ! সবচেয়ে বড় কথা ওই—'Sacrifice'। কিন্তু আমার মনে হয়, কথাটির মধ্যে একরূপ সজ্ঞান দুঃখ-পাওয়ার বা স্বেচ্ছায় দুঃখ-বরণের ভাব আছে। দুঃখের ভূত কিছুতেই ছাড়ে না! এ সকলের মধ্যে একটা তত্ত্বচিন্তা ও দুরূহ সাধন-পন্থার ইঙ্গিত আছে; নতুবা, উপলব্ধি বা অপরোক্ষ অনুভূতির কথাটা ঠিক, এবং 'sacrifice' কথাটাও—অজ্ঞান ও অবশ আত্মবিসর্জ্জন অর্থে মানিয়া লইতে আপত্তি নাই। এইবার আমার কথা বলি।

যখনই সমষ্টির কথা চিন্তা করি, তখনই ব্যক্তি-আমির কথাটা চাপা পড়িয়া যায়। দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকলই সমষ্টিগত চিন্তার ফল; অথবা এমনও বলা যাইতে পারে, যাহা কিছু সমষ্টিগত, তাহাই ভাবনা বা চিন্তা; যাহা কিছু একান্ত ব্যক্তিগত, তাহাই ভাব বা অনুভূতি। সাহিত্য ব্যক্তির সৃষ্টি, তাই তাহা সাহিত্য; এবং তাহাতে যাহা সৃষ্টি হয়, তাহাও ব্যক্তি বা particular। তাই সাহিত্যেই আমরা কতক পরিমাণে জীবনের সত্য উপলব্ধি করি—দর্শনে বা ধর্ম্মতত্ত্বে নয়; কারণ, সেখানে আমরা ভয় পাই, পদে পদে ব্যক্তি-চেতনাকে লঙ্ঘন করার পীড়া অনুভব করি। জীবনের যে দুঃখ তাহা যতক্ষণ ব্যক্তিগত, ততক্ষণ—তাহা যতই তীব্র হউক—যে প্রাণ তাহাকে অনুভব করে, সেই প্রাণই তাহাকে বহন করিবার শক্তি রাখে, তাহা না হইলে মানুষ বাঁচিত না। সে দুঃখের আক্রমণ ও উপশম দুই-ই জীবন-ধর্ম্ম। মানুষ যখন জীবনের এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া, ভাবকে ভাবনায় প্রসারিত করে, এবং দুঃখকে জগতে ব্যাপ্ত করিয়া দেখে, তখনই দুঃখের অন্ত মেলে না, এবং সেই ভাবনাপ্রসূত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য নিষ্ফল চেষ্টারও অবধি থাকে না। তখনই জীবনের অর্থের কথা উঠে, এবং সে অর্থের নানা

অনর্থবাদে মানুষ শেষে মনুষ্যত্বহীন অথবা আত্মঘাতী হয়। যাহারা দুঃখকে কোনও তত্ত্বের সাহায্যে, বা অন্ধভক্তির অচৈতন্যের দ্বারা সহ্য করিতে চায়, তাহারা জীবনকে একরূপ অস্বীকারই করে। কিন্তু যাহারা খাঁটি নাস্তিক—যাহারা জীবনধর্ম্মই পালন করে, কোনও তত্ত্ব বা অর্থসন্ধানের ধার ধারে না—দুঃখকে তাহারা সহজ ভাবেই গ্রহণ করে, এবং জীবনে যদি স্বাস্থ্যের অভাব না ঘটে, তাহা হইলে দুঃখের মধ্যেও সুখের হাসি হাসে। বুদ্ধ আপনার দুঃখে অবসন্ন হন নাই, খ্রীষ্টও নয়। বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট যে ভাবনায় অস্থির হইয়াছিলেন—জীবন তাঁহাদিগকে সে ভাবনা ভাবিতে বলে নাই। সে ভাবনার ফল কি হইয়াছে? দুঃখ নিশ্চয়ই দূর হয় নাই, কেবল বাড়িয়াছে মাত্র; মানুষের মাথা আরও খারাপ হইয়াছে, জীবনের প্রতি মানুষের আস্থা কমিয়াছে, সর্ব্বশেষে মানুষ মৃত্যুর সাধনাই করিতেছে। আজ সহজভাবে জীবনযাপন করাই অসম্ভব, আমরা জীবন হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি; আজ—"the problem of life is to live"—প্রব্লেমই বটে!

এই দুঃখ, অর্থাৎ জীবনকে অস্বীকার করার যে পাপ, যুগে যুগে তাহাই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে—রুশ-সাহিত্যে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত-স্নানের বারি করুণার মন্দাকিনী হইয়া বহিয়াছে; সেই দুঃখই ডস্‌টয়েভ্‌স্কির মত সাহিত্যিকের দিব্যদৃষ্টিকেও বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়াছে। সেই করুণা এত অসীম ও বৃহৎ বলিয়াই সে দৃষ্টিতে মানুষের জীবন এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই করুণা যে দুঃখের ধ্যান করিয়াছে, তাহা একটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ তত্ত্ব মাত্র নয়,—লেখকের হৃদয় সর্ব্বত্র ব্যক্তি-বিশেষের হৃদয়রূপে স্পন্দিত হইয়াছে, বহু ও বিচিত্রের মর্য্যাদা কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হয় নাই; যদিও সেই দুঃখের জন্ম হইয়াছে

লেখকেরই কবি-চিত্তে, অর্থাৎ আত্মলঙ্ঘনকারী ভাবনা-কল্পনায়। এই করুণার একটি দৃষ্টান্ত দিব—কোন্ গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম মনে নাই, কিন্তু ডস্‌টয়েভ্‌স্কির অসাধারণ কবিশক্তির পরিচয়স্বরূপ সেই কাহিনীর মূল মর্ম্মটি আমার মনের মধ্যে এখনও গভীর হইয়া আছে। অতি দারুণ শীতের রাত্রি। জীবন-সংগ্রামে অবসন্ন অথচ দৃঢ়চিত্ত এক যুবা তাহার বাসগৃহে প্রবেশ করিতেছে—হোটেলের মত এক বাড়ির একখানি ঘরে সে ছিন্নকন্থায় রাত্রিযাপন করে। জীবিকাই তাহার একমাত্র সমস্যা নয়; হৃদয় ও মস্তিষ্ক এই দুইয়েরই অতিরিক্ত কর্ষণের ফলে, সে জীবনের যে রূপ দেখিয়াছে—তাহার দেশে, তাহার কালে, সমাজের অধস্তলে সে যে দুরপনেয় পঙ্করাশি দেখিয়াছে, তাহাতে জীবনে তাহার আর আস্থা নাই; আজই রাত্রে সে নিজেকে এই জীবন হইতে মুক্তি দিবে স্থির করিয়াছে। উপরতলায় উঠিবার সময়, সিঁড়ির নীচে যেখানে কয়লা প্রভৃতি থাকে, সেইখানে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল—অস্পষ্ট আলোকে সে দেখিতে পাইল, একটি শীতকাতর বালিকার অতি ক্ষুদ্র দেহ প্রায় অনাবৃত অবস্থায় কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। জীবনে যাহার কোনও আস্থা আর নাই, সেই নাস্তিক তৎক্ষণাৎ সেই বালিকার দেহ তুলিয়া লইয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিল, ও নিজের শয্যায় শোয়াইয়া অতি যত্নে জীর্ণ কন্থায় তাহাকে ঢাকিয়া দিল। তারপর, বাতি জ্বালিয়া এইবার সেই শিশুর দিকে ভাল করিয়া চাহিতেই সে যেন সহসা ভূত দেখিল! যাহাকে সে বালিকা মনে করিয়াছিল তাহার দেহ তেমনই বটে, কিন্তু এ কাহার মুখ! সেই শীর্ণ কোটরগত চক্ষু ও জ্বরতপ্ত ওষ্ঠে বারাঙ্গনার লালসা ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে! দেহে তাহার কিছুই নাই, তাহার বয়স কত—কে বলিবে? অনাহারে ও

ব্যাধির তাড়নায়—অতি অল্প বয়স হইতেই সে শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার দেহ শিশুর মতই ক্ষুদ্র। এ হেন জীবন যাপন করিয়া, এত কষ্ট সহ্য করিয়া—এই অবস্থাতেও—তাহার সেই হাব-ভাব, সেই দৃষ্টি! স্বভাবের কি বিকৃতি—অথচ কি অসাড় অজ্ঞান ভাব! যুবক যে চক্ষে সেই মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল—সে চক্ষু ডস্‌টয়েভস্কি ভিন্ন আর কাহারও নাই।

কিন্তু দুঃখের কথা নয়—যাহা বলিতেছিলাম। জীবন দুঃখময়, এমন কি দুঃখই জীবনের মূল সত্য, এ কথা মানুষ বহুদিন ভাবিতে শিখিয়াছে। আমার এই অতি-পুরাতন কথার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই দুঃখের কথাই বার বার আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ, এ ভাবনা এড়াইয়া চলিবার জো নাই, এবং দুঃখকে মানিয়া না লইলে জীবন-চেতনাকেই অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক, যত প্রকারই হউক, মানুষ এই দুঃখ সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকে; জীবন যদি দুঃখেরই হয়, তথাপি মানুষ জীবনেরই আদর করে। যাহারা করে না, তাহারা মহাপ্রাণ বা মহামনা—দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গিয়া তাহারা জীবনকেই অনাদর করিয়াছে। এই কথাই বলিতেছিলাম। দুঃখ যতক্ষণ ব্যক্তিগত, ততক্ষণ মানুষ জীবনেরই স্বাস্থ্য-শক্তির দ্বারা তাহাকে হজম করিয়া লয়; যাহারা অসুস্থ তাহারাই পারে না। কিন্তু দুঃখ যখন—খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের মত—নৈর্ব্যক্তিক হইয়া উঠে, তখন তাহার ঔষধ নাই; হয় নির্ব্বাণ, নয় স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনা করিতে হয়। তাহার কারণ, আপনার দুঃখ আপনি সহ্য করিবার উপায় আছে, কিন্তু বিশ্বমানবের দুঃখ দূর করা বা সহ্য করা ব্যক্তি-মানবের পক্ষে অসম্ভব। সৃষ্টির অভিপ্রায় তাহা নহে। ব্যক্তির দিকে চাহিয়া দেখ, সকল সুস্থ মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি

আছে, যাহাতে সে সর্ব্বদুঃখ সহ্য করিতে পারে এবং করিয়া থাকে; মানুষের জীবনের সেই শক্তি সকল বিষের প্রতিষেধক, তাহার কথাই চিন্তা করিয়া পরম বিস্ময় বোধ করি, এবং সেই বিস্ময়ই জীবনের মহিমাবোধ-রূপে আমাকে সর্ব্বসংশয়মুক্ত করে—জীবনের কোনও অর্থ-জিজ্ঞাসা আর থাকে না।

বৌদ্ধ-জাতকের একটি কাহিনী মনে পড়িল। জীব-জন্মের দুঃখ নিবারণকল্পে যে মহাত্মা তাঁহার শাক্যসিংহ-জীবনে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং অস্তিত্বের গূঢ় তত্ত্ব ভেদ করিয়া জন্ম-জরা-মৃত্যুর আবর্ত্তন-চক্র ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বপ্রাণ শূন্য-প্রেমিকের পূর্ব্বজন্মের একটি গল্প আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। মহাপরিনির্ব্বাণের তখন বিলম্ব নাই, একদিন নিত্যসহচর আনন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনার বিবাহ-দিনের একটি ঘটনা আমার বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। আপনি বরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, আপনার পাণিগ্রহণের আশায় শত শাক্য-কন্যা একে একে আপনার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল; এতগুলি সুন্দরী কুমারীর মধ্যে কেহই আপনার উদাসীন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। অবশেষে শাক্য দণ্ডপাণির কন্যা গোপা যেমনই আপনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অমনই আপনি যেন মন্ত্র-চালিতের মত তাঁহার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন, এবং পরমুহূর্ত্তে আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই পত্নীত্বে বরণ করিলেন। আজিও সে কথা স্মরণ করিয়া আমি আশ্চর্য্যবোধ করি।" তখন বুদ্ধ স্মিতহাস্যে আনন্দকে বলিলেন, "বৎস, তোমার বিস্ময় অমূলক নহে। গোপাকে দেখিবামাত্র আমার শত জন্মের কথা সহসা স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল—সে আমার শতজন্মের সুখদুঃখভাগিনী পত্নী, দেখিবামাত্র

তাহাকে চিনিয়াছিলাম। সে যে আমার কি ছিল, আমার একটি জন্মের কথা শুনিলে বুঝিতে পারিবে। সেবার আমি দক্ষিণদেশে সমুদ্রকুল হইতে কয়েক যোজন দূরে এক পল্লীতে ধীবরকুলে জন্ম লইয়াছিলাম; সমুদ্রতল হইতে মুক্তা-আহরণ করাই ছিল আমার জীবিকা। সংসারে আমি আর আমার পত্নী, আর কেহ ছিল না। তথাপি বড় কষ্টে দিন যাইত। বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস দূর সমুদ্রকূলে জীবিকাসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতাম; অতি সামান্যই জুটিত, তাহাতে সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদন ভালমতে নির্ব্বাহ হইত না। একবার ভাগ্য প্রসন্ন হইল, আমি একটি অতি বৃহৎ ও সুলক্ষণ মুক্তা পাইলাম। বড় আহ্লাদ হইল—এতদিনে দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচিল, সে মুক্তার বিনিময়-পণে বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিব। মুক্তাটিকে বক্ষে বাঁধিয়া, স্বল্পকালে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া দেশে ফিরিলাম—সঙ্গে সঙ্গে সকল আনন্দ নির্ব্বাপিত হইল। দেশে তখন দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে; খাদ্যশস্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; যত দিন যাইতেছে ততই মৃত্যুসংখ্যা বাড়িতেছে, কত লোক যে মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দারুণ আশঙ্কায় অস্থির হইয়া গৃহে ছুটিলাম—বোধ হয় আমার দুঃখিনী পত্নী বাঁচিয়া নাই, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গৃহে পৌছিয়া দেখিলাম, তখনও মরে নাই বটে, কিন্তু মরিতে বিলম্ব নাই—বহুদিনের অনাহারে শীর্ণ মৃতবৎ পড়িয়া আছে। তখন আমি আহার্য্য-সংগ্রহের জন্য বাহির হইলাম, এবং শত শূন্য বিপণি পার হইয়া প্রথম যেখানে শস্যের সন্ধান পাইলাম, সেইখানেই গলবন্ধনী হইতে মুক্তাটি ছিঁড়িয়া লইয়া, কয়েক মুষ্টি তণ্ডুলের বিনিময়ে তাহা ফেলিয়া দিলাম, এবং গৃহে আসিয়া সেই তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া

মুমূর্ষু পত্নীকে বাঁচাইলাম। সে কি আনন্দ! রাজ্যসুখ, চিরদৈন্যের অবসান—সকলই তুচ্ছ মনে হইল; সেই মুক্তার বিনিময়ে যাহা লাভ করিলাম আর কিছুই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হইল না! সেই প্রাণাধিক প্রিয়জনকে ভুলিব কেমন করিয়া? তাই এ জন্মেও দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিয়াছিলাম—গোপাই আমার সেই পূর্ব্বজন্মের পত্নী।"

এ গল্পও সাহিত্য—তত্ত্বকথা নয়। তখনও বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ হয় নাই; দুঃখ তখনও ব্যক্তিগত ও মানবসুলভ ছিল বলিয়াই এত সহজে মৃত্যুর বুকেই অমৃত-আস্বাদন ঘটিত। ইহাই সহজ এবং লোকায়ত। মৃত্যু প্রতি পলে জীবনের উপরে হানা দিতেছে; সর্ব্বনাশের খরপ্রবাহকূলে মানুষ কুটির বাঁধিয়া বাস করে, সে কুটির প্রতি পলকে ভাঙিয়া ভাসিয়া যায়। দূর হইতে চাহিয়া দেখ—সে কি দৃশ্য! হাহাকার-ধ্বনিতে কান রাখিতে পারিবে না। কিন্তু নিজের প্রাণে নিজের জীবনে মানুষের মত করিয়া দৃষ্টিপাত কর, আপনাকে অনুভব কর, দেখিবে সে এক পরম রহস্য—বিষ এবং বিষের ঔষধ দুই-ই পাশাপাশি মিলিয়া জীবনকে এক অপরূপ ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছে। এই সহজকে আমরা চিন্তার দ্বারা জটিল করিয়া তুলি, মানুষের মন মানুষের প্রাণকে উত্যক্ত করিয়া তোলে। জীবনের গূঢ় রহস্য—Secret of Life চিন্তার দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না, জীবনানুভূতির মধ্যেই তাহাকে অপরোক্ষ করা যায়। কিন্তু এই সহজ এতই সহজ যে, ভাব ও অভাবের মধ্যে ইহার লুকাচুরি কিছুতেই ধরা যায় না, ভাবনার স্পর্শমাত্রে ইহা লুকাইয়া পড়ে। একমাত্র কবিগণই দিব্য-প্রেরণার মুহূর্ত্তে ইহাকে কচিৎ ধরিয়া ফেলেন, কিন্তু বার বার হারাইয়া যান—সহজ জটিল হইয়া উঠে, যাহা অতি নিকট তাহা অতি দূর ঊর্দ্ধে অবস্থান

করে, যাহা করামলকবৎ তাহাই বিপুল ও বিরাট হইয়া চিত্তকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে।

রুশ-সাহিত্যের প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ সমালোচকের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিয়াছি—উক্তিটি আমার পক্ষে মূল্যবান। তিনি বলেন, সে সাহিত্যের সর্ব্বত্র একটা ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে—"it is a feeling that there is a secret of life which can be discovered only by a strange sacrifice, and that life must remain unintelligible until it is discovered"। এ কথাও নূতন নহে, ভারতীয় চিন্তায় ও সাধনায়—এমন কি হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে—নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির মধ্যেও, একটা sacrifice-তত্ত্ব স্থান পাইয়াছে; স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার 'যজ্ঞকথা' নামক গ্রন্থে, ইহাই গভীর পাণ্ডিত্য ও গভীরতর ভাবদৃষ্টির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার মধ্যেও তপস্যার ভাব আছে, জীবনের সহজ তত্ত্ব নাই। Sacrifice বা আত্মাহুতির তত্ত্বই যদি সৃষ্টির, তথা মানব-জীবনের মূল রহস্য হয়, তবে তাহাকে এমনভাবে বুঝিয়া, তারপর তাহার অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন নাই; ঐরূপ একটা নীতির সজ্ঞান অনুষ্ঠান করিতে হইলে, উহার আনন্দ একরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের আনন্দ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের ভাবনায় যেমন হউক—জীবনে তাহার প্রয়োজন হয় না। সৃষ্টির যাহা তত্ত্ব, তাহা জীবনে, অতি সহজে অবশে অজ্ঞানে অনুষ্ঠিত হইবার কথা। যখনই তাহা মানুষের ভাবনার বস্তু হইল, তখনই তাহা একটা সমস্যা বা অর্থযুক্ত কিছু হইল। সুখ ও দুঃখের সংস্কার মানুষের প্রাণে এমন করিয়া জড়াইয়া থাকে যে, উহার কোনটাকে ভাবের মধ্যে পৃথক করিয়া লওয়া সম্ভব হয় না, প্রয়োজনও

হয় না। মানুষ দুঃখকেও বরণ করে সুখের জন্য, এবং সেই সুখের কতখানি যে দুঃখ তাহা তাহার মনেই হয় না। ইহাই রহস্য, ইহাই—Secret of Life।

এই যে রহস্য—ইহাকে কি নাম দিব? নাম দিতে গেলেই তর্ক উঠিবে; এবং যাহাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া ধারণা করিতে চাই—পুরাতন নামের সংসর্গে তাহার প্রকৃত পরিচয় নানা অর্থে বিরূপ হইয়া উঠিবে। আমরা সচরাচর যাহাকে প্রেম বলি, তাহা এবং তাহার উচ্চতম অভিব্যক্তি ইহার অন্তর্গত বটে; কিন্তু ইহা জীবনের কোনও একটি বিশেষ প্রবৃত্তিমূলক নহে, পরন্তু সর্ব্বপ্রবৃত্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। মানুষ, কত ভাবে, কত সম্পর্কে, জীবনের প্রতিক্ষণে ইহার প্রমাণ দিতেছে—কত অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, হিসাববুদ্ধিহীন, এবং সম্যক ধারণাহীন প্রবৃত্তির প্ররোচনায় এই 'sacrifice'-এর অনুষ্ঠান করিতেছে—তাহা লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। সে স্ত্রীপুত্রপরিবারের জন্য যাহা করে, তাহাও কি সব সময়ে প্রেমের বশে?—প্রেমিক তো সকলে নয়! যদি বল—স্বার্থের জন্য, তবে স্বীকার করিতেই হইবে, স্বার্থের জন্যই সে স্বার্থ ত্যাগ করে, সেও তো কম রহস্য নয়! আসল কথা, ও রহস্যের নাম নাই—উহাই জীবন-স্রোতস্বিনীর স্রোতোবেগ; উহারই বশে, জন্ম-উৎস হইতে মৃত্যুসাগর পর্য্যন্ত, এই "দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন" নিরন্তর তরঙ্গ-তাড়িত হইয়াও অক্ষুণ্ণ ধারায় বহিয়া চলিতেছে।

কি বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! মানুষকে বাদ দিয়া, ব্যক্তিকে ছাড়িয়া, আবার সেই তত্ত্বের নিরাকারে আসিয়া ঠেকিয়াছি! জীবনের রহস্য যাহাই হউক, আমি দেখিয়াছি মানুষকে। জীবনের যে রহস্যের কথা বলিতেছিলাম, মানুষের প্রাণ-প্রবৃত্তির সেই

সার্ব্বজনীন লক্ষণ অতিশয় ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান। আমার নিজের মধ্যেও নিশ্চয়ই তাহা আছে, কিন্তু তাহা আমার জ্ঞানগোচর নয়, কারণ নিজের মধ্যে নিজেই তাহা দেখিবার নয়—তেমন দেখায় জীবনেরই যেন বারণ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য হই এই ভাবিয়া যে, এত দুঃখ, এত শোকতাপ ও ব্যাধির যাতনা সহ্য করিয়াও আমি তো জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাই নাই, কোনরূপ আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার প্রয়োজন তো আমার হয় নাই! যে জীবনের আলোক-অন্ধকারে আমি ক্ষণিকের জন্য চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, সেই জীবন—এত ক্ষতি-ক্ষয়, ভয়-লাঞ্ছনা সত্ত্বেও—আমার নিকটে অশুচি, অসুন্দর বা মিথ্যা হইতে পারিল না! আমি তো জীবনে প্রেমের অমৃত আস্বাদন করি নাই, যশ অর্থ কিছুই লাভ করি নাই—তবে কিসের নেশায় কোন্ মোহে আমি তাহার স্তুতি-গান করি? জীবনের পরপারেও কোন-কিছুর প্রতি আমার লোভ নাই, এবং মরিতেও আমার দুঃখ নাই। তবে ইহার কারণ কি? আমি আমার বাহিরে, সুবৃহৎ মানব-সংসারে জীবনের অমৃত-রূপ দেখিয়াছি; হয়তো কবিরাই আমাকে সে রূপ দেখাইয়াছেন, তথাপি পরের ভিতর দিয়াই আমি তাহাকে আশ্চর্য্যরূপে অপরোক্ষ করিয়াছি। আমি কবির চক্ষে দেখিয়াছি, তাই আমার নিজের জীবন সে পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে নাই; তোমরা যাহারা সেই বস্তু পাইয়াছ—তাহারাই তাহাকে জান না, আমি পাই নাই কিন্তু জানিয়াছি; এবং না পাইয়াও যে আনন্দ তাহাই আমার পক্ষে—"a strange sacrifice"। আমি আমার জীবনের সকল ব্যর্থতা সকল নৈরাশ্য, সকল না-পাওয়া সেই পরম রহস্যের পদতলে অঞ্জলি দিয় ধন্য হইয়াছি। জীবনের সেই রহস্যকে প্রেম নামে অভিহিত করিতে

দ্বিধা বোধ করিয়াছি সত্য—তাহার কারণও বলিয়াছি, তথাপি যখনই তাহাকে ধ্যান করি, তখনই তাহার সুস্পষ্ট সাকার মূর্ত্তি আমার মানসপটে প্রেমরূপেই প্রকাশিত হয়, মনে হয়, উহাই "জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী"—উদ্বেল অশ্রুসায়রের মাঝখানে উহাই নিত্যস্ফুট আনন্দ-শতদল। কেহ তাহার মধু, কেহ সৌরভ, কেহ বা তাহার শোভামাত্র প্রাণের মধ্যে সম্বল করিয়া এই পাথারে সন্তরণ করিতেছে। প্রত্যেকের জীবনে—চিৎ-স্ফূর্ত্তির মাত্রাভেদে—সেই পরম বস্তুর নিত্যপ্রকাশ ঘটিতেছে, তাই মৃত্যু প্রতিপদে প্রতিহত হইতেছে, দুঃখের বিষদন্ত দংশন-মুহূর্ত্তেই ভাঙিয়া যাইতেছে, সর্ব্বনাশও সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিতেছে। ঐ বস্তু আছে বলিয়াই জীবন অসৎ নহে—জন্ম-মৃত্যুর অত্যাচার মানুষের পক্ষে কোনরূপ অবমাননা নহে। সারাজীবন ধরিয়া ইহাই দেখিলাম। বহুদিন পূর্ব্বে, যখন জীবনের সহিত পরিচয়মাত্র সুরু হইয়াছে, তখনকার সেই একদিনের একটি কাহিনী এখনও ভুলি নাই—জীবনকে সেই আমার প্রথম প্রণাম। আজ যৌবনের শেষে জীবনকে শেষ-নমস্কার জানাইবার দিন আসিতেছে—তাহাকে তেমনই প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে পারিব।

তখন আমি দূর পল্লী-প্রবাসে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলাম; বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। মুক্ত-প্রকৃতির বক্ষে বিচরণ করিয়া, দিবাবসানে তাঁবুতে ফিরিয়া—সারাদিনের নব নব অভিজ্ঞতা, কখনও বিষণ্ণ কখনও বিমুগ্ধচিত্তে, চিন্তা করিতাম। জীবনকে এমন ভাবে দেখিবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে আর ঘটে নাই। তখন সামান্যের মধ্যে আসামান্যকে দেখিয়াছি, অতি সাধারণ গ্রাম্য নরনারীর চরিত্রে কবি-কল্পিত মানবীয় মহিমা, এবং স্বচ্ছন্দজাত আরণ্য-পুষ্পে নন্দন-শোভা

দেখিয়াছি। একদিন উন্মুক্ত প্রান্তর-সম্মুখে বসিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে সূর্য্যাস্ত-শোভা দেখিতেছিলাম—সে শোভা এতই স্নিগ্ধ ও সুন্দর যে তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন এক গ্লাস শীতল জল পান করিয়া শ্রান্তিজনিত পিপাসা দূর হইয়া গেল। হঠাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, আমার সেই নির্জ্জনবাসে এক পথিক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সঙ্গে এক ছয় সাত বৎসরের বালক। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার বাড়ি এখান হইতে অনেক দূর, সে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে তাই এই গ্রামেই কোথাও রাত্রিবাস করিবে। তাহার একপ্রকার শূল-রোগ হইয়াছে, তাই সে আর কাজকর্ম্ম করিতে পারে না; নহিলে তাহারও জোত-জমা ছিল, আত্মীয়-কুটুম্ব ছিল। তাহার ছেলে অনেকগুলি। বড়টির বয়স ষোল-সতরো বৎসর হইবে, চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও, যখন রেশমের কাজ ছিল, তখন সেই ছোট ছেলেটি ওই অঞ্চলের এক কুঠিতে 'কোয়া' কাটিয়া কিছু উপার্জ্জন করিত। এখন সে পথও বন্ধ হইয়াছে। পথিক বলিল, "বাবু, খোদা আমাকে বড় দয়া করিয়াছেন—আমার ছেলেরা কেউ কানা খোঁড়া নয়। আর এই যে দেখিতেছেন—এ যে কেন আমার ঘরে আসিল জানি না,—আমা ছাড়া ও জগতে আর কাহাকেও চায় না। আমার সঙ্গ ও কিছুতে ছাড়িবে না, দিনে চার পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিবে, সারা বৎসর আমার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইবে—ক্লান্তি মানিবে না। উঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলে কাঁদে, আবার তখনই উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলে; ভিক্ষার চাউল যতটা পারে আপনি বহিবে, আমাকে সবটা বহিতে দেয় না। ও যে কেন আমার ঘরে আসিল, তাহা খোদাই জানেন!" আমি সেই দুঃখীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম—তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতেছিলাম। ভিখারী বিদায় হইলে,

আবার সেই সূর্য্যাস্ত-শোভার দিকে চাহিলাম—সে শোভা তখন ম্লান হইয়া আসিতেছে, আর এক আকাশের বর্ণ-গরিমায় আমার মনশ্চক্ষু তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। ভাবিলাম, ইহাই জীবন—কি অপূর্ব্ব, কি সুন্দর!

সেই অতি ক্ষুদ্র কাহিনীতে সেদিন যাহা বুঝিয়াছিলাম, আজ এতকাল পরেও দেখিতেছি, তাহাই চরম ও পরম। কল্পনায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য ঘুরিয়াছি, কাব্যে ইতিহাসে মানুষের কত গভীর কত বিচিত্র পরিচয় পাইয়াছি, জ্ঞান ও বুদ্ধির কত উপদেশ শুনিয়াছি, কত তর্কের সূক্ষ্ম আলোচনায় মনের অভিমান চরিতার্থ করিয়াছি—কিছুতেই জীবনে আশ্বাস পাই নাই, বাঁচিয়া থাকার কোনও সদর্থ কোথাও মেলে নাই। এখন বুঝিয়াছি—অর্থ সত্যই নাই, আছে কেবল এক অপূর্ব্ব রহস্যের চিত্ত-চমৎকার। তাহাকে যে নাম দাও ক্ষতি নাই; 'প্রেম' বল, বা 'a strange sacrifice' বল, তাহাতে যায় আসে না। আমি কেবল কবির কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই—"অপরূপকে দেখে গেলেম দুইটি নয়ন মেলে।" এ অপরূপকে আমি জীবনের মধ্যেই দেখিয়াছি; জীবনের বাহিরে, ভূমা বা অসীমায়, তাহার শাশ্বত .প দেখিবার আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই। বরং "এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই" না বলিয়া আমার মন বলে—শেষ আর কোনখানে হইতেই পারে না, শেষ এইখানেই; কারণ, জীবন যে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ—সেই তো সবচেয়ে বড় আশ্বাস!

আমার কথাও এইখানে শেষ করিলাম।

আশ্বিন ১৩৪৪

পুঁথির প্রতাপ

সেকালে ছাপাখানা ছিল না, বই ছিল বড় কম, তাই পড়ুয়াদের অসুবিধা হইত; জ্ঞান-বিস্তারের অনেক বাধার মধ্যে এইটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। কিন্তু কেবল ছাপাখানা কেন, এত কাগজই বা ছিল কোথায়? পুঁথি লিখিবার উপকরণ কত কষ্টে, কত ফন্দিফিকির করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত, তাহাও আমরা জানি। এই জন্য তখনকার কালে গ্রন্থকার বা লেখক হওয়া সহজ ছিল না। আর আজ! এত রকমের এত কাগজ ছাপাখানার মুদ্রাঙ্কিত হইয়া এত পরিমাণে নির্গত হইতেছে যে, পড়ুয়ারা হাঁপাইয়া উঠিতেছে; ছাপা-কাগজ ওজনদরে বিক্রয় করিয়াও নিঃশেষ করা যায় না! এখন লেখা মানেই ছাপা; এবং ছাপার দৌলতে খাতা মাত্রেই গ্রন্থ; লেখক মাত্রেই গ্রন্থকার। সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করিলে এই একটি বিষয়েই কি আশ্চর্য্য উন্নতি আমরা দেখিতে পাই! বিদ্যা কত সুলভ, সভ্যতার কি প্রসার!

তখনকার কালে লিখিবার উপকরণ পর্য্যন্ত দুর্লভ ছিল—ছাপাখানা তো স্বপ্নেরও অগোচর! পুস্তকের সংখ্যা অতিশয় অল্প হওয়ায় পাঠার্থীর সময় বা সুযোগ আবশ্যকমত ঘটিয়া উঠিত না—আজ পথে ঘাটে দেওয়ালের কাগজগুলাতেও যাহা পড়িয়া লওয়া যায়, সেকালে বহু অনুসন্ধানেও তাহা মিলিত না। এককালে ক্ষুধার অন্নই জুটিত না; আজ অক্ষুধা ও দুষ্ট ক্ষুধার খাদ্যও বিনা আয়াসে লভ্য হইয়াছে, ছাপা-কাগজ ও বহির স্তূপ চারিদিকে জঞ্জালের মত বাড়িয়া উঠিয়াছে—পড়িবার অবকাশই নাই; নিশ্বাস রোধ হইয়া উঠে।

পুস্তকের এই প্রাচুর্য্যে সমাজের কতখানি লাভ হইয়াছে? বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতা—ছাপাখানারই সৃষ্টি, পুস্তকে প্রচারিত মতবাদ ও তাহারই শততম প্রতিধ্বনির বিকৃত প্রেরণাই আজ ইতর-ভদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই অনুপ্রাণিত করিতেছে। আজিকার শিক্ষা একান্তই পুঁথিগত শিক্ষা; প্রকৃতিগত প্রেরণা বা জীবন-সত্য আজ সাক্ষাৎভাবে মানুষের শিক্ষার প্রয়োজনে লাগে না;—ভগবৎ-প্রণীত গ্রন্থ হইতে বিদায় লইয়া আজ মানুষের মন ছাপা কাগজের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। এই শিক্ষার বিস্তারে আধুনিক সমাজ মদগর্ব্বে অধীর; সেকালের নিরক্ষরতা বা পুস্তকসম্পর্কহীন জীবনের সঙ্গে আজিকার এই ছাপা-কাগজে-মোড়া জীবন তুলনা করিতেও তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন। অথচ, শিক্ষার যে ধারণা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কতকগুলি পুঁথির বচন আবৃত্তি করিতে পারার নামই শিক্ষা; এই বচন যাহার যত বেশি পরিমাণে আয়ত্ত হইয়াছে—যত বেশি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম, ও সেই সঙ্গে, তাহাদের সম্পর্কিত বিচিত্র তথ্য যে যত অবলীলাক্রমে ও তাচ্ছিল্য-ভরে উদ্ধৃত করিতে পারে, সেই তত শিক্ষিত। এমন শিক্ষা দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িবে না কেন? ছাপাখানার অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনের অভাব নাই, রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিয়া দিক্‌দিগন্ত ভরিয়া তুলিতেছে।

কিন্তু শিক্ষার এই অবারিত প্রচার সত্ত্বেও, কাল্‌চার ও সভ্যতার তুঙ্গতম শিখরে উঠিয়াও, আজ মনুষ্য-সমাজ মহাবিনাশের আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া আছে। বিদ্যাবিস্তারের এত যন্ত্র এত কারখানা, এবং সে বিষয়ে এতখানি সাফল্য সত্ত্বেও মানুষ জ্ঞানের দ্বারা অভয় লাভ করিল না! এ শিক্ষা এখনও আপামর সাধারণের আয়ত্ত হয় নাই—ছাপা পুঁথি ও ছাপা কাগজের নেশা এখনও সমগ্র জাতিকে পাইয়া বসে নাই, তাহার জন্য কত

খেদ, কত দুঃখ! কিন্তু সমাজের যে স্তরে এই শিক্ষা সংক্রামিত হইয়াছে, তাহারা কোন্ অমৃত আস্বাদন করিয়াছে? প্রাণে মনে, আত্মায় বা দেহে, তাহারা কোন্ শক্তি লাভ করিয়াছে, যাহা আর সকলের ভাগ্যে ঘটে নাই বলিয়া শোক করিতে হইবে? মানুষের আধিভৌতিক দুঃখ দূর করাই অবশ্য জ্ঞানের চরম লক্ষ্য নয়; বরং জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়াই মানুষ স্বর্গচ্যুত হইয়াছে—এই পুরাণ-কাহিনী এক অর্থে সত্য। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাদম্ভী মহাজনেরা বলিয়া থাকেন, শিক্ষাই চতুর্ব্বর্গ-লাভের একমাত্র উপায়—স্বর্গে ফিরিয়া যাইবার একমাত্র পথ। সে কি এই শিক্ষা? হয়তো বা তাই-ই। কারণ এ শিক্ষা মানুষকে স্বার্থ সম্বন্ধে সজ্ঞান করে, "অয়ংনিজঃ পরোবেতি"—এই সংস্কার দৃঢ় করিয়া দেয়। জীবন একটা যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে অপর সকলকে বঞ্চিত বা পরাজিত করিয়া নিজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইবে—ইহাই ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মজ্ঞান পাকা করিবার জন্যই এ শিক্ষার প্রয়োজন, এবং এই শিক্ষা আপামর-সাধারণে ব্যাপ্ত হউক, তাহা হইলেই পৃথিবী স্বর্গোদ্যানে পরিণত হইবে! যাহারা যে পরিমাণে 'শিক্ষিত', তাহারা সেই পরিমাণে জীবন-যুদ্ধে জয়ী—অর্থাৎ, আর সকলকে শত্রুরূপে জয় করিয়া বৈষয়িক সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অশিক্ষার ফলেই সকলে তাহা পারিয়া উঠিতেছে না, শিক্ষার গুণে সকলের স্বার্থবোধ পাকা হইয়া উঠে নাই। এই জন্য শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন; যাঁহারা শিক্ষিত মহাপুরুষ, তাঁহারা অশিক্ষিত জনগণের জন্য বেদনা অনুভব করেন। এই বেদনা অনুভব করা, এবং তাহার তাড়সে শিক্ষা-বিস্তারের আন্দোলন—শিক্ষিত সভ্যজনের অবশ্যকর্ত্তব্য; জনহিতকর কর্ম্মে উৎসাহ দেখাইলে সমাজে প্রতিপত্তি বাড়ে, সেও আত্মপ্রতিষ্ঠার আর একটি উপায়। যাহারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, স্বার্থ ই যাহাদের

পরমার্থ—মানব-প্রেম বা বিশ্বহিত যাহাদের মনের একটা আইডিয়া মাত্র—তাহারা এই শিক্ষারই বিস্তার কামনা করে কেন? তাহারা কি সত্যই কামনা করে—আপামর সাধারণ সকলেই শিক্ষিত হইয়া আপন আপন পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লউক, স্বার্থসংঘাত আরও বৃদ্ধি পাইয়া জীবন-যুদ্ধে একটা মহামারীর সৃষ্টি হউক? শিক্ষার অর্থ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য একালে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য শিক্ষিতগণের এই আগ্রহ—নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিবার এই চেষ্টা—কি কখনও আন্তরিক হইতে পারে? যদি হয়, তবে এই বুদ্ধি যাহাদের, তাহারা কোন্ শ্রেণীর বুদ্ধিমান? রহস্য ইহাকেই বলে।

আসল কথা এই যে, এহেন শিক্ষা—এই ছাপাখানা-প্রসূত সুলভ বিদ্যা—সভ্যতার বাহন হইতে পারে, মানুষের পক্ষে ইহা জীবনপ্রদ নহে। জীবন ভগবানের দান, সভ্যতা মানুষের সৃষ্টি। যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, যাহার ফলে দেহে স্বাস্থ্য ও চিত্তে প্রসন্নতা জন্মে, যাহা মানুষকে আত্মার বলে বলীয়ান করে—দেহধারণের জন্য অনিবার্য্য যে দুঃখ সেই দুঃখকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা নয়, তাহাকে স্বীকার করিয়াই তদূর্দ্ধে নিজকে স্থাপনা করিবার শক্তি যে শিক্ষায় সম্ভব—সে শিক্ষার উপায় কেবল পুঁথির সংখ্যা-বৃদ্ধি নয়; ভূরিপরিমাণে ছাপার অক্ষর উদরস্থ করাইলেই মানুষকে মানুষ করা যায় না।

পুঁথির সংখ্যা যত অল্প হয় ততই ভাল, কারণ, ভাল পুঁথি কখনও সংখ্যায় বেশি হইতে পারে না। আবার, সকলেরই মানস-প্রকৃতি সমান নয়, সকলেই পুঁথির সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। লিখিতে ও পড়িতে পারার যাদুবিদ্যাটি কাহাকেও ধরাইয়া দিলেই, সেই যাদুবলে পুস্তক হইতে পুস্তকান্তরে ভ্রমণ করিয়া এবং এক ধরনের

চিন্তাপদ্ধতি অভ্যাস করিয়া সে যে জ্ঞানের শিখর হইতে শিখরে উপনীত হইবে—এইরূপ ধারণা আজকালকার শিক্ষাতত্ত্বের মূলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ, মানুষকে মানুষভাবে না দেখিয়া তাহাকে কতকগুলা বৃত্তিসম্পন্ন যন্ত্ররূপে দেখাই আজকালকার বৈজ্ঞানিক সত্য-দর্শন; কারণ, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মন ছাড়া আর কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করাই মধ্যযুগীয় কুসংস্কার। এই মনোবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ-সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য; এবং ইহাদের সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম গবেষণার ফলে যে কতকগুলি নিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে মানুষমাত্রকে একটা সাধারণ শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া জ্ঞানবান করিয়া তোলা যায়—প্রাকৃতিক অন্যান্য ফসলের মত মানুষের মনটাকেও বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতিতে উৎকর্ষিত করা সম্ভব ও একান্ত আবশ্যক—এইরূপ মত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতেও খুব ঘটা করিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব মনুষ্যত্বমূলক নয়; সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যক্তিভেদে মানুষের যে আধ্যাত্মিক অধিকার-বৃদ্ধি—আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য তাহা নহে। দেহ-মন-প্রাণের মিলিত উপলব্ধির দ্বারাই যে সত্যকে পাওয়া সম্ভব, যাহা দুই ব্যক্তির পক্ষে কখনও এক হইতে পারে না, অথচ যাহার সাহায্যে ব্যক্তি-মানুষ বহুর মধ্যে নিজের স্থানটি নির্ব্বিরোধে ও নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া লইতে পারে, এবং আপনার বিশিষ্ট অধিকার বা দাবির সীমানা স্বীকার করিয়াই—যাহা উদার ও বৃহৎ, মহৎ ও সীমাহীন, তাহার মধ্যে অনায়াসে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে—এই অতিরিক্ত অহংজ্ঞান বা মানস-ব্যক্তিত্বের বিকাশে, মানুষ সেই সত্য হইতে ক্রমেই দূরে গিয়া পড়িতেছে! এইরূপ মানসিক উৎকর্ষের অভিমানেই পুঁথিগত বিদ্যার

এত আদর; কেবল জানা—আর কিছু নয়, মানাও নয়; কর্ম্ম-প্রেরণার মধ্যে, অথবা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, সেই বিদ্যাকে জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। এক কথায়, ইহা মুখস্থ করিলেই হইল, আত্মস্থ করিতে হয় না।

যদি আত্মস্থ করিবার প্রয়োজন থাকিত, অথবা বিদ্যাকে যদি সত্য-সাধনায় প্রয়োগ করিতে হইত, তবে মানুষ এত পুঁথি লিখিত না, এত বিদ্যা গলাধঃকরণ করিতে পারিত না। যদি এ শিক্ষা সত্যকার শিক্ষা হইত, ইহা যদি মানুষের স্বাভাবিক আত্মবিকাশের সহায় হইত, তবে এমন আগাগোড়া যান্ত্রিক প্রণালীতে বিধিবদ্ধ হইতে পারিত না। যাহাকে আমরা উচ্চ শিক্ষা বলি—পর্ব্বতপ্রমাণ পুস্তকরাশি বা বিরাট পাঠাগার যাহার আশ্রয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য কুঠুরি যাহার কারখানা—সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কয়জনের আত্মজাগৃতি ঘটিয়াছে? কয়জনের মনীষা মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছে? কয়জন পুঁথির বাহিরে আপন কথা খুঁজিয়া পাইয়াছে? পুঁথিবিদ্যাহীন অশিক্ষিত জনের তুলনায় কোন্ সত্যকার' অর্থে তাহারা শিক্ষিত? না, তাহারা আরও আত্মভ্রষ্ট, আরও জড়তাগ্রস্ত? পুঁথিগত বিদ্যার অনর্গল আবৃত্তি ছাড়া, চর্ব্বিতচর্ব্বণমূলক গবেষণার কৃতিত্ব ছাড়া—শক্তি ও স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে ও প্রেমে তাহাদের কয়জন, ঐ শিক্ষার ফলেই, উন্নতি লাভ করিয়াছে? একটি বিষয়ে তাহারা লাভবান হয়—অশিক্ষিতকে হঠাইয়া দিয়া স্বার্থসাধনে সিদ্ধিলাভ করে; সমাজে অমনুষ্যত্ব ও অসত্যের প্রতিষ্ঠায় তাহারা যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। এই পুঁথিসর্ব্বস্ব বিদ্যা মানুষকে চতুর করিয়া তোলে; বিদ্যার যে সারতত্ত্ব গহন গভীরে নিহিত থাকে, যাহাকে আত্মার দ্বারা আত্মসাৎ করিতে হয়, যাহা সংক্ষিপ্ত মন্ত্রের আকারে

কয়েকখানি পুঁথি হইতেই শিক্ষার্থীর হৃদ্‌গত হইয়া থাকে, এবং সেই মন্ত্রের সাহায্যে স্বকীয় সাধনায় মানুষের অন্তরে যাহার উন্মেষ হয়—ইহা সেই বিদ্যা নহে। এ-শিক্ষা আত্মপরিচয়মূলক নয়—বস্তুপরিচয়মূলক; ইহাকেই বলে—materialistic। ইহা আয়ত্ত করিতে পারিলে চালাক হওয়া যায়, স্বার্থসাধনে সফলমনোরথ হইয়া দশজনের একজন হওয়া যায়, প্রেমধর্ম্ম ন্যায়ধর্ম্ম ও সত্যধর্ম্মকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বলিয়া অহংধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

আমি পুঁথির কথাই বলিতেছিলাম, প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার কথা আসিয়া পড়িল। আধুনিক কালে পুঁথির শ্বাসরোধকর সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিলে কাহার মনে ভীতির সঞ্চার না হয়? মনে হয়, সভ্য-সমাজে বৎসরে যতগুলি মানুষ জন্মিতেছে, মুদ্রাযন্ত্র তাহার অনেক বেশি পুস্তক প্রসব করিতেছে। এ যেন পুঁথির মহামারী! মানুষের আহার্য্যের পরিমাণ অপেক্ষা ছাপা-কাগজের পরিমাণ যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সকল ছাপা-জঞ্জাল যদি অধিকাংশ নষ্ট না হইয়া স্তূপাকার হইয়া উঠিত, তাহা হইলে গ্রন্থাগারের স্থান সংকুলান করিতে মানুষের বাসস্থান সংকীর্ণ হইয়া পড়িত। তথাপি এই গ্রন্থারণ্য চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিতেছে, মানুষের মনের জানালায় আর মুক্ত আকাশ নাই; আপনি ভাবিবার অবকাশ নাই—পুস্তকই তাহার জন্য সকল ভাবনা ভাবে। পয়সা খরচ করিলেই বড় বড় কথা, ভাল ভাল ভাব, নানা তথ্য এবং তাহার সঙ্গে পরিপাটী যুক্তি ও চিন্তার পসরা অলস মনের দুয়ারে আসিয়া হাজির হয়; সেইগুলিকে মস্তিষ্কের কোটরে সাজাইয়া রাখিতে পারিলেই হইল। কোটরের সংখ্যা যদি একটু বেশি হয়, এবং সাজাইবার যদি একটু কৌশল থাকে, তাহা হইলেই মহাবিদ্বান হওয়া যায়। আধুনিক সভ্যতার

কি মহিমা!—কল টিপিলেই জল পাই, বোতাম টিপিলেই আলো পাই, বুকশেল্‌ফের চাবি ঘুরাইলেই বিদ্যা পাই! পুরাকালে ছাপাখানা ছিল না, তাই কেতাব এত সস্তা ছিল না; দুই চারিখানি পুঁথি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইত, তাই বিদ্বানের সংখ্যা এত কম ছিল; এখন যত বই, তত বিদ্বান! তাই আজ মানুষের কত উন্নতি, কত সুখবৃদ্ধি হইয়াছে! জ্ঞানবৃদ্ধির তো কথাই নাই, বালকের মুখেও স্বাধীন-চিন্তার বুলি; ধর্ম্মে অবিশ্বাস, সত্যে সংশয়, হৃদয়-বৃত্তিকে পরিহাস, ভূত ভগবান ও প্রেমকে একই কুসংস্কারের কোঠায় ঠেলিয়া ফেলা—এ সকলের মূলে আছে ছাপা বহির ছাপা কথা। আধুনিক মানুষের জীবিত-সংস্কার ঐ পুঁথির মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে, পুঁথির বুলি ছাড়া তাহার প্রাণমূলে আর কিছুর প্রেরণা নাই।

তবু বলে—আমরা মুক্ত, আমরা স্বাধীন! আমরা শাস্ত্র অর্থাৎ পুঁথির অধীন নই; জীবন! জীবন!—আমরা একান্তই জীবনের ভজনা করি। ইহাও পুঁথির বুলি, পুঁথি ছাড়া ইহারা স্বপনেও বাঁচিতে পারে না। ইহারা কথায় জীবন যাপন করে, তাই আজকাল এত পুঁথি, এত পত্রিকা। জীবন নয়—বচন, জীবনীশক্তি ঐ বচন-রচনেই নিঃশেষ হইয়া যায়; মানুষ কেহ নয়—সকলেই লেখক। লেখক ও পাঠকে বিশেষ প্রভেদ নাই; কারণ, জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, নিজস্ব ভাব-চিন্তা—কাহারও নাই; যে লেখে সেও পড়া-পুঁথির পরস্ব বুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, নানান ছাঁদে সাজাইয়া, মানস-বিলাস করিয়া থাকে; যে পড়ে, সেও তাহাই করিয়া থাকে; তবে সেটা কাগজে-কলমে না করিয়া মনে মনে করিয়া থাকে। তাই লেখকের প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা নাই—আছে এক প্রকার গোষ্ঠী-প্রীতি; কারণ, সকলেই এক জাত, একই বড় আড্ডার ইয়ার।

যাহারা আজকালকার সাহিত্যিক—অর্থাৎ সেই ধরনের জীবনরসরসিক, তাহাদের কথাই বলিতেছি; ইহারা পুঁথি মানিয়া চলে না, জীবনকেই মানে—তাই দিবারাত্রি কেবল পুঁথিই লিখিতেছে! জীবনের সম্বন্ধে যাহাই হউক, পুঁথিকে ইহারা জাতিচ্যুত করিয়াছে—পুঁথি এখন কাপড়-জামা-জুতার সামিল হইয়াছে।

পুঁথিই যাহাদের জীবন—জীবনের সাধনার ফল পুঁথি নয়, ছাপাখানাকেই তাহারা জন্মগৃহ করিয়াছে। জীবন যে একটা পৃথক বস্তু, এই হতভাগ্যদের সে ধারণা নাই। পুস্তক হইতে পুস্তকান্তরে ইহারা ক্রমাগত জন্মগ্রহণ করিতেছে—পুস্তকেই জন্ম এবং পুস্তকেই বংশবৃদ্ধি। তাই যতই "জীবন! জীবন!" করিয়া চীৎকার করে, ততই রাশি রাশি পুঁথি রচনা করে। মানুষের যেমন নখ-চুল গজায়, ছাঁটে আবার গজায়—ইহাদের পুঁথিগুলাও সেইরূপ গজায়; ছাঁটে আবার গজায়। উহাই জীবন-বৃদ্ধির একমাত্র লক্ষণ—তাহাও নখ-চুল ছাড়া আর কিছুই নয়; সেই একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি, এবং সে বস্তু নিতান্তই বাহিরের উপসর্গ—অন্তরিন্দ্রিয়ের সম্পর্ক তাহাতে নাই।

সেকালে জীবনের সঙ্গে পুঁথির সম্বন্ধ ছিল অন্যরূপ। যে প্রতিভাবান মানুষ, জাতি সমাজ ও বিশ্বের সঙ্গে গভীর অনুভূতিযোগে যুক্ত হইয়া জীবনের কোনও এক রূপ প্রত্যক্ষ করিত, সেই ছিল কবি, ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা। সে ব্যক্তি, যে একটি বাণীকে দেহ-মন-প্রাণের অন্তরতম ঐকতত্ত্বে উপলব্ধি করিয়া, মৃত্যুরূপী মহাকালের বদ্ধমুষ্টি হইতে অমৃত-খণ্ডিকার মত ছিনাইয়া লইতে পারিত—যাবজ্জীবন তপস্যায় সে তাহাকেই, মানুষের শাশ্বত উত্তরাধিকার-স্বরূপ, পুঁথির পাতার অক্ষর-সঙ্কেতে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। তাহারা জীবনে সত্যের সাধনা করিত,

নিমেষের খেয়াল-খুশি বা মনোবিলাস নয়—মানুষের সমগ্র জীবন, জন্ম ও মৃত্যু, আদি ও শেষ, ব্যক্তি ও বহু, আত্ম ও পর তাহাদের ধ্যানের বস্তু ছিল। সে সত্য কেবলমাত্র "আধুনিক" হইতে পারে না; যুগে যুগে বংশ-পরম্পরাগত মানব-মনীষা যাহাকে আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে, অতীত ও অনাগত বুদ্ধগণের তপস্যায় যাহার উপলব্ধি পূর্ণতর হইয়া উঠিবে—কোনও যুগের একজন মানুষের পক্ষে তাহার আদি ও অন্ত নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়, কণামাত্র আহরণ করাই এক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। সারা জীবন ধরিয়া তেমনই একখানি পুঁথি যদি সে লিখিতে পারে, তাহাই তাহার চরম কীর্ত্তি। বিষয়-বিশেষে সে পুঁথি ছোট বা বড় হইতে পারে, কিন্তু তাহার বাণী যদি সত্য হয়, তবে সে পুঁথির বড়-ছোট ভেদ নাই। জগতে তেমন পুঁথি বেশি নাই; কারণ তেমন মানুষ বেশি জন্মে নাই; এবং সে মানুষও, তাহার যতখানি বলিবার, তাহার বেশি বলে নাই। মিছা কথাই পরিমাণে বেশি হয়—'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর'। বিস্তর যাহা, অর্থাৎ লেখার বাহুল্য অংশ যাহা, তাহা আপনিই ঝরিয়া পড়ে—এমনই পড়িয়াছে, তাই উৎকৃষ্ট পুঁথির সংখ্যা আজও অধিক হইতে পারে নাই। আজ যে মহা মহা গ্রন্থাবলী—পুস্তকাধার ভারাক্রান্ত করিতেছে, তার মূলে আছে ছাপাখানার পাপ। পুস্তকের পরিমাণ ও কলেবর বৃদ্ধি—আজকাল যেমন বড় লেখকদেরও প্রলোভন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেকালের অবস্থায় তাহা হইতে পারিত না; অসার রচনাও এমন ভাবে রক্ষিত হইবার উপায় তখন ছিল না, তাই লেখক অসংযমী হইলেও, অনাচার আপনি রুদ্ধ হইত।

সেকালের পুঁথির দুর্ভিক্ষ কি কল্যাণকর ছিল? আধুনিককালে ছাপাখানা ও পুস্তকের ব্যবসায় মানুষের মনোজীবনের স্বাস্থ্যনাশ

করিয়াছে। একজন মানুষের মানসিক পুষ্টির জন্য কয়খানা পুঁথির প্রয়োজন? হজম করিবার শক্তি থাকিলেও কেবল পুস্তকের সংখ্যার উপরে মনের উৎকর্ষ নির্ভর করে না। যাহার যেটুকু শক্তি, তাহার সেই শক্তি বাড়িয়া উঠিবার পক্ষে পুঁথি কেবল অবলম্বনের কাজ করিতে পারে; কিন্তু পুঁথির দেওয়াল দিয়া সকল দিক ঘেরিয়া রাখিলে, তাহার নিজ জীবনের সত্য—জ্ঞানে কর্ম্মে পল্লবিত হইতে পারে না। এ কথা মানি যে, যাহার মধ্যে কিছু আত্ম-পদার্থ আছে, সে এই পুস্তকারণ্যে প্রবেশ করিলেও দিশাহারা হয় না; কিন্তু এ কথাও না মানিয়া পারি না যে, এই বিরাট পুস্তকপ্রাচীরবদ্ধ দূষিত হাওয়ায় সুস্থ মনও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

সেকালে পুঁথি মানুষের মনোজীবন খর্ব্ব করিত না,—তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ, তখন জীবনের পথ রোধ করিয়া এমন পুঁথির পর্ব্বত খাড়া হইয়া উঠে নাই। ইহা ছাড়া আরও কারণ আছে। তখন বিষয় ও অভিপ্রায় ভেদে, সেই অল্পসংখ্যক পুঁথিরও বিদ্যাহিসাবে পৃথক প্রয়োজন সুস্পষ্ট ছিল; এজন্য শিক্ষার্থীর বুদ্ধিভেদ ঘটিত না। লৌকিক ও পারমার্থিক—দ্বিবিধ বিদ্যার দ্বিবিধ অধিকার বিদ্যার্থী বুঝিয়া লইত, একের তত্ত্ব অন্যের উপরে চাপাইত না; বিজ্ঞানের বস্তুতত্ত্ব, দর্শনের যুক্তিতত্ত্ব, ভজন-সাধনের দেহতত্ত্ব, কলাশিল্পের রসতত্ত্ব এবং পরাবিদ্যার আত্মতত্ত্ব—জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়ভেদে, সকলেরই পৃথক মূল্য ছিল। এখন সকল বিদ্যাই মহাবিদ্যা, যে যাহা জানে তাহার অধিক সত্য আর কিছুই নাই—জীবনকে দেখিবার পদ্ধতি অন্ধের হস্তী-দর্শনের মত। কেবল তাহাই নয়—সমগ্র-দৃষ্টির প্রয়োজনই নাই, কারণ তাহা সম্ভব নয়। মানস-বুদ্ধির অতিরিক্ত চালনায়, প্রত্যেক বিদ্যার অনুশীলনে যে অহংজ্ঞান বা ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায় তাহাতে, সর্ব্ববিদ্যার অতিরিক্ত যে বিদ্যা—

জীবন-জিজ্ঞাসা বা আত্মজ্ঞান—তাহার অবকাশ আর থাকে না, বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ অন্তর্হিত হয়। যাহারা বিদ্যা ও অবিদ্যা—দুইয়েরই সাধনা করিয়াছিল, অথচ উভয়ের অধিকার সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজ্ঞান ছিল; যাহাদের মতে, 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে'—তাহারা কোনও বিদ্যারই অনুশীলনে সত্যভ্রষ্ট হইত না, জীবন ও সৃষ্টির মূলে যে পরম রস-রহস্য নিত্য বিরাজমান, তাহার উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইত না।

আরও এক কারণ এই যে, সেকালের সেই সকল সংখ্যাবিরল দুর্লভ পুঁথি যাহারা রচনা করিত, তাহারা আজিকার মত পেশাদার লেখক ছিল না; ছাপাখানার বিরাট জঠরের বিরাট ক্ষুধা মিটাইবার জন্য, অর্থোপার্জ্জনের জন্য, অথবা জীবদ্দশায় যেটুকু সম্ভব আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য—তাহারা লেখনী ধারণ করিত না। সে সকল পুঁথির দুইটি শ্লোকের মধ্যেও যাহা গ্রথিত হইত, তাহা জীবনব্যাপী সাধনার ফল—লেখনীকণ্ডূয়ন তাহার কারণ নয়। সেরূপ একখানা পুঁথির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে একটা নূতন দৃষ্টিলাভ হইতে পারে; তাহার ফলে পাঠকেরও আত্মজাগরণ হয়, কারণ, "The touch of Truth is the touch of Life"। আজকালকার অধিকাংশ পুস্তকে আছে কি? অতি পুরাতন সত্যের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ—তাহাতে পানীয় অপেক্ষা ফেনার ভাগই বেশি; অথবা, কে একজন একটা অর্দ্ধসত্য উচ্চারণ করিয়াছে—তাহারই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় চীৎকার ছাপার হরফে সহস্র ভঙ্গিমায়, শততম অনুকরণের বিকৃত আকারে, পৃথিবীর অযুত সাহিত্য-পণ্যশালা প্লাবিত করিতেছে। এই ধ্বনির প্রতিধ্বনিও মৌলিকতার দাবি করে। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, উহার ধ্বনিটাই যখন আসল বস্তু—মূলে বাক্-ব্রহ্মের লেশমাত্র নাই—তখন প্রতিধ্বনিই বা

মৌলিক হইবে না কেন? অনুকৃতির মধ্যেও স্বর-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে।

বিষয়টির নাম দিয়াছি—পুঁথির প্রতাপ, সে প্রতাপ যে কতখানি বাড়িয়াছে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম; তাহার কারণ, এই পুঁথি-ব্যাধি আমাদের দেশেও মহামারীর আকার ধারণ করিতেছে। যাঁহাদের সত্য-চৈতন্য এখনও লোপ পায় নাই, আধুনিক জীবনের আর এক মিথ্যা—এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারঘটিত ব্যাপার—তাঁহাদের অগোচর নাই। এ কালে মানুষের জীবন যে কত দিকে কত প্রকারে পীড়িত ও হতশ্রী হইয়া উঠিতেছে—প্রাণের স্বাস্থ্য, মনের শুচিতা, ও দেহের বল যে কেমন করিয়া লোপ পাইতেছে, অথচ অহঙ্কারের অন্ত নাই—তথাকথিত শিক্ষার বিস্তাব ও পুঁথির প্রাচুর্য্য তাহারই আর এক নিদর্শন। এ সভ্যতা বর্ব্বরতার বিপরীত হইতে পারে; কিন্তু বর্ব্বরতার মধ্যেও সত্য আছে—সেই সত্যকে সুন্দর করিয়া তোলার যে সাধনা, এ সভ্যতায় তাহা নাই। ইহা সত্যকে সুন্দর করে নাই, মিথ্যাকে সত্যের মুখোস পরাইয়াছে, তাই সুন্দরের অভিনয় করাই ইহার কৃতিত্ব; কিন্তু সেই অভিনয়-নৈপুণ্য সত্ত্বেও আদিম বর্ব্বরতা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ হইয়া পড়ে—মিথ্যার প্রলেপে তাহা আরও কুৎসিত, আরও বীভৎস হইয়া উঠে। এ যুগের বিদ্যানুশীলন ও সাহিত্য-সেবাও তদ্রূপ; তাহাতে চালাকি আছে, নৈপুণ্য আছে, চমক লাগাইবার কৃতিত্ব আছে; কিন্তু সত্য-সন্ধান নাই, আত্ম-জিজ্ঞাসা নাই, জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার সৎসাহস নাই, মৃত্যুকে জয় করিবার দুর্ম্মদ প্রতিভা নাই। তাই একালের এই গ্রন্থ-প্লাবন একটা ভয়াবহ মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে, রোগ-বীজাণুর মতই ইহার বৃদ্ধি দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছে।

বৈশাখ, ১৩৪১

সংবাদপত্র ও সাহিত্য

সাহিত্যের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক কিরূপ, সংবাদপত্রের সাহায্যে সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব কি না—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে, বাধ্য হইয়াই কিছু লিখিতে হইল।

সংবাদপত্রে সংবাদ ছাড়া যাহা-কিছুর আলোচনা হইয়া থাকে, তাহাও সংবাদ-জাতীয়; অর্থাৎ দুইদিনেই তাহা বাসি হইয়া যায়, সাধারণভাবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। অপর পক্ষে, যাহা সাহিত্যপদবাচ্য তাহা দুইদিনে বাসি হইবার নয়; সাময়িকভাবে দেখা দিলেও তাহা সাময়িকতাকে অতিক্রম করে বলিয়াই সাহিত্য—এ কথাও অস্বীকার করিবার নয়। অতএব এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা মূলগত। সংবাদপত্র-রচনায় (Journalism) যে বিদ্যা-বুদ্ধি এবং যে ধরনের লিপিকুশলতার প্রয়োজন, তাহা লইয়াই যেমন সাহিত্য-রচনা চলে না, তেমনই, সাহিত্যসৃষ্টিতে যে প্রতিভা ও ধীর-দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন তাহা সংবাদ-প্রণয়নের পক্ষে নিতান্তই অপটু। যাঁহারা সংবাদপত্র পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই সাহিত্যচর্চ্চার অভিলাষী নহেন—সংবাদপত্রের জন্মই হইয়াছে অন্যবিধ প্রয়োজনে। যে সকল তথ্য একালের বুদ্ধিজীবী মানুষের বুদ্ধিকে মরিচা-ধরা হইতে রক্ষা করে, অলসের কৌতূহল নিবৃত্তি করে,—এবং যে ধরনের তত্ত্বালোচনা অপণ্ডিতকেও সহজে পণ্ডিত হইয়া উঠিবার সুযোগ দেয়, প্রধানত তাহাই সরবরাহ করা সংবাদপত্রের কাজ,—এ যুগের গণ-রাজের সেবাই তাহার মুখ্য ব্রত। কিন্তু এই সর্ব্বভুক

গণ-রাক্ষসের ক্ষুধাবৃদ্ধি করিয়া সর্ব্ববিধ খাদ্যকে রুচিকর করিয়া তোলাও সংবাদ-ব্যবসায়ীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। দৈনিক আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা মাত্র ব্যয় করিয়া, মস্তিষ্কের উপরে বিশেষ কোন জুলুম না করিয়া সর্ব্ববিদ্যার সংবাদ রাখা, বড় বড় আবিষ্কার ও গবেষণা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া—সংবাদপত্রের দৌলতেই হইয়া থাকে। সামান্য দুই পয়সার বিনিময়ে সংবাদপত্র বর্ণজ্ঞানমাত্র-সম্বল আধুনিক সভ্য মানুষের এই মহদুপকার সাধন করে। অপরাহ্ণে এক মাত্রা আফিমের মত সংবাদপত্র অনেকেরই একটি প্রাভাতিক মৌতাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক কথায়, সংবাদপত্র একাধারে নেশা ও চাট—সস্তায় সাড়ে-বত্রিশভাজা, অথচ হজম করিতে কষ্ট নাই।

কোনও মনীষী নাকি বলিয়াছেন, সাহিত্যও সংবাদপত্র-জাতীয় দিন-মজুরি—তফাৎ এই যে, একটি স্থায়ী, অপরটি অস্থায়ী। এরূপ উক্তির তাৎপর্য্য—ইহাদের একটি ক্ষণের প্রতিবিম্ব, অপরটি কালের; মূলে উভয়ের প্রবৃত্তি এক। কথাটা এই হিসাবে সত্য যে, সাহিত্যের প্রবৃত্তিও কালানুগ; সংবাদপত্র ক্ষুদ্রতর কালকে আশ্রয় করে, সাহিত্য সেই কালেরই সেবা করে বৃহত্তর পরিধি ব্যাপিয়া। অর্থাৎ সংবাদপত্রও যেভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে, সাহিত্যও সেই ভাবে হইয়া থাকে—কালের তাগিদ উভয়ত্র প্রবল। সাময়িক ঘটনা-তথ্যের উপাদানে যেমন সংবাদ-পত্র রচিত হইয়া থাকে—সাহিত্যও তেমনই কোনও এক যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাময়িক ধারণা ও আদর্শ-বুদ্ধির প্ররোচনায় রচিত হইয়া থাকে; একটির প্রবৃত্তি অপরটির অপেক্ষা গভীরতর বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমানের তাগিদ সমভাবে বিদ্যমান। যদি ঐ উক্তির এই অর্থই হয়, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে—একটিতে মানুষের প্রাণ-মনের

ইতিহাস কালানুক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ হইতেছে, একটা কিছু গড়িয়া উঠিতেছে; কিন্তু অন্যটিতে ক্ষণবুদ্বুদের মালা দীর্ঘতর হইবার পূর্ব্বেই শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, ইহার কারণ, তাহার কোন লক্ষ্য নাই—উপলক্ষ্যই তাহার প্রাণ; সম্মুখে বা পশ্চাতে তাকাইবার অবকাশ বা প্রয়োজন তাহার নাই; তাহার কাছে সব কিছুই শুধু সংবাদ—তদধিক মূল্য দিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

কিন্তু আধুনিক কালে, সংবাদপত্র সাহিত্য না হউক, সাহিত্য সংবাদ-ধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। যাহা নিতান্তই চলিষ্ণু, যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহা ক্ষণগত ও ব্যক্তিগত—যাহা নিতান্তই বাস্তব বা তথ্যগত, তাহাই সাহিত্যের প্রাণ! ইহার কাল নিতান্তই—বর্ত্তমান, এবং দেশ—অতি সাধারণ বুদ্ধি ও বিশ্বাসের সীমানায় গণ্ডিবদ্ধ। আজ যাহা রচিত হয়, কাল তাহা বাসি হইয়া যায়—তাহাই যেন উচিত ও বাঞ্ছনীয়। সংবাদের মূল্য যেমন পরদিন পর্য্যন্ত টিকে না—নূতনতার চমকই তাহার একমাত্র মূল্য, তেমনই সাহিত্যও আজ ক্ষণধর্ম্মী। এ কালের মানুষ এমনই নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে যে, আয়ুষ্কালকে তাহারা ক্ষণসমষ্টি ও মৃত্যুকেই মোক্ষ বলিয়া জানে। সেজন্য সাহিত্যও—বিষয়-সর্ব্বস্ব, আধিব্যাধিগ্রস্ত, মৃত্যু-ভয়ভীত মানুষের—ক্ষীণপ্রাণ স্ফীতবক্ষ পারাবতের—ক্ষণিক উত্তেজনার অথবা অবসর-বিনোদনের সামগ্রী হইয়াছে। আজ সিনেমা-চলচ্চিত্র, যেমন নাটক-অভিনয়ের পরিবর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, রস সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য না হইয়া জনগণের চক্ষু-গ্রাহ্য হইয়াছে—সাহিত্যও তেমনই, চিরন্তন সত্য ও চিরন্তন সুন্দরের সংবেদনায় অনুপ্রাণিত না হইয়া অতিশয় আধিভৌতিক প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়াছে; নিত্য না হইয়া নৈমিত্তিক ভাবাপন্ন হইয়াছে। অতএব আধুনিক কালে সাহিত্য ও

সংবাদপত্রের মূল প্রেরণা বা তাড়না একই—উভয়ের মধ্যে রূপভেদ থাকিলেও, আদর্শের ভেদ নাই।

সংবাদপত্র ও সাহিত্য—এই উভয়ের আদর্শ ও অভিপ্রায় এক নয়; অতিশয় সুপরিচিত সংবাদপত্র ও খাঁটি রসসৃষ্টি, এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ তুলনা স্থাপন করিতে যাওয়াই অন্যায়—তাহা আমি জানি। বিদেশের উৎকৃষ্ট পত্রগুলি যে কাজ যে ভাবে করিয়া থাকে, তাহাতে সাংবাদিক বিদ্যাকে একটি কলাবিদ্যা বলা যাইতে পারে। যাহা দৈনন্দিন বা দ্রুত-ধাববান কালের পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্ত্তে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে—মানব-যাত্রীর অশান্ত পথযাত্রার বাঁকে বাঁকে, অব্যবহিত ভবিষ্যৎ যে নব নব রূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাকে তদ্দণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া, নিত্য-অতীত ও নিত্য-ভবিষ্যতের যোগসূত্রটি অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া, সাংবাদিকের প্রতিভা যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে, তাহার মূল্যও কম নহে। কিন্তু এই নিয়তপরিবর্ত্তনশীল দ্রুতধাবমান ঘটনাস্রোতকে একটি অখণ্ড ইতিহাসের ধারায় ধরিয়া লওয়া—সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির সর্ব্ববিধ নূতন তথ্যকে সুবিন্যস্ত করিয়া, যাহা অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক তাহাকে একটা নিয়মের অধীন ও অর্থযুক্ত করিয়া পাঠকের সমক্ষে ধরা—সহজ কাজ নয়! অতএব সাংবাদিক প্রতিভা সাহিত্যিক প্রতিভা না হইলেও সুলভ নহে। কিন্তু এ আদর্শ কচিৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। সংবাদপত্র সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি—বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে, তাহাই তাহার যথার্থ পরিচয়। সাহিত্য ও সংবাদ-পত্রের সম্পর্ক-বিষয়ে সংক্ষেপে ইহার অধিক বলিবার স্থান নাই। এইবার সংবাদপত্র কি ভাবে সাহিত্যের সাহায্য করিতে পারে, তাহার কথাই বলিব।

সংবাদহিসাবে সাহিত্যের সাময়িক পরিচয়-প্রদান সংবাদপত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য সকল সংবাদপত্রই কিছু কিছু করিয়া থাকে; সাময়িক-পত্রাদিতে সাহিত্যের জন-যাত্রার পথচিহ্ন আপনা আপনি অঙ্কিত হইয়া যায়। যাহা যুগব্যাপী সাধনার ফল, যাহা যুগান্তরে পরিণত রূপ লইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার ক্ষণিক লক্ষণ ও স্থায়ী প্রবৃত্তি, নিষ্ফল প্রয়াস ও সফল প্রযত্ন—সাময়িক-পত্রে এমনভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে যে, আমরা তাহা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি ও গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারি। যে সকল লেখক শেষে স্থায়ী সাহিত্যের অঙ্গন হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া যান, অথচ যাঁহারা একদা একটা যুগের আবহাওয়াকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয় সাময়িক-পত্রেই প্রকট হইয়া থাকে। এ পরিচয়ের প্রয়োজন আছে; প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে তাঁহারাই জাতির রস-পিপাসা উদ্রিক্ত করেন। বর্ত্তমানের চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই—প্রতিদিনের প্রয়োজন সকল প্রয়োজনের বাড়া। নিত্য-নূতনের যে পিপাসা তাহাই প্রবলতম পিপাসা—তাহার নাম কৌতূহল। এই কৌতূহল জাগ্রৎ না থাকিলে মানুষের জীবনীশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সাময়িক সাহিত্য সেই কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। এই হিসাবে যাহা নিত্য-বর্ত্তমান তাহার পরিচয়-সাধনকল্পে সংবাদপত্রে সাহিত্যের সংবাদ একান্ত প্রয়োজন; সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকার কথাই বলিতেছি না, তদপেক্ষাও সাময়িক—যাহা দৈনিক বার্ত্তাবহরূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়—সেই সংবাদপত্রের স্তম্ভে সাময়িক সাহিত্যের সংবাদ নিয়মিতভাবে থাকা বাঞ্ছনীয়। যাহাকে চল্‌তি সাহিত্য বলা যায়—যাহা অগণিত পুস্তকাকারে, অথবা মাসিকপত্রিকায় স্রোতের মত ভাসিয়া চলিয়াছে—সেই সাহিত্য, ও সাহিত্যিকগণের পরিচয়, তথ্য ও তত্ত্বের যোগসূত্রে

গাঁথিয়া পাঠক-সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা, একটা কাজ বলিয়াই মনে করি। সে কাজ করিতে হইলে সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্যের তত্ত্ব, উভয়বিধ জ্ঞানেরই প্রয়োজন; সর্ব্বোপরি প্রয়োজন—সদ্যোজাত বর্ত্তমানকে সদ্যোগত অতীতের সঙ্গে মিলাইয়া অর্থযুক্ত করিয়া তোলা। বর্ত্তমানের সাহিত্য-সংবাদকে একটি পূর্ব্বাপর পারম্পর্য্য দান করিয়া, তথ্য ও তত্ত্বের মিলন সাধন করিয়া, এমন একটি ধারা-বাহিকতার ধারণা রক্ষা করিতে হইবে—যাহাতে সাহিত্যের নিত্য-নব ভঙ্গিকেও পুরাতনের সঙ্গে মিলাইয়া প্রতি পদে দিক-নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আমি সাহিত্য-সংবাদের সঙ্গে এক প্রকার সমালোচনার কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু ইহা ঠিক academic সমালোচনা নহে—সংবাদ-পত্রে তাহার স্থান নাই। আমি সাহিত্যের সাময়িক প্রবৃত্তিরই একটা মূল্য নির্দ্দেশ করার কথা বলিতেছি—দেশকালপাত্রই সেখানে বড়; কোনও চিরন্তন আদর্শ বা নির্ব্বিশেষ রসতত্ত্বের আলোচনা তাহার অভিপ্রায় হইবে না। যাহা সাময়িক, তাহাকে তাহারই আদর্শে বিচার করিয়া, যুগপ্রবৃত্তির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অতীত ও ভবিষ্যতের কালধারাটিকে বর্ত্তমানের মধ্যে চিনিয়া লইবার চেষ্টাই—সাংবাদিকের প্রধান কৃতিত্ব।

ইহা দ্বারা সাহিত্যের সাহায্য বা উন্নতি কি পরিমাণ হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সাহিত্যের সাময়িক স্রোত—তাহার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠককেও যেমন অবহিত করা হয়, তেমনই ইহা দ্বারা লেখকেরও পথ এবং পাথেয় নির্দ্দেশ করা যায়। সাংবাদিকের মতামত যদি সুবিচারপ্রণোদিত হয়, যদি তাহাতে শিক্ষিত সাধারণের সহজ রস-বোধ ও সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিফলিত হয়, তবে তাহা দ্বারা সাহিত্যের গতি

কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। লেখকবিশেষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভায় উজ্জ্বল নয়, সেখানে সাংবাদিকের সামাজিক বুদ্ধি এবং সুস্থ রসজ্ঞান তাহার যে মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তাহাতে অন্তত সাহিত্যের একটা ঋজু সরল পন্থা বজায় থাকে; কৌতূহল-তৃপ্তির সঙ্গে একটা সুস্থ সংস্কার জাগ্রত হইয়া থাকে। পাঠকসাধারণ ও সাহিত্যিক-দিগের যে পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক, সংবাদপত্র যোগে সেই পরিচয় কতকটা বাধ্যতামূলক হইয়া উঠে—ইহাতে সাহিত্যের যে প্রচার হয়, তাহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর। সাংবাদিকের নিকটে কেহ জটিল রসতত্ত্ব অথবা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবিচার প্রত্যাশা করে না। পাঠকসাধারণকে সমসাময়িক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন রাখা—অপরাপর সংবাদের মতই—সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের স্বরূপ সম্বন্ধে সজ্ঞান রাখাই সাংবাদিকের কাজ। ইহা মুখ্যত সংবাদদাতার কাজ, বিচারকের কাজ নহে। কিন্তু এই সংবাদ-দানও এমন একটি জ্ঞান ও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে, যাহাকে সাংবাদিক প্রতিভা বলা যাইতে পারে—আমি পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। এইভাবে সাহিত্যিক সংবাদ জনসাধারণের গোচর করিয়া, সাংবাদিকগণ কেবল সাহিত্যের পথ নহে, সাহিত্যিকের পাথেয় বিষয়ে প্রভূত সাহায্য করিতে পারেন—তাহাতে সাহিত্যসেবার জীবিকা-সংগ্রহের সুবিধা হইয়া থাকে, এবং তাহা সাহিত্যের অল্প উপকার নহে।

আজিকার এই অতিব্যস্ত বিষয়-সর্ব্বস্বতার যুগে, সাহিত্য বা ঐ জাতীয় সুকুমার কলার চর্চ্চা দ্বারা চিত্ত-প্রকর্ষলাভের অবসর প্রায় কাহারও ঘটিয়া উঠে না। অতএব, সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মূলগত বিরোধ সম্বন্ধে প্রথমেই যাহা বলিয়াছি, তাহা সত্য হইলেও,

সাহিত্য-চর্চ্চার এই সুলভ উপায়কে একেবারে নিরর্থক বলা চলে না; বরং যুগধর্ম্মের তাড়নায়, 'মন্দের ভাল'-হিসাবে, সাংবাদিকের মুখ চাওয়া ছাড়া উপায় নাই। যাঁহারা আদর্শবাদী তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম, তাঁহারা নিভৃতে এককভাবে যে দৃষ্টি লইয়া যে সাধনা করিতে সক্ষম, তাহার ফললাভে জাতি কখনও বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু সাহিত্যিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইলে যে সমতলভূমিতে সাহিত্যের এক প্রান্ত সংলগ্ন থাকা দরকার, সেই ক্ষেত্রে সাংবাদিকের কর্ত্তব্য আছে। ইংরেজীতে যে প্রবচন আছে—Many are called, but few are chosen' অর্থাৎ, 'অনেকেরই ডাক পড়ে, কিন্তু কাজ পায় দুই চারিজন মাত্র'—তাহা বড় সত্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা আরও সত্য; এখানে সেই অল্প কয়েকজনকে বাছিয়া লইবার জন্য ডাকিতে লইবে অনেককে —এই ডাক দেওয়ার কাজটা অন্তত সাংবাদিকের।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহের যে অবস্থা—তাহাদের সম্পাদন ও পরিচালন যে ভাবে হইয়া থাকে, তাহাতে সাহিত্যের পক্ষে কোনরূপ উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। একেই তো কোন বড় আদর্শ কাহারও নাই; শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্য তাহার একটা কারণ। আমাদের সংবাদপত্রের পশ্চাতে কোনও সুগঠিত জনমত নাই; এজন্য সাংবাদিকের দায়িত্ব নাই বলিলেও চলে। শিক্ষিত সমাজে যেটুকু রাজনীতি-চর্চ্চার আদর ও আবশ্যকতা আছে, তাহাই সাংবাদিকের উপজীব্য। এই রাজনীতি-চর্চ্চাও যে ভাবে হইয়া থাকে, তাহাতে মনস্বিতা, দূরদৃষ্টি সততার অভাব প্রায়ই লক্ষিত হয়। প্রায় সকল পত্রিকাতে যে পলিসি প্রকট হইয়া থাকে, তাহা যেমন স্বচ্ছ তেমনই সংকীর্ণ। জাতির বুদ্ধিকে সজাগ এবং চিত্তকে সজীব রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে

স্বীকার করি ; তথাপি সংবাদপত্র-হিসাবে যেটুকু বৈশিষ্ট্য বা character থাকা প্রয়োজন, তাহা প্রায় কাহারও নাই। এই সকল সংবাদপত্রে সাহিত্যের প্রসঙ্গ খুব কম থাকে, যাহা থাকে তাহা এতই লঘু ও দায়িত্ব-হীন যে, না থাকাই ভাল। আমাদের দেশের পণ্ডিত-মহলে সাহিত্য-চর্চ্চা একটা recreation বা অবসর-বিনোদন মাত্র ; সকলেই তাহা কিছু কিছু করিয়া থাকেন, কারণ, বিলাতী ও দেশী উপন্যাস বা কবিতার বই পড়া না থাকিলে এবং সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈঠকী আলাপ করিবার মত যোগ্যতা না থাকিলে, বিদ্বন্মন্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। এজন্য যিনি Economics, Politics অথবা Sociologyর চর্চ্চা বা চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া থাকেন এবং তাহাই যাহার পেশা, তিনিই 'পায়ের উপর পা' তুলিয়া সাহিত্য-বিচার করিতে বসেন, এবং যেহেতু তিনি একজন পি. আর. এস. অথবা পি-এইচ. ডি.-উপাধিধারী অধ্যাপক-ব্যক্তি, সেই হেতু, তাঁহার অমূল্য সাহিত্যিক মতামত সংবাদপত্রে আড়ম্বরে বিঘোষিত হইয়া থাকে। একটা ফুটবল খেলার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলেও বিশেষজ্ঞ হওয়া চাই, কিন্তু আমাদের এই সাহিত্য-সহজিয়ার দেশে সকলেই সাহিত্যিক, সকলেই বক্তা—শ্রোতা কেহই নহে ; সকলেই নিজেই নিজের অথরিটি—আত্মপ্রচার ও Mutual Admiration-ই এরূপ সাহিত্য-সমালোচনার অভিপ্রায়। সংবাদপত্রে যাহা-কিছু সাহিত্যিক সংবাদ বাহির হয়, তাহার অধিকাংশ এই জাতীয়। আর একটি বড় কাজ হইয়াছে—প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা ; এই সকল রচনা অপাঠ্য, এবং বোধ হয় পত্রিকা-সম্পাদকেরও তাহা অজ্ঞাত নহে। যে ব্যক্তি ইহা লিখিয়া থাকেন, তাঁহার একমাত্র যোগ্যতা—তিনি বুকনি-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন—লাগসই বচন-রচনে তিনি বিশেষ পটু।

সমালোচনার মূল্যস্বরূপ পুস্তকগুলি লেখক বা সম্পাদকের অনুরোধ সহ সোজা তাঁহার নিকটেই পৌঁছে—সম্পাদক কোন খবরই রাখেন না। ইহাই আমাদের সংবাদপত্রসমূহের সাহিত্য-সংবাদ। বিদেশী সাহিত্যের বিদেশী সংবাদও তেমন নিষ্ঠার সহিত সঙ্কলিত হয় না; সংবাদপত্রের কোনও অংশ উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্য ধারাবাহিক ভাবে—কোনও উপন্যাস বা আর কিছু প্রকাশের জন্য—পৃথক রাখা হয় না। আমাদের সংবাদপত্রে—**Feuilleton** বলিতে যাহা বুঝায়—তাহার একান্তই অসদ্ভাব, যেটুকু চেষ্টা দেখা যায় তাহা হাস্যকর।

আমাদের সংবাদপত্রগুলি যে ভাবে এই গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাতে মনে হয়, সংবাদপত্রে সাহিত্যপ্রসঙ্গ না থাকাই শ্রেয়স্কর। এরূপ অবস্থার আর একটা কারণ এই যে, ইহারা এ সকল রচনার জন্য পয়সা দেয় না; ইহাদের নিকটে সাহিত্য মাত্রেই অমূল্য—উহার কোনও মূল্য নাই। আসল কথা, আমাদের দেশ এখনও উচ্চতর সাংবাদিক কর্ত্তব্য-পালনের ক্ষেত্র হইয়া উঠে নাই; জন-মনের কণ্ডূতি-সাধন যাহার একমাত্র ব্রত, তাহাকে দোষ দেওয়া বৃথা; কারণ, জন-মনই এখনও জাগ্রত হয় নাই।

আশ্বিন, ১৩৪৩

সাহিত্যের শিরঃপীড়া

সেদিন ছাত্রদের এক বিতর্ক-সভায় বাগ্‌যুদ্ধের বিষয় ছিল—সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি, না মত-প্রচার। তর্কটা একালে আর নূতন নয়; বরং দেখা যাইতেছে ইহাই যেন চির-পুরাতন; হয়তো কোনও এক আগামী যুগে যখন এ প্রশ্নের প্রয়োজনই আর থাকিবে না, তখন রস বা রসসৃষ্টির উল্লেখমাত্রেই সেকালের মতবাদীরা, অর্থাৎ সেই উন্নত যুগের অতি-প্রৌঢ় ভাবুক-সমাজ, এই একটা অতি আদিম কুসংস্কারের কথা বলিতেও শিহরিয়া উঠিবে। এখনও তবু রসসৃষ্টি ও মতবাদ এই দুইটার পৃথক উল্লেখ হইয়া থাকে; এর পরে রসের কোনও পৃথক সংজ্ঞাই আর স্বীকৃত হইবে না—সমস্যা ও মতবাদের জারকরূপে উহার কিঞ্চিৎ ব্যবহার মাত্র থাকিবে।

এই আধুনিক মতবাদী সাহিত্যের উকিল ও মক্কেলে আজ সাহিত্য-প্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর—বিশেষ করিয়া মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের—বিলাতী সাহিত্য যে ধরনের প্রেরণায় মশগুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই অনুকরণে আমাদের সাহিত্যেও মানুষের প্রাণের পরিবর্ত্তে দেহ ও মনের নানা বিকার, ও তারই আক্ষেপ, আক্রোশ ও আর্ত্তনাদ ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও একালের এই বিলাতী ব্যাধির ছোঁয়াচ হইতে তাঁহার কবি-প্রতিভাকে সম্পূর্ণ

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সম্মেলন-সভার উদ্যোগে প্রদত্ত বক্তৃতা।

মুক্ত রাখিতে পারেন নাই। 'ভারতী' ও 'সাধনা'র রবীন্দ্রনাথ এবং 'সবুজ পত্রে'র রবীন্দ্রনাথে অনেক প্রভেদ আছে।

এই ব্যাধিকে আমি বিলাতী ব্যাধি বলিয়াছি, কারণ ইহা বিলাতী সাহিত্য হইতেই সংক্রামিত হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যের আবহাওয়ায় আমাদের নব্য-সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছিল—তাহাকেও এইরূপ ব্যাধির সংক্রমণ বলিলে ঠিক হইবে না, কারণ সেখানে বাঙালীর প্রতিভার শক্তিও ছিল—এক সুস্থ প্রকৃতি আর এক সুস্থ প্রকৃতির রস-কল্পনা জাগ্রত করিয়াছিল—সেখানে কেবল অনুকরণই ছিল না, স্বীকরণের প্রচুর শক্তিও ছিল। আধুনিক য়ুরোপ যে ব্যাধিগ্রস্ত, অতিরিক্ত ভোগ-পিপাসা ও ভোগের উপকরণ-বাহুল্যে তাহার জীবন-সংগ্রাম যে নানা দিকে নানা অবস্থার বশে জটিল হইয়া পড়িয়াছে, মনুষ্যত্ব-বিহীন যান্ত্রিকতার অমানুষিক অতিচার যে তাহাকে অস্বাভাবিক জীবন-যাপনে বাধ্য করিয়াছে—তাহা বোধ হয় সকল চিন্তাশীল স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন।

এই অবস্থা এক্ষণে চরম মাত্রায় পৌঁছিয়াছে—সেখানকার প্রতিভাশালী মনস্বী মহাজনও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন। ফলে জীবনের গভীরতম অনুভূতির ক্ষেত্রেও সেখানকার মানুষ আর সহজ স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। তাই সাহিত্যেরও আদর্শ বিচলিত হইয়াছে। পাঁচ হাজার বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া মানব-মন এই জগৎ-সৃষ্টির যে আর এক রহস্য ধ্যান করিয়া, প্রত্যক্ষ বাস্তবের গভীরতর পরম সত্তার পরিচয়ে চরিতার্থ হইবার অলৌকিক পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিল—আজ সে তাহা হইতেও ভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছে। জীবন-সংগ্রামের যে ভীষণতা তাহারই অতিবুদ্ধির ফলে ঘটিয়াছে—তাহাই

তাহার ব্যক্তিত্ববোধ বা অহং-সংস্কারকে এতই প্রবল করিয়া তুলিয়াছে যে সে সর্ব্বত্র আমিত্বের প্রসার চায়; তাহার অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি-জীবনকেই সে সর্ব্বাগ্রে রাখিয়া বিশ্বের সর্ব্ব বস্তুতে তাহারই স্বার্থের প্রতিরূপ আবিষ্কার করিতে ব্যাকুল—জগৎটা তাহার চক্ষে মানুষেরই ভোগ্য পদার্থ; এবং তাহাও মানব-জাতি হিসাবে নয়, মানব-ব্যক্তি হিসাবে। কারণ, জাতি অর্থে একই বড় মানবতার আধার বুঝায় না—ছোট ছোট আমির সমষ্টি; অতএব মনুষ্যত্ব বলিতে কোনও সার্ব্বজনীন শাশ্বত মানব-প্রকৃতি নয়, স্বার্থের সমবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি-সংঘের সাধারণ সুখ-পিপাসা ও দুঃখ-বোধের ঐক্যই মনুষ্যত্বের মূল। এই মনোভাব সাহিত্যকেও আক্রমণ করিয়াছে। (অতি জাগ্রত, অতি প্রখর ব্যক্তি-চেতনা কবিকে পর্য্যন্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়াছে—সাহিত্যসৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা, যে মুক্তির আনন্দ বা আত্মবিস্মৃতির রসাবেশ থাকে, তাহার পরিবর্ত্তে অতি উগ্র দেহ-চৈতন্য অর্থাৎ মানস-অভিমান প্রবল হইয়াছে; জীবন-চেতনা প্রাণধর্ম্মের পরিবর্ত্তে মনোধর্ম্ম বা মস্তিষ্কচালনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।) একালের মানুষ কোন-কিছুতেই বিস্ময় বোধ করে না, কিছুতেই তাহার শ্রদ্ধাবোধ নাই। সে এতই মুখর যে মনে হয়, একালের মনুষ্য-জীবনে ক্ষণিকের মৌনও আর সাধনার অঙ্গ নয়; কোনও ভাব বা কোনও চিন্তা প্রাণের স্তব্ধ নিভৃতে পরিণতি লাভ করিবার অবকাশ আর পায় না। মুদ্রাযন্ত্রের অতিরিক্ত প্রচলনে এই নিরন্তর মুখরতা যে ভাবে যাহা সৃষ্টি করিতেছে, তাহারই একটি বিপুল অংশ একালের সাহিত্য। এ সাহিত্যের সর্ব্ব-প্রধান লক্ষণ ইহার কলরব, ইহার অত্যুগ্র অসহিষ্ণুতা, ইহার মজ্জাগত নাস্তিকতা ও বিদ্রোহ, ইহার অশান্তি ও আক্ষেপ উনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি একদা আক্ষেপ করিয়া

বলিয়াছিলেন,—"The world is too much with us late and soon"। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে জীবিত থাকিলে সে কবির অন্তরাত্মা কেমন করিত জানি না, কল্পনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। হয়তো তাঁহার কবিধর্ম্ম রসাতলে যাইত, তিনিও প্রাণের নিভৃত সাধনা ও উপলব্ধির পরিবর্ত্তে এই তিনশো তেত্রিশ কোটি স্বতন্ত্র স্বাধিকারকামী ভগবানের জগৎব্যাপী কলরবে টেলিগ্রাফের তার বাজাইয়া একটা সুরসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেন—কবি হইতে গিয়া propagandist করতাল-বাদক হইয়া দাঁড়াইতেন। "The world is too much with us late and soon"—এমন কথা আজিকার দিনে বলিবার জো নাই, বলিলে কবির মস্তিষ্কের অবস্থা ভাবিয়া একালের স্কুলের ছাত্রও কৃপাপরবশ হইয়া উঠিবে।

আমি বলিয়াছি মুখরতা এ যুগের ধর্ম্ম ; বৃদ্ধ হইতে অপোগণ্ড বালক পর্য্যন্ত কেহই চুপ করিয়া থাকিতে চায় না, চুপ করিয়া থাকিবার মত সংযম বা শ্রদ্ধা কাহারও নাই। আরও কারণ, ইহারা অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহে। জীবনের তপ্ত কটাহে মস্তিষ্কের মধ্যে নিরন্তর যে বুদ্‌বুদরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার তাড়নায় ইহারা অতীত বা ভবিষ্যৎ কোনটার প্রতি বিশ্বাস বা প্রত্যাশা রক্ষা করিতে পারে না, নিত্যকার তাগিদ নিত্যই শোধ করিয়া দেয়। জীবনেও বিশ্বাস নাই, জীবনের নিকট হইতে সত্যকার কিছু আদায় করিবার কোন বস্তুই যেন আর নাই। এই শূন্যতা-বোধকে চাপিয়া রাখিবার জন্য তাহারা অবিরল কোলাহল ও বাদ-প্রতিবাদ, কলহ ও কচকচিকেই একমাত্র উপায় করিয়া লইয়াছে। এই কলহ, কচকচি ও কোলাহলকেই কতকটা ভদ্রজনোচিত সম্ভ্রমযুক্ত করিবার ভার লইয়াছেন আধুনিক সাহিত্যরথিগণ। যে পিপাসাকে কবির

ভাষায়—"জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী" বলা যাইতে পারে, সে পিপাসা—গভীরতর রস-আস্বাদনের সেই প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা—এখন আর প্রাণে জাগে না, জাগে মানুষের মাথায়; মানুষ যাহা চায় তাহা প্রাণের চাওয়া নয়—মনের চাওয়া। সৃষ্টি যেমন একটা যন্ত্রমাত্র, মানুষও তেমনই কলে-ছাঁটা একই ছাঁচের যন্ত্র-জীব মাত্র—মানুষের মনই তাহার মনুষ্যত্বের নিদান, এবং সে মন যন্ত্রবিজ্ঞানের অধীন; তাহাতে অতি সূক্ষ্ম নির্ম্মাণ-কৌশল আছে বটে, কিন্তু কোথাও রহস্য নাই; শ্রদ্ধা করিবার, বিস্ময়-বোধ করিবার,—অতল, অসীম, দুর্জ্ঞেয় বলিয়া কোন কিছুর সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া থাকিবার—প্রয়োজন আর নাই। সবাই সমান—জীবনের তৌলদণ্ডে কেহ কাহারও অপেক্ষা এতটুকু ভারী নহে। মানুষে মানুষে যে প্রভেদ, তাহা কেবল মাত্র জীবনে স্বাধিকার বিস্তার করিবার ক্ষমতায়—জ্ঞানে নয়, প্রেমেও নয়। তাই একালের মানুষ আর কিছুতেই লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না; গুরু লঘু, ছোট বড়, গুণী গুণহীন, রসিক, বেরসিক, সকলেই একই যন্ত্রের একই ছাঁচের জীব। প্রাণহীন, হৃদয়হীন শুষ্ক মনোবৃত্তিই আর সব বৃত্তিকে গ্রাস করিয়া মানুষের অহং-সংস্কারকে অতিশয় উগ্র ও প্রখর করিয়া তুলিয়াছে। এই মনোবৃত্তি মানবতা বা মনুষ্য-জীবনের কোনও আধ্যাত্মিক আদর্শ স্বীকার করে না। দেহের ক্ষুধা-নিবারণই পরম পুরুষার্থ—এই দেহের ক্ষুধাকে আধুনিক সাহিত্য নানা সূক্ষ্ম আকারে, উন্নত ও মার্জ্জিত বুদ্ধির অনুমত করিয়া, নানা তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত ও মণ্ডিত করিয়া, দেহীমাত্রেরই মনোজঠরে পৌঁছাইয়া দিতেছে; সাহিত্যের রস এখন জঠর হইতে মস্তিষ্কে চলাচল করিতেছে। ইহাতে জ্বালা বাড়ে, জুড়ায় না; ফলে মস্তিষ্কের উত্তেজনা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে—সাহিত্যেরও শিরঃপীড়া দেখা দিয়াছে।

এতকাল যাহাকে আমরা সাহিত্য বা বিশুদ্ধ রসসৃষ্টি বলিয়া জানিতাম,—তাহাতে মাথার বালাই ছিল না, কাজেই মাথাব্যথাও ছিল না। এখন সাহিত্য মস্তিষ্কশালী, তাই মাথাব্যথা ঘটিবারই কথা। আমি বিশেষ করিয়া এ যুগের উপন্যাসের কথাই বলিতেছি। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান রূপই উপন্যাস। সাহিত্যের রূপ-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে আমরা উপন্যাসকে দায়ী করিতে পারি না—উপন্যাসই সাহিত্যিক চিত্রশিল্পীর অতিশয় উপযোগী সুপ্রসর পটভূমিকা। সেকালের মহাকাব্য ও নাটক যে রসকল্পনাকে সম্যক ধারণ করিতে পারিত না, উপন্যাসই তাহার উৎকৃষ্ট আধাররূপে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সৃষ্টির সর্ব্বোত্তম সহায় হইয়াছে। এই উপন্যাস-সাহিত্যেই সর্ব্বপ্রথম মস্তিষ্ক একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার কারণ অনেক। প্রথমত, কথা বলিবার প্রচুর অবকাশ ইহাতে আছে; দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য তথ্য ও ঘটনা, এজন্য সাহিত্যিক রসকল্পনা সহজেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তৃতীয়ত, উপন্যাস এমনই ধরনের রচনা যে উহার আকর্ষণ-শক্তি রসিক বেরসিক উভয়ের পক্ষেই সমান—কাব্য বা কবিতার পাঠক চিরদিনই অতি অল্প, কিন্তু উপন্যাস-পাঠক বোধ হয় সকলেই। ইহার কারণ, তথ্য ঘটনা বা তত্ত্ব সংবাদপত্রের মতই সকলের কৌতূহল উদ্রেক করে, ও যে উপাদান সাহায্যে উপন্যাস রচিত হয় তাহাতে সেইরূপ বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকেই। রসসৃষ্টিই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য নাও হয়, তথাপি লেখকের হতাশ হইবার কারণ নাই। এমন বহু মনীষী সুলেখক ইদানীন্তন কালে উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, যাঁহাদের প্রতিভা ঠিক সাহিত্যিক প্রতিভা নয়—যাঁহাদের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি নয়। এই সকল কারণে, এবং আধুনিক

সাহিত্যে উপন্যাসই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া—সাহিত্য ক্রমে অতিশয় মনোধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে এবং পরিশেষে সাহিত্যিক প্রেরণা শিরঃপীড়ায় পরিণত হইয়াছে।

ইহাতেও সাহিত্যিকের দোষ নাই। যে সাহিত্য গণ-মনের বিষয়-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা যদি রসের পরিবর্ত্তে রসদ যোগাইবার কাজটাই বড় মনে করে, তবে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। আমি ইহাকে শিরঃপীড়া বলিব না। চাহিদা অনুসারে ব্যবসায়ী যেমন মাল আমদানি করে—নূতন ব্যবসায়ের স্থষ্টি হয়, একালে গণদেবতার সেবা উপলক্ষ্যে তেমনই যদি একটি বিশিষ্ট লেখক-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু এই সকল লেখক তাঁহাদের পাঠকদের সঙ্গে মিলিয়া যদি এমন কথা বলিতে স্থরু করেন যে, ইহাই সাহিত্যের ধর্ম্ম—ইহাকে রস বলিতে হয় বল, না বলিলেও আপত্তি নাই—কিন্তু সাহিত্য ইহাই, মনের খাদ্য পাক করাই সাহিত্যের কাজ—মাথাই সাহিত্য-নির্ম্মাণের কারখানা, তোমরা যাহাকে রস বল, তাহাও মূলে মস্তিষ্ক-জাত—মাথাকে বাদ দিয়া যেমন মানুষ দাঁড়াইতে পারে না, তেমনই মানুষের উপযুক্ত হইতে হইলে সাহিত্যকে মস্তিষ্ক-প্রধান হইতে হইবে,—যখন এমন কথা একালের বড় বড় সাহিত্যিকের মুখে শুনিতে পাই, তখন বলিতেই হয়, সাহিত্য শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। যাঁহারা রসিক, তাঁহারা এ সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না জানি, এবং সেই কারণে সাহিত্যের শিরোরোগ কখনও ঘটিবে বা ঘটিতে পারে—সে দুশ্চিন্তাও তাঁহাদের নাই। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, প্রতিভাশালী সাহিত্যিকও এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন, এবং আধুনিক

রসিক-সমাজ হইতে যাঁহাকে সহজে খারিজ করা যায় না এমন ব্যক্তিও ইহাতে সায় দিতেছেন, তখন কথাটা একেবারে উপেক্ষা করা যায় না—অর্থাৎ সাহিত্য যে আধুনিক কালে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে, এমন কথা বলা অসঙ্গত নয়।

কেন এমন হইয়াছে, তাহার কতকগুলি কারণ আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। (জীবনে রস নাই, সাহিত্যে রস আসিবে কোথা হইতে?) রসিক নয়, অথচ সাহিত্য চাই—এমন ফরমায়েসী সাহিত্য যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইতেছে। ফরমায়েসী বলিবার কারণ আছে। (একালের সাহিত্য কেবল সাহিত্য-প্রেমিক বা কাব্যরস-পিপাসুর জন্যই নহে। সাহিত্য একটা বিপুল ব্যবসায়ের পণ্য হইয়াছে—মানুষের নানাবিধ ক্ষুধার সামগ্রীর মত, সাহিত্য এক প্রকার ভোগ্যদ্রব্য—একটা অতিশয় প্রয়োজনীয় বিলাসের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।) এই সাহিত্য-পণ্য ভারে ভারে উৎপন্ন হইয়া ছাপাখানা ও পরে পুস্তক-ব্যবসায়ীর গুদাম হইতে মালগাড়ির সাহায্যে চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইতেছে। বাজারের অন্যান্য সামগ্রীর মত ইহার ক্রেতা সকলেই। যাহারা ক্রয় করে তাহাদের ফরমায়েস-মত, সাময়িক ফ্যাশনের অনুযায়ী কাটছাঁট, বুনানি ও রং, ইহাকে প্রস্তুত করিতে হয়। এক কথায়, সাহিত্যিককে সাহিত্য-ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণের সহিত সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়—নতুবা সাহিত্য বাজারে কাটে না, সাহিত্যিককে কেহ গ্রাহ্য করে না। এই সাধারণ যে কোন্ ধাতুর মানুষ, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—ইহারা বিকৃত-স্বভাব, আত্মম্ভরী, অতিশয় চপল ও চঞ্চলচিত্ত, কলরব-প্রিয়, ক্ষণিক-উত্তেজনা-প্রবণ, স্বার্থ-সর্ব্বস্ব মানবক। ইহাদের সেবাই আধুনিক সাহিত্যের অভিপ্রায়।)

এই জনগণের চিত্তবিনোদন করিতে যাঁহারা বাধ্য—না করিতে পারিলে যশ ও অর্থ কোনটারই আশা নাই—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভার অধিকারী হইয়াও যুগধর্ম্মবশে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। কেহ কেহ এই যুগেরই প্রতিনিধি—অর্থাৎ ঠিক যে ধরনের সাহিত্য এ যুগের মানসব্যাধিপীড়িত আত্মভ্রষ্ট মানুষের পক্ষে পরম উপাদেয়, ঠিক সেই সাহিত্য-সৃষ্টির কলাকৌশল আয়ত্ত করিবার মত প্রতিভা তাঁহাদের আছে। ইঁহারাই রব তুলিয়াছেন, সাহিত্যে জীবনকে চাই এবং সে জীবন আধুনিক কালের মনুষ্য-জীবন—অর্থাৎ তাহা মনঃপ্রধান একালের মানুষ ভাবনা চিন্তা ছাড়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না—হৃদয়ের অনুভূতিও মস্তিষ্কের মারফতে হইয়া থাকে ; এবং তাহা যে হয়, তাহার কারণ আধুনিক মানুষ আর শিশু নহে, সে সাবালক হইয়াছে—সে পিতৃপিতামহের নির্ব্বোধ ভাব-সাধনাকে আর শ্রদ্ধা করিতে পারে না। আমাদের দেশের একজন অতি-আধুনিক এবং সেই হেতু অতিরিক্ত বাঁচাল সাহিত্যিক 'Intellectual উপন্যাস' নাম দিয়া এক শ্রেণীর সাহিত্যের সমর্থন-প্রসঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের মেসায়া Bernard Shaw-র একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই উক্তিটি এই—"A convincing interesting story ? Are we children in the nursery that we still require to be told a tale ?" এই উক্তিটি আধুনিক সাহিত্য-রসিকের জপমন্ত্রই বটে ! উপন্যাস convincing বা interesting হইলেই আধুনিক পাঠকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে না। Bertrand Russell, Bernard Shaw ও Bergson এই তিনটিকে মিলাইয়া আধুনিক সাহিত্য-প্রতিভা গড়িয়া উঠা চাই ; বি-ভাষা, বি-জাতির মত এ সাহিত্যও বি-সাহিত্য ; চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা,—সাহিত্যের মুখ্য

উপাদান হইবে চিন্তা ; চিন্তাই যদি না রহিল, আধুনিক জীবন-জ্বরের প্রমাণ যদি সাহিত্যে না পাইলাম, তবে মানুষকেই পাওয়া গেল না! সেকালের কোনও মনীষী বলিয়াছেন—'চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং' ; আধুনিক সাহিত্যিক বলেন—চিন্তা মানুষের স্বাস্থ্য ; যাহাকে জ্বর বলিতেছ, তাহা মস্তিষ্কবান মানুষের শিরঃপীড়া ; এবং শির থাকিলে শিরঃপীড়াও থাকিবে। বরং এই শিরঃপীড়াই মনুষ্যত্বের পূর্ণতর বিকাশের লক্ষণ।

সাহিত্য-সমালোচনায় আমাদের দেশের প্রায় সকল 'up to date' সমালোচকই এই ঋষিমন্ত্র শিরোধার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকীর্ত্তির সমালোচনা-প্রসঙ্গে একজন অতি-আধুনিক সমালোচক বলিয়াছেন—"শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম কয়েকখানি উপন্যাসে নিপুণ শিল্পী বটেন, কিন্তু নূতন ভাবুক নহেন। এই সকল উপন্যাসে তিনি সমাজ ও পারিবারিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ে দেশের যে প্রচলিত আদর্শ, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিতরে যে সাধারণ সম্পর্ক, সে সব কোন নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখবার কথা ভাবেন নাই। শেষের উপন্যাসগুলিতে দেশের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নূতন সমস্যা তিনি নূতন ভাবে ভাবতে সুরু করেছেন।" লেখকের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বকার উপন্যাস-গুলি তেমন পরিপক্ক নয়—শরৎচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছে তাঁহার শেষের উপন্যাসগুলিতে, সেখানে তাঁহার প্রতিভা সাবালকত্ব লাভ করিয়া আধুনিক সাহিত্যের যে শিরঃপীড়া ঘটাইয়াছে, তাহাতেই তিনি সকল শিরোরোগ-প্রিয় আধুনিক রসিকজনের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার আগেকার উপন্যাসে তিনি নিপুণ শিল্পী বটেন, কিন্তু—"Are we children in the nursery that we still require to be told a tale?"

Biology, Sociology, Economics, Sex-Psychology যাহাদের সমগ্র চিত্তকে জর্জ্জরিত করিয়াছে তাহারাও রসপিপাসু, এমন অবস্থায় সাহিত্যকেও বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। প্রেম যাহার নাই, মনের কসরৎকেই যাহারা প্রেমের মূল্য মনে করে, এবং সেই মূল্যে যাহারা সাহিত্য-রস ক্রয় করিয়া সাহিত্যেও নিজেদের অধিকার প্রতিপন্ন করিতে চায়,—রসিক হইতে হইবে বলিয়া যাহারা পণ করিয়াছে—আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ফলে তাহাদের সংখ্যা এত বেশি যে অতি অল্পসংখ্যক রসিকজনের ক্ষীণ প্রতিবাদ আর কাহারও কর্ণগোচর হয় না। রস বিদ্যার বাজারে বিক্রয় হয় না; ভাবুকতা, পাণ্ডিত্য বা তর্ক-বিচারের দ্বারা তাহাকে লাভ করা যায় না—জীবনেরই গভীরতম মূলে রস সঞ্চার হয় (যে ব্যক্তি যত বেশি জীবন-ধর্ম্মী—প্রকৃতি বা সৃষ্টির নেপথ্যলীলাগৃহে রসের যে উৎস শাশ্বতকাল ধরিয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে—সেই উৎস-জলে সে তত সহজেই স্নান করিয়া থাকে। আজ মানুষ সেই জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ভ্রষ্ট হইয়াছে—তাহার প্রাণের মূল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ অতিরিক্ত চিন্তাপীড়িত একজন আধুনিক লেখকের কাতরোক্তি মনে পড়িতেছে—চিন্তাজ্বরে বা শিরোরোগে অতিশয় জর্জ্জরিত, অথচ খাঁটি রসকল্পনার অধিকারী প্রতিভাশালী সেই লেখক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Lady Chatterly's Lover-এর এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না; তাহার মর্ম্মার্থ এই যে—মানুষ যে মুহূর্ত্তে চিন্তা করিতে সুরু করে, সেই মুহূর্ত্তে সে জীবন-রস হইতে বঞ্চিত হয়। আধুনিক মানুষ সেই প্রকৃতিদত্ত অতল গভীর জীবন-সংবিৎ হারাইয়াছে—জীব-জীবনের যে গভীর অনুভূতি, বাঁচিয়া থাকা যে পরম আশীর্ব্বাদ তাহা হইতে সে বঞ্চিত। মহাকবির একটি বাক্য একটু

পরিবর্ত্তন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মানুষের জীবনে সে স্বাস্থ্য, সে রং আর নাই, সে যেন—"sicklied o'er with the pal cast of thought"। কিন্তু বঞ্চিত হইয়া দুঃখ নাই—এই শিরোরোগই তাহার দম্ভের বিষয় হইয়াছে।

সাহিত্যের শিরঃপীড়া সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে কি না জানি না। বক্তৃতার বিষয় নির্ব্বাচন আমি করি নাই, অর্থাৎ নামকরণটি আমার নহে—এতক্ষণ পরে আমি নিজেই তাহা কবুল করিতেছি। কিন্তু শিরঃপীড়ার যে অর্থ আমি ধরিয়াছি, তাহা অসঙ্গত হয় নাই বলিয়া মনে করি। সাহিত্যের আদর্শ বা রসসৃষ্টির প্রেরণা সম্বন্ধে বহুকাল হইতেই নানা আলোচনা চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত সর্ব্বকালের রসিকজনসম্মত একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে—নানা যুগের নানা কবি নানা রসিক এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে একটা ঐক্যও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের সে আদর্শ টলিয়াছে, সাহিত্যসৃষ্টিতে এবং সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণে একটা ভিন্ন পন্থার প্রচলন হইয়াছে। রসসৃষ্টি-মূলক সাহিত্য, অর্থাৎ কাব্য উপন্যাস প্রভৃতির মধ্যে রসিকসমাজ এযাবৎ কাল যে বস্তুর আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইতেন—সেই বস্তু, সেই 'রস' নামক চিত্তচমৎকারকে একালের সাহিত্যামোদিগণ হয় অস্বীকার করেন, নতুবা, প্রধান পানীয়রূপে গ্রহণ না করিয়া ভাব ও ভাবনার অনুপান মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। আজিকার প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য ছিল ইহাই ; রসের সংজ্ঞা-নিরূপণ বা সাহিত্যের আদর্শ ব্যাখ্যা করা আমার অভিপ্রায় নয়। সে ব্যাখ্যার প্রয়োজনও নাই ; কারণ, প্রথমত, একালের সাহিত্যিক যাঁহারা তাঁহারা রসের সে ধারণাকে

occultism বা mysticism বলিয়া পরিহার করিয়াছেন ; দ্বিতীয়ত, যিনি রসিক নহেন তাঁহাকে কোনও রূপ ব্যাখ্যান বা বক্তৃতা দ্বারা রসিক করিয়া তুলিতে বোধ হয় ভগবানও পারেন না। রসের যে নানা পেটেণ্ট সংস্করণ আজকাল বাজারে সস্তা দরে বিকাইতেছে তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া রসের ব্যবসায়ে লাভবান হইবার আশা নিশ্চয়ই দুরাশা মাত্র। তাহা ছাড়া, সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের মত একজন রসিক রসস্রষ্টা এই বহুপ্রচলিত পেটেণ্ট রস-নির্য্যাসের বিরুদ্ধে দুই চারিটা সহজ কথা বলিতে গিয়া যেরূপ অপদস্থ হইয়াছেন, তাহাতে আমার মত একজন অতিশয় নগণ্য ব্যক্তির সে সম্বন্ধে কোনও বক্তৃতা করিতে যাওয়া শুধুই অশোভন নহে, হাস্যকর। তথাপি রবীন্দ্রনাথের দুই একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে এইখানে উদ্ধৃত করিবার দুঃসাহস আমিও দমন করিতে পারিলাম না। একজন আধুনিক 'intellectual' সাহিত্যিকের সহিত পত্রালোচনা-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে। বল্‌তে পারো, বর্ত্তমানে ইহা অপরিহার্য্য, তাই বলে বল্‌তে পারোনা, এটা সাহিত্য। হাটের জায়গা প্রশস্ত করবার জন্যে মানুষকে ঘর ছাড়তে হয়েছে, তাই বলে বলতে পারোনা সেইটাই লোকালয়···

"অতএব আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবণ হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই। তা' হোক্‌, তবু সাহিত্যের মূলনীতি চিরন্তন, অর্থাৎ রস-সম্ভোগের যে নিয়ম আছে তা' মানুষের নিত্য স্বভাবের অন্তর্গত যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে তবে সে গল্পই শুন্‌তে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে। এই গল্পের বাহন কী, না সজীব মানবচরিত্র। আমরা তাকে একান্ত সত্যরূপে চিন্‌তে চাই, অর্থাৎ আমার মধ্যে যে ব্যক্তিট

আছে সে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিরই পরিচয় নিতে উৎসুক ; কিন্তু কালের গতিকে আমার সে ব্যক্তি হয়তো অতিমাত্র আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পলিটিক্সে, তাই হয়তো সাহিত্যেও ব্যক্তিকে সে গৌণ করে দিয়ে আপন মনের মতো পলিটিক্সের বচন শুনতে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠে। এমনতরো মনের অবস্থায় সাহিত্যের যথোচিত যাচাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারিনে।...

"প্রাণের একটা স্বাভাবিক ছন্দোমাত্রা আছে ; এই মাত্রার মধ্যেই তার স্বাস্থ্য, সার্থকতা ও শ্রী। এই মাত্রাকে মানুষ জবরদস্তি করে ছাড়িয়ে যেতেও পারে। তাকে বলে পালোয়ানি ; এই পালোয়ানি বিস্ময়কর কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়, সুকর ত নয়ই।...সভ্যতা স্বভাবকে এতদূরে ছাড়িয়ে গেছে যে কেবলি পদে পদে তাকে সমস্যা ভেঙে ভেঙে চলতে হয়, অর্থাৎ কেবলি সে করবে পালোয়ানি।...

"পশ্চিম মহাদেশের এই কায়া-বহুল অসঙ্গত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেছে সাহিত্যে। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেছে বিপরীত মোটা হয়ে। সেখানে তারা সৃষ্টির কাজকে অবজ্ঞা করে' ইন্‌টেলেকচুয়েল কসরতের কাজে লেগেছে। তাতে শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড ; অর্থাৎ এটা দানবিক ওজনের সাহিত্য, মানবিক ওজনের নয়—বিস্ময়কররূপে ইন্‌টেলেকচুয়েল—প্রয়োজন-সাধক হতে পারে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণবান নয়।"

সর্ব্বশেষে উপন্যাস-সাহিত্যে তত্ত্ববস্তুর আমদানি সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

"আলোচনার সামগ্রীগুলি একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি

না হয়ে থাকে তবে প্রব্লেমে ও প্রাণে, প্রবন্ধে ও গল্পে জোড়াতাড়া জিনিষ সাহিত্যে বেশীদিন টিকবে না। প্রথমতঃ আলোচ্য তত্ত্ববস্তুর মূল্য দেখতে দেখতে কমে আসে, তারপরে সে আবর্জ্জনারূপে সাহিত্যের আঁস্তাকুড়ে জমে ওঠে। মানুষের প্রাণের কথা চিরকালের আনন্দের জিনিস—বুদ্ধি বিচারের কথা বিশেষ দেশকালে যত নূতন হয়েই দেখা দিক, দেখতে দেখতে তার দিন ফুরোয়। য়ুরোপে অপ্রাণের বোঝা প্রাণের উপর চেপেছে অতি পরিমাণে, সেটা সইবে না। তার সাহিত্যেরও সেই দশা।"

সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের মত উদ্ধৃত করিলাম—ইহাতে দেখা যাইতেছে, সাহিত্যের এই শিরঃপীড়া বা intellectual কস্‌রতের প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অতিশয় যথার্থ কথা অতি সহজ ও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেও তাঁহার মত একালের সাহিত্য-স্রষ্টাগণের বা সাহিত্য-প্রেমিকগণের অগ্রাহ্য। চিন্তা, প্রব্লেম, মতবাদ না থাকিলে যাঁহারা সাহিত্য বরদাস্ত করিতেই পারেন না, আজকালকার অধিকাংশ রসিক পুরুষ তাঁহাদেরই দলে। তাঁহারা বলেন—বাস্তব প্রত্যক্ষ জীবনের দুঃস্বপ্ন ও জ্বর-জ্বালার কথা যদি সাহিত্যে না থাকিবে, তবে মানুষের কোন্ প্রয়োজন আছে সাহিত্যে? তোমরা যাহাকে 'রস' বল—রবীন্দ্রনাথ যাহাকে প্রাণের কথা—চিরকালের আনন্দের জিনিস—বলিয়াছেন, তাহা তো মানুষের গৌরবের কথা নয়। আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ, শাশ্বত-সনাতন বলিতে যে আদিম যুগের নির্ব্বোধ আনন্দ বা রসসম্ভোগ বুঝায়, আজিকার আমরা কি তাহাতেই তৃপ্ত থাকিব? শাশ্বত-সনাতনের যে অপর প্রান্ত—অর্থাৎ রসতত্ত্বের ভবিষ্যৎ, সে সম্বন্ধে এই সকল প্রাচীনপন্থী রসিক অপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি আরও অব্যর্থ। আমরা শাশ্বত-সনাতনরূপী

কোনও কাল্পনিক দেবতার উপাসক নহি, আমরা ইতিহাসগত কালের দ্রষ্টা। সেই কালের ধারায় সাহিত্যে ক্রমবিকাশ—তাহার যুগোচিত নব নব রূপ, তাহার অতি চপল চঞ্চল প্রকৃতির কথা আমরা অবগত আছি। যাহাকে সাহিত্যের সনাতন বস্তু বলা হইয়াছে—মানুষের সেই প্রাণের কথা সাহিত্যে অনেকদিন নিঃশেষ হইয়াছে; মানুষ প্রাণকে ছাড়িয়া মনের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। সাহিত্যে মানুষের এই মনের ইতিহাসই তাহার গর্ব্বের বস্তু। ঊনবিংশ শতাব্দীর এত বড় সব ইংরেজ কবি—যাঁহাদের কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথও রস সম্ভোগ করিয়া থাকেন—তাঁহারা কি বিশেষভাবে সেই যুগের মানবীয় সভ্যতায়, নানা তত্ত্ব ও নীতিকথায়, তাঁহাদের কাব্যের প্রেরণা লাভ করেন নাই? যাঁহারা সাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই সকল কবির কবিমানসের—তাঁহাদের কাব্যগত বিশিষ্ট চিন্তার—সন্ধান করেন না? কেন করেন? তাঁহারা কি রসিক নহেন? যদি না হন, তবে সে রসে আমাদের প্রয়োজন নাই; আমরা কবি-সাহিত্যিককে আমাদের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা দুশ্চিন্তা, ব্যাধি ও আরামের মধ্যে পাইতে চাই। যে সাহিত্য কেবল রসসৃষ্টি করিবে, যাহাতে মানবের একটা অজ্ঞান অবোধ ভাবানুভূতির অবকাশই থাকিবে; যাহাতে একালের মানুষের মানস-জীবন—যে জীবন তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য—সেই জীবন প্রতিফলিত না হইবে, সে সাহিত্যের দিন ফুরাইয়াছে। হে শাশ্বত-সনাতনের পূজারী, হে আনন্দভিক্ষু, হে লোকোত্তর-চমৎকারের রসপিপাসু, তোমাকে দূর হইতেই নমস্কার করি; তুমি তোমার মিষ্টিক রসসম্ভোগে মগ্ন থাকে, আমাদের এ যুগের এ সাহিত্যকে রেহাই দাও।

অধিকাংশ আধুনিক সাহিত্যিকের সরাসরি জবাব এইরূপ। ইহাদের এই জবাবের জবাব দেওয়া নিষ্ফল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই প্রবন্ধে রসতত্ত্বের আলোচনা করেন নাই—করিয়াও কোন ফল নাই। যাহারা রসিক নহে, তাহাদের নিকটে রসের কথা বলিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। রসের কথা, সাহিত্যের আদর্শ ও প্রেরণার কথা, আজও কত রসিক কত ভঙ্গিতে, কত গভীর করিয়া বলিতেছেন; কাব্যসৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য কত রকমে ভেদ করিবার চেষ্টা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ অতি সহজ ও সরল ভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই, অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহকারে, এই আধুনিক যুগেই, কত সাহিত্য-রসিক সুপণ্ডিত মনস্বী লেখক বলিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সেই এক কথা—তাহা বলিয়া যেন শেষ হয় না! কারণ, রসের তত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়, ইঙ্গিতে আভাসে যোগেযাগে তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে হয়, কিন্তু বুঝাইবার প্রয়াসের ফলে সাহিত্যবিচারের যে অপরূপ সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহার আদর অতি অল্পলোকেই করে। সাহিত্যসৃষ্টি এই জগৎসৃষ্টিরই অনুগামী; কাব্য জীবনেরই মহাভাষ্য—কিন্তু সে জীবন—এই সমস্যাভার-পীড়িত, শিরো গগ্রস্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ভয়বিহ্বল, নিয়তি-শাসিত মানবজীবন নহে, যদি তাহাই হইত, তবে সাহিত্য বা ললিতকলার জন্মই হইত না। সাহিত্যে মানুষ সেই দিব্য অবস্থা আস্বাদন করিতে চায়, যাহাতে সে ক্ষণিকের জন্য তাহার ক্ষুদ্র 'আমি'টার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, জগৎরহস্যের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া, পরম নির্বৃতি লাভ করে। জীবন হইতেই সাহিত্য সেই রস নিষ্কর্ষণ করিয়া লয়; মানুষের সুখদুঃখের—মানুষের মনুষ্যত্বের যত রূপ, কালে কালে বিবর্ত্তিত হউক, জীবনের সমস্যা যতই জটিল ও বিচিত্র হউক, মানুষের মনের দীপ্তি যতই প্রখর হউক—রসসৃষ্টিতে কোন বাধাই হইতে পারে না। সেই এক

মানুষের জীবন বিচিত্র বেশে বিভিন্ন কালে কবি-রসিকের চিত্ত আকুল করিয়া তোলে—সেই এক অনাদি বিগ্রহ বিধাতার সৃষ্টি-মন্দিরে চির বিরাজমান! কাল তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া আরতি করিতেছে, যুগসমস্যা আলো ও ছায়ার মত তাহার অঙ্গে অঙ্গে যে নৃত্য নূতন সুষমার সৃষ্টি করিতেছে—কবি ও রসিক মুগ্ধনেত্রে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছে। কে বলিল সাহিত্যে সমস্যার স্থান নাই? সমস্যাই তো সেই আলোছায়ার খেলা যোগাইতেছে! কিন্তু সমস্যা যে রসসম্ভোগের হেতু নয়, তাহার প্রমাণ —সকল যুগের সমস্যা এক নয়, কিন্তু সেই সুষমা সকল যুগের সাহিত্যেই এক। সমস্যা অতি সরল হইলেও সে সুষমা যেমন, সমস্যা অতিশয় জটিল হইলেও তাই। ইলিয়াড, রামায়ণ ও মহাভারত যেমন উৎকৃষ্ট কাব্য, **Hamlet** এবং **Faust**-ও তাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যও তাহার ব্যতিক্রম নহে। সে সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গিয়া যদি কবি-মানস ও যুগ-প্রভাবের সম্বন্ধ আলোচনা করিতে হয়, তাহা অসঙ্গত নয়—যাহা কালের অধীন, যাহা ক্রমবিকাশধর্ম্মী, ইতিহাস তাহারই হিসাব রাখে। কিন্তু যাহা কালের অন্তর্গত হইয়াও কালাতীত, সেই সাহিত্যরসের যাচাই ঐতিহাসিকের কাজ নয়। **Shelley Wordsworth, Tennyson, Browning,** অথবা **Jane Austen George Elliot, Dickens** ও **Thomas Hardy**-র কাব্যরস যদি কেবল তাহাদের অন্তর্গত মানস-বস্তু বা তত্ত্বঘটিত সমস্যার মানদণ্ডে যাচাই করিয়া উপভোগ করিতে হয়, তবে তাহাকে সাহিত্যের অধ্যাপনা বলিব, রস-সম্ভোগ বলিব না।

অতএব সমস্যা, বা তত্ত্বালোচনা—চিন্তাজ্বর, বা শিরঃপীড়া—সাহিত্যের লক্ষণ নয়। যাঁহারা সাহিত্যে তাহাই চান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই

পণ্ডিত মনস্বী হইতে পারেন—কিন্তু তাঁহারা রসিক নহেন। এ কথা বলিলে তাঁহারা চটিবেন জানি ; কিন্তু যদি বেরসিক না বলিয়া তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান বলি—যদি বলি, রসিক হইবার মত নির্ব্বুদ্ধি তাঁহারা নহেন, তবে আশা করি তাঁহারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

চৈত্র, ১৩৪১

জাতীয় জীবন-সঙ্কটে

জোর করিয়া ফুল ফুটানো যায় না, ফুল না ফুটিলে ফলের আশা করা বৃথা। এই উপমাটি বর্ত্তমান জাতীয় সমস্যার পক্ষেও অতিশয় সত্য—কারণ বিশ্ব-প্রকৃতির তত্ত্বটি এই উপমার মধ্যে আছে, তাই এই উপমাটিকেই আশ্রয় করিয়া আমি আধুনিক বাঙালী জাতির দুরবস্থার কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমরা আধুনিক কালে—এই বিংশ শতাব্দীর সংক্রমণ হইতেই—রাজনৈতিক আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছি। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, আমরা এতদিন স্বপ্ন-সঞ্চরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ সেই স্বপ্ন ভাঙিয়া এক মহা-বিনাশের গহ্বর-মুখে দাঁড়াইয়াছি। জাতীয়তার যে মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করিয়া ক্রমাগত উত্তেজনা রক্ষা করিতেছিলাম, তাহা অতি উগ্র মাদকদ্রব্যের মতই আমাদিগকে প্রথমে প্রমত্ত ও শেষে দুর্ব্বল, দিক্‌ভ্রান্ত করিয়াছে; ভাববিলাসী বাঙালীর পক্ষে এই মন্ত্র প্রাণদ না হইয়া প্রাণঘাতী হইয়াছে। বাংলা দেশে আজ আর মানুষ নাই, ধার্ম্মিক পুরুষ নাই, সমাজ বা গোষ্ঠীপতি নাই—পারিবারিক অভিভাবকও নাই। প্রবল ভাব-বন্যার স্রোতে গৃহ ও সমাজের বন্ধন ছিঁড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে। বন্যার শেষে এখন বাস্তুর চিহ্ন কিছুই নাই—অতি গভীর পঙ্ক ও পঙ্কিল জলে জীবনের সমুদয় ক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইয়াছে। চিন্তা আমরা করি নাই, সত্যকার ভাবনা ভাবি নাই। কেমন করিয়া কি হইতেছে, কোন্‌ পথে চলিতেছি, অনিশ্চিতের প্রত্যাশায় নিশ্চিতকে হারাইতেছি কি না—

যাহা চাই ও যেমন ভাবে চাই, তাহা আমাদের ধাতুতে হজম হইবে কি না,—এমন কি, যাহা চাই, তাহা প্রাণের মনের সত্যকার চাওয়া কি না, কেবলমাত্র একটা পরানুচিকীর্ষা বা অভিমান-আক্রোশের তাড়নায় তাহা চাহিতেছি কি না—তাহা কখনও ভাবিয়া দেখি নাই। ফলে, যখন কঠিন বাস্তব মুখব্যাদান করিল, এবং তাহার সহিত যুঝিবার যেটুকু পৈতৃক শক্তি পূর্ব্বে ছিল, তাহাও হারাইয়াছি বুঝিতে পারিলাম, তখন নৈরাশ্যের আর সীমা রহিল না। যে জাতি কখনও রাজনীতির ছায়া মাড়ায় নাই, যাহার ধাতু-প্রকৃতিতে সেই কর্ম্মসংস্কার বা দূরদৃষ্টির প্রতিভা কখনও ছিল না, যাহার জীবন চিরদিন অন্য খাতে বহিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে স্বাধিকারনীতি, সাম্য ও সার্ব্বজনীন সহানুভূতি যাহাদের সামাজিক বা নৈতিক সংস্কারের বহির্ভূত, তাহারা যখন সহসা কতকগুলি 'আইডিয়া'র ভাব-রসে উন্মত্ত হইয়া একদা আন্দোলন সুরু করিল, তখন যাঁহারা সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে ও প্রাণে ইংরেজের ইতিহাস ও ইংরেজী রাজনীতি যতটা প্রেরণা যোগাইয়াছিল, দেশের মূক মুগ্ধ জন-সমাজের চরিত্র ও সংস্কার—দেশের ইতিহাসের ধারার গভীরতর ইঙ্গিত—তাঁহাদিগকে ততটা প্রণোদিত করে নাই। তাই ভাবসর্ব্বস্ব উত্তেজনার বশে ক্রমাগত বিপথে ঘুরিয়া এবং বার বার পরাহত হইয়া আজ সমগ্র বাঙালী জাতি নৈরাশ্যে ও অবসাদে অভিভূত হইয়াছে।

বাংলা দেশের প্রকৃত সমস্যা—বাঙালীর চরিত্রগত শক্তি ও অশক্তি; বাঙালী-সমাজের গত চারি পাঁচ শত বৎসরের শাসন-ব্যবস্থা ও তাহার মূলগত অভিপ্রায়; আধুনিক অভিনব শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনে সেই ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এবং তাহাতে জাতীয়

আদর্শের বিপর্য্যয় প্রভৃতি—সকল সমস্যা ধীরভাবে দূরদৃষ্টি-সহকারে ধ্যান ও চিন্তা করিয়া, আমরা এই আন্দোলনকে পরিচালনা করি নাই। যে ইংরেজ-শাসনের আনুকূল্যে হিন্দু বাঙালী নানা দিকে অগ্রগামী হইতে পারিয়াছে, সেই আনুকূল্যের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে কি না; যে সুবৃহৎ অপর সম্প্রদায় এই বাঙালী-জাতির জ্ঞাতি-প্রতিবেশীরূপে মূক মৌনী হইয়া অতিশয় অবনত অবস্থায় দিন গণিতেছে, ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব্বে তাহাদের সহিত কি ভাবে, কোন্ নীতির কৌশলে বসবাস করিয়াছি—তাহার সঠিক ভাবনা ও ধারণা; এবং এখনই বা য়ুরোপ হইতে ধার-করা জাতীয়তা-মন্ত্রের সাধনায় তাহাদের সহিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যোগস্থাপনের জন্য কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে মিলন সম্ভব, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিয়া—বরং, সমাজ-জীবনে বা ব্যক্তিগত মনোভাবে সেই পুরাতন নীতি সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিয়া, কেবলমাত্র একটা অন্ধ ভাবোন্মাদের 'ন্যাশনালিজ্‌ম'-এর মোহে আমরা এতকাল ছুটাছুটি করিয়াছি। দেশকে, জাতিকে, জাতির অতীত ইতিহাসকে, এবং জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতি-সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়া—বৈদেশিক শিক্ষার কতকগুলি মতবাদ মাত্র সম্বল করিয়া, যে কয়েকজন বাঙালী নেতা বিংশ শতাব্দীর বাঙালীকে রাজনৈতিক যুদ্ধে আহ্বান ও চালনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন প্রধান, তাঁহাদের সহিত দেশের নাড়ীর যোগ ছিল না—দেশীয় সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ প্রাণের যোগ তাঁহাদের ছিল না; জাতির মজ্জাগত সমাজ-নীতি ও ধর্ম্ম-সংস্কার বুঝিবার, জানিবার বা সহানুভূতি-সহকারে বিচার করিবার সুযোগ বা শক্তি তাঁহাদের ছিল না। তাই প্রথম হইতেই তথাকথিত জাতীয়তার নামে আমরা জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। এতবড় একটা

বিপ্লব—সমগ্র জাতির জীবন-মরণ যাহার ফলাফলের উপর নির্ভর করে, যাহার পরিণাম সুদূর-প্রসারী—তাহার মূলে সেই পূর্ণজ্ঞান বা দিব্যদৃষ্টি ছিল না। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দের সেই ভাব-প্লাবনের কথা এখনও অনেকের মনে আছে—কেমন করিয়া সেকালের যুবকসম্প্রদায়ের মনে আগুন ধরিয়াছিল, তাহা আজও বুঝিতে পারি। সেই কালের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের সিংহনাদ বাংলার যুবক-ছাত্রসমাজে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল; তাহারও পূর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাবুক ও চিন্তাশীল মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর অতীত গৌরব উদ্ধার, এবং সেই সঙ্গে বাঙালীর কলঙ্কমোচনকল্পে এক অত্যুচ্চ আদর্শবাদমূলক, সুগভীর কবিত্বপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই দুই মহাপুরুষের দ্বারা কর্ষিত চিত্তভূমিতে অতঃপর যে বীজ বপন করা হইল, তাহার ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। সেকালের যুবক-সম্প্রদায় 'পলিটিক্স' বুঝিত না, তাহারা অত্যুগ্র আদর্শবাদী ছিল। আনন্দমঠ, গীতা, ভক্তিযোগ, ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—এই সকলের আধ্যাত্মিক উন্মাদনায় তাহারা কেবল জীবন উৎসর্গ করিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল—বাঁচিবার কথা কেহ ভাবে নাই। সেই আধ্যাত্মিক আবেগের আগুনে তাহারা ন্যায়-অন্যায়, সুমতি-কুমতি, পাপ-পুণ্য, নীতি-দুর্নীতির দ্বন্দ্ব ভস্মসাৎ করিয়াছিল—দেশ ও জাতি তাহাদের নিকটে একটা অবাস্তব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া কেবল আত্মত্যাগ ও আত্মঘাতের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। ভাবের এই আগুন বেশিক্ষণ ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পারে নাই। ইহার পরে পলিটিক্সের অতি স্থূল ও নগ্ন নীতিই জয়লাভ করিল। ভাবোন্মাদের প্রতিষেধক নানা সমস্যা ক্রমে চারিদিকে জটিল ও ভয়াবহ হইয়া উঠিল; সেই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইবার বা সেগুলির সমাধানে চিন্তাশক্তি

নিয়োজিত করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত আর রহিল না। এমনই করিয়া একটা ভাবোন্মাদ বা অবাস্তব আদর্শবাদের মোহে গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ এ দেশের যুব-শক্তি দিশাহারা হইয়া ক্রমে সর্ব্বপ্রকার নীতিভ্রষ্ট হইয়াছে। সমাজে পরিবারে ভাঙন ধরিয়াছে; অস্বাস্থ্য ও অন্নাভাব প্রবল হইয়াছে, এবং তাহার ফলে অতি উচ্চ আদর্শবাদ হইতে একেবারে দুর্নীতির গভীরতম গহ্বরে অধঃপতন ঘটিয়াছে।

আজ যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেশের সমগ্র চিন্তা-শক্তি ও চরিত্র-শক্তি যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাই কেন্দ্রীভূত করিয়া—আমরা যে ভুল করিয়াছি, সেই ভুল ভাঙাইবার যত কিছু উপায় আছে, তাহার ভাবনা ও নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এখন সর্ব্বাগ্রে চিন্তার সত্য চাই, এবং সেই সত্য সর্ব্বত্র প্রচার করা চাই। নূতন আদর্শে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে না পারিলে জাতি-হিসাবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। অর্থনীতি বা রাজনীতির জ্ঞান যতই প্রয়োজনীয় হউক—কোন জ্ঞানই প্রাণমূলে শক্তি সঞ্চার করে না, যদি জাতি প্রকৃতিস্থ না হয়। এজন্য সর্ব্বাগ্রে শিক্ষানীতি ও তাহার পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। আজ যাঁহারা পুরাতন আদর্শে শিক্ষিত হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা গত যুগেরই সেই ভাব-প্লাবনের শেষ কর্দ্দমস্তর—কোনও আদর্শ, কোনও সত্য-চিন্তা বা নিঃস্বার্থ-নীতি তাঁহাদের নিকট আশা করাই বৃথা। আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মরক্ষা ছাড়া তাঁহাদের জীবনে আন্তরিক লোক-কল্যাণ-কামনার প্রমাণ লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য আছে, তর্কবুদ্ধি আছে, অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি আছে—কিন্তু এ সকলের মূলে প্রেম নাই। লোকসাধারণের জন্য, জাতির সর্ব্বনাশ নিবারণের জন্য, যে আকুল উৎকণ্ঠা মহাপুরুষদিগের হৃদয়ে সদা-জাগরূক থাকে—ধ্যান, চিন্তা

ও কর্ম্মে যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়—সেই উৎকণ্ঠা কুত্রাপি নাই। রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে আমরা স্থানবিশেষে যেটুকু স্বদেশানুরাগ লক্ষ্য করি, তাহাতে দিব্যদৃষ্টির পরিচয় নাই, বুদ্ধি বা প্রতিভার উন্মেষ নাই—তাহার কারণ, সে অনুরাগে সত্য নাই, শক্তি নাই। সমগ্র জাতিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, স্বার্থপরতা হইতে কেহই মুক্ত নয়। দেশ বা জাতির চিন্তা দূরে থাক, ইহারা আপন বংশধর পুত্র-পৌত্রের ভবিষ্যৎ-চিন্তাও করে না—সে চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি নাই, কারণ—অক্ষম ও নিরুপায়। অতএব দেশের যদি কোনও ভবিষ্যৎ থাকে, যদি এখনও আশা রাখিতে হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশের দিকে তাকাইতে হইবে, নূতন জাতির সৃষ্টি করিতে হইবে। এখন হইতে তাহার আয়োজন চাই, কুড়ি পঁচিশ বৎসর পরে যাহারা এই দেশে পূর্ণবয়স্ক হইয়া বাস করিবে, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার জন্য শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

এই পরিবর্ত্তনের জন্য সর্ব্বপ্রথমেই চাই শিক্ষা কথাটির নূতন অর্থবোধ। আমার মনে হয়, বিগত এক শত বৎসর আমাদের দেশে যে অভিপ্রায় ও যে প্রণালীতে শিক্ষাদান হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষার ধারণাই অন্যরূপ হইয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিতে আমরা বুঝি—চাকুরিলাভ, এবং সেই সঙ্গে জাতি ও সমাজ হইতে পৃথক ও স্বাধীন ভাবে জীবনযাপনের গৌরব; আর্থিক সচ্ছলতা ও শহরের ভদ্র আবহাওয়ায় বাস করিবার মহাসৌভাগ্য—ইহাই শিক্ষালাভের পরম পুরস্কার। পাঁচজনে সভয়-সম্ভ্রমে দূর হইতে ঈর্ষা করিবে, আমার জ্ঞাতিবর্গ আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে স্পর্দ্ধা করিবে না; শেষ পর্য্যন্ত, সরকারী উপাধিভূষিত হইয়া সর্ব্বকামনা চরিতার্থ করিয়া যখন মৃত্যুরূপ মোক্ষলাভ হইবে, তখন

সংবাদপত্রে সচিত্র শোক-সংবাদ ছাপা হইবে, হয়তো বা শোকসভাও হইবে। ইহাই আমাদের শিক্ষালাভের চরম লক্ষ্য। এই শিক্ষালাভের প্রণালীও তদপযুক্ত। কতকগুলি পুঁথির সাহায্যে শিশুকাল হইতে মনকে শাণিত ও স্বভাব-ধর্ম্মকে রুদ্ধ করিতে হইবে। পুঁথিগুলিতে যে সকল বাক্য আছে, সেইগুলিকে কোনওরূপে মগজস্থ করিয়া "পরীক্ষা" নামক যন্ত্রে এক একটা চিহ্নে চিহ্নিত হইতে হইবে। এই ছাপ নিজের মানসচর্ম্মে যে যত গভীর করিয়া মুদ্রিত করিয়া লইতে পারে, সে-ই চাকুরির ক্ষেত্রে তত বেশি উচ্চস্থান-লাভের অধিকারী, তাহার কলরব তত বেশি। যদি ছাপ-অনুযায়ী চাকুরি না মিলে, তবে আক্ষেপ ও আক্রোশের সীমা নাই। এই চাকুরির প্রতিযোগিতার ফলে—জ্ঞাতি বন্ধু ধর্ম্ম সমাজ, সর্ব্বত্র মহা রেষারেষি—মনুষ্যত্বের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন হইয়া যায়। যে প্রণালীতে, এবং যে আদর্শ ও অভিপ্রায় সম্মুখে রাখিয়া, শিক্ষার নামে এই ঘোরতর অকল্যাণকর প্রথা আমাদের দেশে প্রথমে অপ্রকট ও পরে ক্রমশ প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহার চিন্তা যে কেহ করিবেন, তিনিই শিহরিয়া উঠিবেন। অর্থোপার্জ্জন বা জীবিকা-সংগ্রহ মানুষমাত্রেরই জীবনের অতিশয় আবশ্যিক কর্ম্ম; কিন্তু শিক্ষালাভ করা বা মানুষ হওয়া যে তাহারও অপেক্ষা প্রাথমিক প্রয়োজন, এবং এই দুইয়ের অন্যোন্য-সাপেক্ষতা যতই সত্য হউক—আদৌ শিক্ষা যে শিক্ষার জন্যই, সে কথা আমরা বহুদিন ভুলিয়াছি। আধুনিক শিক্ষানীতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, কেমন করিয়া আমরা যে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এককালে শিক্ষা ছিল মেধার উৎকর্ষসাধন—একপ্রকার পাণ্ডিত্য-সাধনা। তখনও তাহার অন্তরালে জীবিকা-সংগ্রহরূপ উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিদ্যমান ছিল; তথাপি সেকালে পাণ্ডিত্যলাভের আগ্রহও

কতক পরিমাণে ছিল, যদিও শিক্ষার মূল অভিপ্রায়—সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব-বিকাশের ভাবনা কোন কালেই ছিল না। উত্তরকালে প্রকৃত পাণ্ডিত্য বা মেধার উৎকর্ষ-সাধন এতই গৌণ হইয়া উঠিল যে, অবশেষে শিক্ষার সেটুকু সার্থকতাও আর রহিল না। আজকাল যাঁহারা উচ্চ-শিক্ষা শেষ করিয়া 'রিসার্চ' নামক তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে ; ইহাতে আমাদের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বা বিদ্যার প্রতি বিশেষ আসক্তি বাড়িয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদলাভের কারণ নাই। উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই সকল ছাত্র অধিকাংশ স্থলে সদ্য অর্থলাভের আশায়, যতদিন চাকুরি না হয় ততদিন গবেষণাপ্রসাদে কিঞ্চিৎ বৃত্তিলাভের লোভে, এইরূপ 'তপশ্চর্য্যা' করিয়া থাকেন। যদি শেষ পর্য্যন্ত একটা কিছু প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন, এবং তাহার ফলে আর একটা উপাধিলাভ ঘটে, তবে জ্ঞান-চর্চ্চার প্রয়োজন প্রায়ই আর থাকে না—সেই উপাধির সাহায্যে অতঃপর চাকুরির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। সেই গবেষণা তাঁহাদের জীবনে, অথবা দেশে জ্ঞান-বিস্তারের পক্ষে, আর কোনও ফল প্রসব করে না। আজকাল এইরূপ গবেষণার ক্ষেত্রে—অর্থাৎ চাকুরির প্রতিযোগিতায়—দেশী-মার্কা উমেদারের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, অতঃপর বিদেশ হইতে ছাপা হইয়া না আসিলে সকল বিদ্যা বন্ধ্যা হইবার সম্ভাবনা ; তাই দলে দলে বিদেশ-যাত্রার ধুম পড়িয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষা ও শিক্ষিতের চরম আদর্শ।

শিক্ষার নামে এই অনাচার বহুদিন যাবৎ চলিয়াছে। ইহার ফলে জাতির চিত্ত কলুষিত হইয়াছে, স্বভাবগত মনুষ্যত্বও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। উচ্চশিক্ষার অভিমান বাড়িয়াছে, অথচ, প্রকৃত শিক্ষা—

যাহাকে উচ্চ বা নিম্ন কোনও নাম দিবার প্রয়োজন নাই—সেই শিক্ষা দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। দেহ, মন ও প্রাণ এই তিনের যুগপৎ পুষ্টিসাধন; সত্য-পিপাসার উদ্রেক ও তাহার পানীয়-সংস্থান; চরিত্র ও বুদ্ধির মিলিত শক্তি; সমাজ ও গোষ্ঠীর সহিত নাড়ীর যোগরক্ষা; দেশের ইতিহাস—তাহার অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনামূলক জ্ঞান; এবং সর্ব্বোপরি, স্বার্থের সহিত পরার্থের সামঞ্জস্যবিধান—এক কথার মানুষ হইতে হইলে মনুষ্যসন্তানের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার কোনটাই আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর লক্ষ্য নয়। দেশকে আমরা ভুলিয়াছি, পিতৃ-পরিচয় জানি না, বিদেশী শিক্ষার অন্তর্গত পরধর্ম্মের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া, কেবলমাত্র মস্তিষ্কের মধ্যে তাহার আলোড়ন অনুভব করিয়া, জাতীয় সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়াছি। নিজকে জানিতে চাহি নাই, আত্মীয়কে পর করিয়াছি; দেহের রক্তে যে বীজ নিহিত আছে, সে বীজের চাষ বন্ধ করিয়াছি। ক্রমাগত পরানুচিকীর্ষার ফলে প্রাণ-মনের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি হারাইয়াছি—দাস-মনোভাব মজ্জাগত হইয়াছে। আজ শিক্ষা-সংস্কারের যে নানা কলরব শোনা যাইতেছে, তাহার মূলেও সেই একই মনোভাব রহিয়াছে। সহজ সরল দৃষ্টি তাহাতে নাই—মনের কুটিল চিন্তায় তাহা আচ্ছন্ন, প্রাণের সাড়া তাহাতে নাই। শিক্ষানীতি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক বা দলীয় কূটনীতি শিক্ষার নামে স্বার্থসাধনের সুযোগ পাইতেছে। মুখে বড় বড় কথা, কিন্তু আসল লক্ষ্য ভাগাড়ের দিকে। যাহারা গম্ভীরভাবে শিক্ষা-সংস্কারের চিন্তা করে, তাহারাও মাছি-মারা কেরানীর মত য়ুরোপীয় পদ্ধতির 'ট্রু কপি' করিতে চায়। কোনও জাতির শিক্ষা-পদ্ধতি যে, তাহার পারিপার্শ্বিক ও প্রকৃতির—তাহার জীবনযাত্রা-প্রণালীর—উপযোগী না হইলে, ফলপ্রদ হয় না, সে কথা আমাদের দেশের ময়ূরপুচ্ছধারী বায়স-সমাজ ভুলিয়া

যাইতে পারিলেই গৌরব বোধ করেন। এক দেশের পক্ষে যাহা ঔষধ, আর এক দেশের পক্ষে তাহাই বিষ। য়ুরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতি যে বিজ্ঞানের বিষয় লইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মূলে সার্ব্বজনীন তত্ত্ব থাকিলেও, অবস্থাভেদে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ-ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হইতে বাধ্য; তাহা ছাড়া, কোনও পদ্ধতি কখনও সর্ব্বত্র সমান উপযোগী হইতে পারে না। তাহার কারণ, জীবনযাত্রার প্রণালীভেদ আছে, এবং সর্ব্বোপরি—কোনও জাতির মানস-প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য—বহুকালাগত তাহার সেই স্বধর্ম্ম একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল মনোবিজ্ঞান বা মনোস্তত্ত্বের উপরেই নির্ভর করিলে সুফল লাভ হইবে না।

আমাদের বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ সমস্যার মূলে এই শিক্ষার সমস্যা রহিয়াছে। কেমন করিয়া কি করিলে এই সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান লেখকের নাই। আমার এ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য তো নাই-ই, অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট নাই। আমি আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব আয়ত্ত করি নাই, আমি রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির গবেষক নহি—আমি কেবল দেশের বর্ত্তমান অবস্থার নানা লক্ষণ, জাতির ঘোরতর মুহ্যমান অবস্থা চাক্ষুষ করিতেছি এবং তাহারই অতিশয় সরল ও সহজ কার্য্যকারণঘটিত প্রশ্ন নিজ মনে বহুদিন চিন্তা করিয়াছি। তাহার ফলে আমার প্রতীতি হইয়াছে, সর্ব্বপ্রথমে এই শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, এবং বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে—মানুষ গড়িয়া তোলা। স্বাস্থ্য, চরিত্র ও কর্ম্মবুদ্ধি, আত্ম-প্রত্যয় ও চিত্তশুদ্ধি, সাধারণভাবে মনুষ্যজগতের সহিত পরিচয় ও বিশেষভাবে আত্মপরিচয়—নিজ জাতির ইতিহাসের সম্যক জ্ঞান—এই সকল অর্জ্জন, উদ্বোধন ও সংবর্দ্ধন শিক্ষার মূলীভূত অভিপ্রায়

হইবে। ইহার ফলে বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তখন সে অন্তত ততটুকু দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী হইবে, যাহাতে জীবন-সংগ্রামে সে কিছুতেই নৈরাশ্যকাতর হইবে না, এবং অবস্থা যেমনই প্রতিকূল হউক, তাহাকে অনুকূল করিয়া তুলিতে পারিবে। এ যাবৎ কাল, যেমন, *'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই'*—এই মন্ত্রেই সে হাতে-খড়ির সময় হইতে দীক্ষা লাভ করে, এবং জ্ঞান ও বয়সের বৃদ্ধিসহকারে চাকুরি-ফলপ্রদা বিদ্যারই সাধনা উত্তরোত্তর একাগ্র মনে করিয়া থাকে, ও তাহার ফলে নিজের আত্মাকেও ভুলিয়া যায়; আত্মশক্তি, চরিত্রবল বা ধর্ম্মবুদ্ধি কিছুই আর থাকে না, পরিশেষে চাকুরিও মরীচিকার মত কেবল দূরেই সরিয়া যাইতে থাকে—তেমন আর হইবে না, চাকুরিকেই মুখ্য না করিয়া গোড়া হইতেই মনুষ্যত্বকেই মুখ্য করিয়া ধরিলে পরিশেষে চাকুরিহীন মনুষ্যত্ব তাহাকে যতখানি বাঁচাইয়া রাখিবে,—মনুষ্যত্ব ও চাকুরি দুইয়েরই অভাব তাহাকে সেটুকু বাঁচাইয়া রাখিবে না। এজন্য শিক্ষা-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক সংস্কার প্রভৃতি হুজুগ ত্যাগ করিয়া, শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মনোভাবই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সরস্বতীকে চাকুরি-দেবতার পাদপীঠরূপেই বজায় রাখিয়া, তাঁহার অঙ্গ-সংস্কার করিতে যাওয়া নিতান্তই আত্ম-প্রবঞ্চনা। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি আমূল উৎপাটন করিয়া একেবারে নূতন ভিত পত্তন করিতে হইবে—এক পক্ষে তথাকথিত উচ্চশিক্ষার মোহ এবং অপর পক্ষে তাহার ব্যবসা-দারির উচ্ছেদ করিতে হইবে।

কথাটা শক্ত হইল এবং বড় লম্বা শোনাইল তাহা জানি, তথাপি এ ক্ষত প্রলেপ দ্বারা আরোগ্য হইবে না। শিক্ষা যাহা হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই—পুস্তকের বোঝা এবং তাহার অনুপাতে বিদ্যার

পরিমাণ—শিশুপাঠ্য পুস্তকেরও রচনা, সঙ্কলন ও নির্ব্বাচন-প্রণালী—শিক্ষার দুর্ম্মূল্যতা ও 'পাসে'র সুলভতা—এ সকল লক্ষ্য করিলে, এই মুমূর্ষু জাতির উপরে এই প্রকার নির্ম্মম প্রবঞ্চনা অসহ্য বলিয়া মনে হয়। "শিক্ষিত যুবকের বেকার অবস্থা"—এইরূপ বাক্য আজকাল বহু-প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বাক্যের প্রথম অংশ সম্বন্ধে কেহ সন্দেহও করে না। "বেকার অবস্থা" কথাটা সত্য, কিন্তু "শিক্ষিত যুবক" কথাটা কোনও অর্থে সত্য কি? এই "শিক্ষিত" নামটির আলেয়ার পশ্চাতে দলে দলে যাহারা ছুটিতেছে, তাহারা বেকার হইবে না তো হইবে কাহারা? আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তারা তাহা স্বীকার করিতে নারাজ—তাঁহারা এইরূপ শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়াইয়া, এবং আরও বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল হইয়া উঠেন। ইহার মূলে জাতির প্রকৃত কল্যাণ-কামনা কতখানি আছে, তাহা বিচার না করাই ভাল। ব্যক্তিগত প্রভাব, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব-গৌরব, এবং তৎসহ মূঢ় ও মোহগ্রস্ত সমাজে "পাস"-বিক্রয়ের ব্যবসায়টি অক্ষুণ্ণ রাখা ভিন্ন, অর্থনাশ মনস্তাপ ও আয়ুক্ষয়ের এই বিরাট যন্ত্রটিকে সচল রাখিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; অন্তত জনসাধারণের পক্ষে ইহার কোনও আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনবোধ থাকিত, সন্তানকে শিক্ষিত করিবার জন্য ব্যক্তি ও সমাজ উদ্‌গ্রীব হইত, তাহা হইলে শিক্ষকগণের এমন দুরবস্থা হইত না—স্কুল-মাস্টারকে সমাজে পতিত হইয়া থাকিতে হইত না; শিক্ষকতায় যেমন যোগ্যতার আবশ্যক হইত, তেমনই তাহার মূল্য ও মর্য্যাদাও থাকিত; এবং পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নও এরূপ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় হইয়া উঠিত না—নিত্যনব মুদ্রিত রাবিশের স্তূপ প্রতি বৎসর এক দফা

পরিষ্কার করিয়া ও আর এক দফা ক্রয় করিয়া বালকের ইহকাল ও অভিভাবকের পরকাল খোয়াইতে হইত না।

আমি সমস্যার মূল সন্ধান করিয়াছি—বর্ত্তমান ও জাতীয় সঙ্কটের বিষয় যেদিক দিয়াই চিন্তা করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত ঐ এক মূল কারণে আসিয়া ঠেকিতে হয়। ধর্ম্মহানি ও চরিত্রের অধঃপতনই এ জাতির আসন্ন মৃত্যুর নিদান—মনুষ্যত্বের কোনও লক্ষণই আর কোথাও দেখা যাইতেছে না। এককালে জোর করিয়া ফুল ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছিল—গাছের দিকে আমরা লক্ষ্য করি নাই, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করি নাই, মূলে রস-সঞ্চারের ভাবনা ভাবি নাই—সত্ত-ফলপ্রাপ্তির আশা করিয়াছিলাম। আজ এখনও যদি সত্য ও শুভবুদ্ধির উদয় হয়, যদি ফল ও ফুলের প্রত্যাশা একটু দূরে রাখিয়া একেবারে মাটির কাজে হাত লাগাইতে পারি, উপর হইতে লম্বা লম্বা কথা না বলিয়া নীচে নামিয়া নীরবে কাজ সুরু করিতে পারি, তবেই এখনও বাঁচিলেও বাঁচিয়া যাইতে পারিব। দেশে এখন সবচেয়ে বড় শুভ ঘটনা হইবে—"The schoolmaster is abroad"; এই ঘটনা ঘটিতে হইলে চাই সত্যসন্ধ মহাপ্রাণ মনীষীকে—রাজনীতি নয়, প্রাণ-ধর্ম্মনীতির উপদেষ্টাকে। দেশ এক্ষণে সেই মনীষা ও মহাপ্রাণতার প্রতীক্ষাই করিতেছে।

আশ্বিন, ১৩৪৭।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম *

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-পূজার উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। উৎসবমাত্রেই ভাবোদ্রেক করে; বিশেষত যাহা বহুজনকৃত্য তাহার মূলে ভাবোদ্দীপনা চাই। এইরূপ উৎসবের আবশ্যকতা আছে—ইহার অভাব ঘটিলে জাতির মানসিক স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা জাগে। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে মহাপুরুষের স্মৃতিতর্পণ করিবার একটি প্রথা আছে—পঞ্জিকায় আবির্ভাব ও তিরোভাবের তিথি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেই তিথিতে স্থানবিশেষে মেলাও বসিয়া থাকে। একালে এই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; তাহা ছাড়া, মহাপুরুষের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক হইয়াছে, এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহাপুরুষের স্মৃতিতর্পণ প্রাচীন প্রথা অনুসারে হওয়া সম্ভব নয়—যদিও এইরূপ উৎসবে ভাবোদ্দীপনার প্রয়োজন তেমনই আছে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিতে হইলে কেবল ভাবোদ্দীপনাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে চলিবে না, উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে—স্মরণ ও কীর্ত্তনের মত—মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন আছে। যে মহাপুরুষকে আমরা আজ এই উৎসবে স্মরণ করিতেছি—তিনি এ জাতির জন্য এমন কি করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ তেমনভাবে করেন

---

* মুন্সীগঞ্জ বঙ্কিম-শতবার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

নাই, তাঁহার জীবনের ব্রত ও তাহার উদ্‌যাপন-কাহিনী, তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা—এ সকল অতি ধীরভাবে আলোচনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আরও ভাবিয়া দেখিতে হইবে—যে যুগে আমরা বাস করিতেছি সেই যুগে আমরা বঙ্কিম-প্রদর্শিত সেই আদর্শ হইতে কতখানি ভ্রষ্ট হইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী জাতির যে প্রতিভা, ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান এই মহাপুরুষের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার তুলনায় আজিকার বাঙালী কি শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে? কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্র নহেন—তিনি সে যুগের সমগ্র বাঙালী জাতির প্রতিনিধি। বঙ্কিম যাহা ভাবিতেন, সমগ্র শিক্ষিত বাঙালী-সমাজ তাহাই ভাবিত, বঙ্কিমচন্দ্র যেদিকে যেমন প্রবর্ত্তনা দিতেন, সকলের প্রাণমন সেই দিকে প্রবর্ত্তিত হইত। এজন্য, সেকালে এমন একটি প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, যাহার মূলে বঙ্কিম নাই, তাহা বাংলা দেশে চলিবে না। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে পারিলে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাকে বুঝিতে পারিব—একটি মানুষের পরিচয় হইতে একটা যুগ ও জাতির পরিচয় পাইব; এবং সে যুগের মত যুগ বাঙালী জাতির ইদানীন্তন ইতিহাসে আর নাই। বাঙালীর মনীষা ও প্রতিভার যে খ্যাতি আজও ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হয় নাই—শিক্ষায়, সাহিত্যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, ধর্ম্ম ও সমাজনীতির চিন্তায়, এককালে বাঙালী সারা ভারতের যে নেতৃত্ব করিয়াছিল—সে এই যুগেরই অভাবনীয় জাতীয় জাগৃতির ফলে; এবং সেই জাগৃতির মূলে যত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের সাধনা সঞ্চিত হইয়াছিল, বঙ্কিমের প্রতিভাই তাহাদের সকল অপেক্ষা সঞ্জীবনী-গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। আজ সেই কথাই, সকল সাম্প্রদায়িক

সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া, মুক্ত মনে ও মুক্ত প্রাণে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

আজিকার সভায় আমি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনার প্রধান লক্ষ্য ও তাঁহার প্রতিভার মূল প্রেরণার সম্বন্ধে কিছু বলিব। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা ও সাহিত্যিক প্রতিভার বিষয়ে আলোচনার নানা দিক আছে, সে আলোচনা অতি সংক্ষিপ্তভাবেও একটি বক্তৃতার মধ্যে করা সম্ভব নহে—তাই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সকল চিন্তা, ভাবনা ও কল্পনার যে একমাত্র উৎস তাঁহার স্বজাতি-প্রেম, তাহার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি কথা আজ সর্ব্বত্র শোনা যাইতেছে, সে কথা এই যে—তিনি ছিলেন জাতীয়তা-মন্ত্রের ঋষি, তাঁহারই সাধনার ফলে আমরা চিরদিনের জন্য একটি নূতন প্রাণমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছি। এই কথাটিই বঙ্কিম-স্মৃতি-উৎসবে অতি সহজ ভাবোদ্দীপনার পক্ষে বড় কাজে লাগিয়াছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, অতিশয় অজ্ঞান ও মুগ্ধ ভাবাবেগ ছাড়া এই কথাটির অর্থ আমরা আর বুঝি না, বুঝিবার চেষ্টাও করি না। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম ও আধুনিক রাজনৈতিক ন্যাশন্যালিজ্‌ম এক নহে; এক যে নহে, তাহার প্রমাণ 'বন্দে মাতরম্' গানটিকে লইয়া আমরা বড় মুশকিলে পড়িয়াছি। আমরা আজ যে পন্থা ও আদর্শকে অতিশয় সত্য ও সমীচীন মনে করিয়া আশ্রয় করিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তা-ধর্ম্ম ও তাহার সাধনমন্ত্র তাহা হইতে এত ভিন্ন যে, সেই আদর্শ ও সেই পন্থাকে ধরিয়া থাকিতে হইলে 'বন্দে মাতরম্' গানকে বর্জ্জন করাই সঙ্গত। 'বন্দে মাতরম্' গান একটা 'স্লোগান' মাত্র নয়, উহা এমন একটা অবুঝ ভাবোদ্দীপনার কৌশলপূর্ণ চীৎকারমাত্র নয় যে, যে কোনও ধর্ম্মের যে কোনও অনুষ্ঠানে উহাকে

ব্যবহার করা চলিবে। ঐ গান এখন মাত্র একটি সেণ্টিমেণ্টের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—উহার গূঢ় অর্থ বুঝিবার প্রয়োজনও আর নাই। যে পন্থা ও পদ্ধতিতে, যে উদ্দেশ্য ও অভিমান লইয়া, আমরা এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম বা জাতীয়তা-ধর্ম্ম তাহার অনুকূল নহে। কেন নহে, তাহা বুঝিতে হইলে কেবল ঐ গানটি লইয়াই ভাবোন্মত্ত হইলে চলিবে না—উহার মূলে ঋষি-বঙ্কিমের যে মন্ত্র-দৃষ্টি ছিল তাহাই শ্রদ্ধার সহিত ধারণা ও ভাবনা করিতে হইবে। তাহা হইলে, আজ যে কেন ঐ গানের সুরে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের সুর মিলিতেছে না—ফাঁকি যে কোথায়, তাহা ধরা পড়িবে। এ আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমি সাধারণ ভাবে দুই চারি কথা বলিব।

এ কথা এখন ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতের নব-জাগরণের স্বপ্ন বাঙালীই প্রথম দেখিয়াছে, এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবের ক্ষেত্রে সত্য করিয়া তুলিবার উপায়-চিন্তা বাঙালীই সর্ব্বপ্রথমে করিয়াছে। এই যে স্বপ্ন—ইহা যে ভাব-কল্পনা ও ধ্যান-চিন্তার ফল, তাহা বাঙালীর প্রতিভাতেই সম্ভব হইয়াছিল, বাংলার জলবায়ুতেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভিপদ্মনালে যেমন সৃষ্টিশতদল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তেমনই এই বাঙালী-জাতির দেহ-মন-প্রাণের অন্তস্তল হইতে নব মহাভারতের পরিকল্পনা বাক্‌-ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। রামমোহনের মনীষা যাহাকে একটা বুদ্ধিসম্মত আদর্শরূপে প্রথমে অনুভব করিয়াছিল, এবং বিবেকানন্দ যাহাকে অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শে শোধন করিয়া জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেই, রামমোহনের বাস্তব ও বিবেকানন্দের আদর্শ—এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তীরূপে

স্থাপনা করিয়াছিলেন। এক দিকে জাতির অতীত ঐতিহ্য, ও অপর দিকে তাহার বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম—এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি একটি অতিশয় প্রাণদ, অথচ আধ্যাত্মিক পিপাসার উপযোগী, জীবনযাত্রার আদর্শ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ও মনীষী—এই জাতিরই প্রাণ-মন ও দেহগত সংস্কার, এবং সাধারণ মানবধর্ম্ম, এই সকলকে তাহার দিব্যদৃষ্টি দ্বারা একই ভাবসত্যের অঙ্গীভূত করিয়া, আগত ও অনাগত যুগের উপযোগী একটা সাধনপন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; ইহাতে প্রতিভার যাহা প্রধান লক্ষণ তাহাই রহিয়াছে—যাহাকে সৃষ্টিকর্ম্ম বলে, ইহা সেইরূপ একটি সৃষ্টিকর্ম্ম। বাস্তব ও আদর্শ, যুগ ও সনাতন, মানব-ধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম, universal ও particular—যত কিছু দ্বন্দ্ব, সবগুলিকে সমন্বয় করিবার যাদুশক্তি ইহাতে রহিয়াছে। ইহাকেই সৃষ্টিকর্ম্ম বলে—এই সৃষ্টিশক্তিই উৎকৃষ্ট প্রতিভার নিদর্শন, এবং বর্ত্তমান ভারতে সে প্রতিভার পরিচয় কেবলমাত্র বাঙালীই দিয়াছে। কেবলমাত্র বিদ্যা বা মেধা, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির দ্বারা—এমন কি অত্যুচ্চ অধ্যাত্মশক্তির দ্বারাও—এইরূপ সৃষ্টিকর্ম্ম যে সম্ভব নয়, তাহা আজিকার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। ভাবের ক্ষেত্রে যদি পূর্ণদৃষ্টির অভাব ঘটে, তবে কর্ম্মের ক্ষেত্রেও সাফল্যলাভ ঘটে না; আজিকার আন্দোলন যে কারণে যতখানি সাফল্য লাভ করিয়া থাকুক—ইহার মধ্যে বিরোধ ও ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে। আজ যখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে জাতীয়তামন্ত্রের ঋষি বলিয়া সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠি, তখন মনের মধ্যে এমন সন্দেহও হয় না যে, আজিকার জাতীয়তার আদর্শ সম্পূর্ণ অন্য রূপ ধারণ করিয়াছে, ইহাতে জাতীয়তা অপেক্ষা রাষ্ট্রনীতি, স্বধর্ম্ম অপেক্ষা পরধর্ম্মের

প্রেরণা প্রবল হইয়াছে। আমাদের জাতি ও কালের বিশিষ্ট সাধনা, বা স্বধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া—মানুষ হিসাবে আত্মার ক্ষুধাকেও অস্বীকার করিয়া, কেবলমাত্র অন্নব্রহ্মের উপাসনামূলক একরূপ সাম্যবাদের উপরে নেশন-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিয়াছে। নেশন ও সাম্যবাদ এই দুইয়ের মূল নীতি যে এক নহে—হইতে পারে না, এক করিতে গেলে এক মহা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়—ধর্ম্মের নামে মহা অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহার প্রমাণ আজিকার ইউরোপীয় রাষ্ট্রবিভ্রাটে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের বুক চাপিয়া ও মুখ বন্ধ করিয়া এই রাষ্ট্রধর্ম্ম বজায় রাখিতে হয়। ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামেও এই নীতির সূচনা এখনই দেখা যাইতেছে। সমন্বয়-চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না বটে ; এক দিকে উৎকট আধ্যাত্মিকতা এবং অপর দিকে অতিশয় আধিভৌতিক বাস্তববাদ—এই দুই বিসম্বাদী আদর্শের মধ্যে আপোষ করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে বুদ্ধিহীনেরা যেমন ভক্তিগদগদ হইয়া উঠিয়াছে, দূরদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তেমনই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। বাঙালীর প্রতিভা যে জাতীয়তা-মন্ত্রের উদ্ভাবনা করিয়া নব্য বাংলা তথা নব্য ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আজিকার তথাকথিত জাতীয়তার জয়-রথ সে পথ হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিয়াছে—তাহার পতাকায় যে বাণী উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জাতীয়তাবাদের চিহ্নমাত্র নাই। অতএব 'বন্দে মাতরম' গানকে বর্জ্জন করার সঙ্গত হেতু ইহার আছে—ইহার জন্য এই অতিশয় বুদ্ধিমান কূটনীতিজ্ঞ নেতৃবৃন্দকে দুর্ব্বলতা বা কাপুরুষতার অপরাধে অপরাধী করা চলে না। 'বন্দে মাতরম্' গানের মর্ম্ম যে তাঁহারা বুঝেন না তাহা নহে, কিন্তু সে মন্ত্র তাঁহাদের পক্ষে এখন অচল। বাঙালীর প্রতিভায়—ভাবকল্পনার

দিব্য আবেশে একদিন যাহা ধরা দিয়াছিল, তাহার কার্য্যকাল ফুরাইয়াছে —যাহা এককালে কেবলমাত্র একটা আবেগসৃষ্টির উপায়রূপে বড় কাজ দিয়াছিল—মন্ত্রহিসাবে কখনও গ্রহণযোগ্য হয় নাই, আজ তাহাকে আবশ্যক-বোধে পরিত্যাগ করিতে বাধা কি? আজিকার সংগ্রামে বাঙালীর নেতৃত্ব নাই, এমন কি সহযোগিতাও নাই—কারণ, আজ যাঁহারা নেতা তাহাদের দৃষ্টিই অন্যরূপ। বাঙালী ব্যবসায়বুদ্ধিহীন—পণ্যশালার প্রাকৃত অভিজ্ঞতা তাহাদের নাই; তাই সত্য-লাভ ও সত্য-ক্ষতির খতিয়ানে যাহারা সব-কিছু যাচাই করিয়া লইতে অভ্যস্ত, তাহারা এই ভাবপ্রবণ বিষয়বুদ্ধিহীন জাতির জাতীয়তামন্ত্র নিশ্চিন্ত মনে বর্জ্জন করিয়াছে। তাহাদের দিক দিয়া ঠিকই করিয়াছে, কিন্তু বাঙালী তাহা মানিবে না, অথচ সেই নেতৃবৃন্দের আশ্রয় ত্যাগ করিবার মত শক্তি, বুদ্ধি, সাহস কোনটাই তাহার আজ নাই। এই অদ্ভুত-আচরণের কারণ আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—'বন্দে মাতরম্' গানের সুর তাহারা ভোলে নাই বটে, কিন্তু তাহার মর্ম্ম অনেক দিন ভুলিয়াছে; আমার মনে হয়, যেদিন হইতে এই আন্দোলন সুরু হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ভুলিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কোন রাষ্ট্রনীতির ভাবনা করেন নাই, তাহা সত্য। জাতির রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, এবং একের পর এক যত সমস্যা উপস্থিত হইবে সেগুলিকে কি উপায়ে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, সে চিন্তাও তিনি করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান ভাবনা ছিল—এই জাতিকে আত্মপ্রবুদ্ধ করিয়া তাহার পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব-সাধনার উপায় সন্ধান। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহার সহজ ও স্বাভাবিক উপায় দুইটি—আত্মপরিচয়ের জন্য

নয়, শক্তি-উপাসক হিন্দুর ইষ্টদেবতার নাম তাহাতে আরোপ করা, এবং অন্য কোনও ঐ নামের দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা ভক্তসাধকের পক্ষে যে কতখানি ক্লেশকর—তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসে সে যে কত বড় আঘাত, তাহা আমাদের মত হিন্দু বুঝিতে না পারিলেও, যাহারা 'ধার্ম্মিক' হিন্দু তাহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। তথাপি 'বন্দে মাতরম্' গানের ভাষা হিন্দু, তাহার ভাব ও আদর্শ হিন্দু—কিন্তু কোন্ অর্থে? তাহা বুঝিতে পারিলে বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতিপ্রেমমূলক নবধর্ম্ম যে সাম্প্রদায়িক নহে, পরন্তু খাঁটি ভারতীয় অর্থে হিন্দু, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই হিন্দুত্ব যদি দোষের হয়, তবে ভারতবাসীর ভারতীয় হওয়াও দোষের; অথচ ইহার চেয়ে সত্য ও স্বাভাবিক জাতীয়তার মন্ত্র তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না; ইহার বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই অসত্য ও অস্বাভাবিক। নব জাতীয়তার ধর্ম্ম-প্রণয়নকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার এই ধর্ম্ম অতিশয় বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, অথচ ইহা মানব-ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করে নাই। সকল দেশের সকল জাতিই এমনই করিয়া আত্মপ্রবুদ্ধ হয়। সকল ভারতবাসীকে সমাজ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে এই জাতিপ্রেমের মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, না করিলে রাষ্ট্র-শাসনের জন্য দেহ-প্রাণ-আত্মাবর্জ্জিত একটা নিয়মযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে—রক্তমাংসের আকৃতিময়, সজীব ও সুস্থ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইবে না; এবং যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন এ জাতির দুর্গতি ঘুচিবে না।

এই জাতিপ্রেমকে, বঙ্কিমচন্দ্র শুধুই আবেগ নয়, একটা সুদৃঢ় ও সর্ব্বতোভদ্র চিন্তাভিত্তির উপরে স্থাপনা করিয়াছিলেন—তিনি ইহাকে

মানুষের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুর পুরাণ, ইতিহাস, শাস্ত্র, দর্শন নূতন করিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং য়ুরোপীয় চিন্তার যুক্তি-পাথরে ঘষিয়া তাহার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই ভাব-চিন্তার উপাদানে তিনি মনুষ্যত্বের যে আদর্শ গড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে দেশ-প্রেমকে একটা বড় স্থান দিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নাই। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দেশ-প্রেম পলিটিক্স-প্রসূত নয়—পলিটিক্সেরও আগে যাহার প্রয়োজন, যাহা পলিটিক্সের চেয়ে বড়, তিনি তাহারই ধ্যান করিয়াছিলেন। মানুষের মানুষ হওয়াটাই আগে, তারপর সকল দাবি-দাওয়ার কথা; অতএব সেই মূল প্রয়োজন-সাধনের জন্যই তিনি সারাজীবন চিন্তিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতিবিদ্ না হইলেও য়ুরোপের ইতিহাস তিনি পড়িয়াছিলেন—তিনি ইংরেজ জাতির শাসনতন্ত্রের ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসে তাহার স্বাধীনতালাভের সুদীর্ঘ প্রয়াস-কাহিনী নিশ্চয় অবগত ছিলেন। তাহা হইতে তাঁহার মত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, পৌরুষ ও চরিত্রশক্তি ব্যতীত কোনও জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না; সেই পৌরুষ ও চরিত্রশক্তি ব্যক্তিগত না হইয়া জাতিগত হওয়া চাই এবং তাহার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন—দেশ ও জাতির প্রতি সুগভীর মমতা। পারলৌকিকতা নয়, দেব-দেবীর অর্চ্চনা বা আচারগত নিয়মনিষ্ঠাই নয়—দেহ-মন ও প্রাণের স্বাস্থ্য, এবং প্রেম বা ত্যাগই সেই ধর্ম্মের প্রধান সাধন। পারমার্থিক কল্যাণ অপেক্ষা জগৎ-সংসারের কল্যাণ, মানুষের কল্যাণ—সে ধর্ম্মের একমাত্র অভিপ্রায়, তাহাতেই নরজন্মের সার্থকতা। জাতি-প্রেমকেই সেই ধর্ম্ম-সাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায় বলিয়া তিনি যে

স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার দিব্যদৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ যুগের মানুষের দুই প্রবৃত্তি তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রথম, প্রাচীন ধর্ম্মে বিশ্বাসের একান্ত অভাব; যাহারা শিক্ষিত তাহারা অতিশয় স্বার্থপরায়ণ ও নাস্তিক; যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের ধর্ম্মানুরাগ কুসংস্কার-প্রসূত, ধর্ম্মের সে জীবন্ত অনুভূতি কাহারও মধ্যে নাই দ্বিতীয়ত, সমাজের একটি অংশ ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে ধর্ম্মানুরাগ স্বার্থপ্রণোদিত, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে তাহারা স্বার্থরক্ষার জন্যই ধর্ম্মানুরাগী হয়। একালে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করিয়া থাকে, অপ্রত্যক্ষ ও অনিশ্চিত পরলোকের ভাবনায় মানুষ ইহলোকের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন—ধর্ম্মকেই উদ্ধার করিতে হইবে, এবং ইহজীবনের মধ্যেই তাহাকেই সত্য করিয়া তুলিতে হইবে—বুকের রক্তের সহিত তাহার যোগ স্থাপন করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলে সেই পুরাতন মন্ত্রকে নূতন করিয়া লইতে হইবে; নহিলে এযুগের মানুষ আকৃষ্ট বা আশ্বস্ত হইবে না। প্রেম ও ত্যাগের একটি প্রবল সহজ প্রেরণা জাগাইবার পক্ষে, প্রবৃত্তিকেই নিবৃত্তির পথে চালনা করিবার পক্ষে, যে আদর্শ এযুগে বিশেষ কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা—মানবমনের সেই আধুনিকতার আভাস তিনি য়ুরোপ হইতেই পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জাতি-প্রেম রাজনৈতিক ন্যাশন্যালিজ্‌ম নয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সংঘবদ্ধভাবে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে নূতন একটি রিপুকে জাগাইয়া তুলিতে হয়—বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম সেইরূপ রিপুঘটিত ব্যাপার নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অতি উচ্চ আদর্শবাদী হইলেও, তাঁহার সেই আদর্শের ভিত্তি ছিল বাস্তব। দেশ ও জাতিকে

ভালবাসিতে হইলে, সে ভালবাসায় সত্যকার আবেগ চাই, প্রেম ও ভক্তির তীব্র অনুভূতি চাই ; অতএব সে ভালবাসার একটা বাস্তব আধার বা বিগ্রহ চাই—সে প্রেমেরও পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র চাই ; কারণ, যে সকল উপাদানে মানুষ গঠিত, তাহার মধ্যে মৃত্তিকার অংশ অল্প নহে ; এই মাটিকে তুচ্ছ না করিয়া, তাহাকেই কর্ষণ করিয়া সোনার ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে। ইহাকেই বলে সৃষ্টি-প্রতিভা—স্রষ্টার প্রধান গুণ উপাদান সম্বন্ধে অভ্রান্ত অভিজ্ঞতা। বাস্তবের সহিত আদর্শের এই সমন্বয়ের নামই সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ যত উচ্চ হউক, তিনি জাতি-প্রেমের যে নব ধর্ম্ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে বাস্তব তাহার নিজস্ব স্থান সগৌরবে অধিকার করিয়া আছে। জাতিহিসাবে পৃথক গৌরব-বোধ—স্বকীয় সংস্কৃতির আভিজাত্য সম্বন্ধে সদাজাগ্রত অভিমান—ইহাই ছিল তাঁহার সেই নবধর্ম্মের ভিত্তিস্থিত খিলান ; কিন্তু সেই ভিত্তির উপরে তিনি যে চূড়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা জাতি ও দেশের অনেক ঊর্দ্ধে মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকেই তুলিয়া ধরিয়াছে—সর্ব্বমানবের যে মনুষ্যত্ব, তাহাকেই প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে।

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেমমূলক ধর্ম্মের মূল বা অঙ্কুরকে দেখিবার কালে তাহার ঊর্দ্ধতম শাখার পুষ্প-শোভা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। 'অনুশীলন', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে, এবং অন্যান্য নানা প্রবন্ধে ও প্রসঙ্গে, তিনি তাঁহার সেই মনোগত আদর্শের অতি সুস্পষ্ট সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে তিনি বাস্তব হইতে সেই আদর্শে আরোহণ করিবার সঙ্কটময় সোপানগুলিকে নানারূপে দেখাইয়াছেন। এই উপন্যাসগুলিতে জাতি-প্রেমের যে কাঁচা-আবেগ বা বাস্তবপ্রেরণা অনেক স্থলে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত কাব্যের প্রয়োজনে।

'মৃণালিনী'তে যাহার আরম্ভ, 'আনন্দমঠে' তাহার পূর্ণ-উৎসার এবং 'সীতারামে' তাহার শেষ কলধ্বনি রহিয়াছে। এই সকল উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতি-প্রেমের কল্পনা করিয়াছেন তাহার মূলে একটা সেন্টিমেণ্ট আছে—সে সেন্টিমেণ্ট হিন্দুর হিন্দুত্ব-গৌরব। আমি পূর্ব্বে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি যে শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছি—দেশপ্রেমিক ভারতবাসী মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেমের মূল প্রেরণা তাহাই বটে; কিন্তু এই সকল উপন্যাসে দেশপ্রেমের যে সেন্টিমেণ্ট উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সেইরূপ সূক্ষ্ম নহে; কেন এমন হইয়াছে তাহাও বলিয়াছি। নাটকে উপন্যাসে, passion ও emotion-কেই আর্টের উপাদানরূপে ব্যবহার করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে চরিত্রগুলি চিত্রিত করিয়াছেন, সেগুলির পক্ষে যে বাস্তব আবেগ স্বাভাবিক, তাহারই রং অতিশয় গাঢ় করিয়া তাহাতে ঢালিয়াছেন। কিন্তু এজন্য ইহাদের কাব্য-রস যতই উজ্জ্বল হউক, সেগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই—বাঙালী জাতির একটা বৃহৎ অংশের পক্ষে সেই রস-উপভোগে যে বাধা ঘটিয়াছে, তাহার মত দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। এ সমস্যার সমাধান সহজ নহে, হিন্দু-বাঙালীর পক্ষে সে বিষয়ে কিছু বলা সঙ্গত বা শোভন নহে। তথাপি, আমার মনে হয়, এ সমস্যার সমাধান শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর করিবে সুগভীর জাতি-প্রেম বা একজাতিত্ব-বোধের উপরে। এ জাতির জীবনে এ পর্য্যন্ত যে সমস্যার সমাধান হয় নাই, সেই সমস্যার সমাধান যদি কখনও হয়, তবে এই যে বাধার কথা বলিয়াছি, ইহা আর তেমন গুরুতর বলিয়া মনে হইবে না। তখন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে ধরনের আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে, সেই আবেগের উপকরণকে বড় না করিয়া, তাহার

হেতু বা মূল প্রেরণার উপরে লক্ষ্য রাখিলে, রসাস্বাদনের পক্ষে বাধা কিছু কম হইতে পারে। খাঁটি সাহিত্যরস-বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দোষগুণ অবশ্য অন্য দিক দিয়া নিরূপণ করিতে হইবে ; কোনও জাতির সাহিত্যে, উপন্যাসে বা নাটকে, সেই জাতির জাতিগত সংস্কার জাতীয়-গর্ব্ববোধ, তাহার স্বধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ নানা আকারে নানা ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে—তাই বলিয়াই সে সাহিত্য উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট নয়, কবিত্ব-কল্পনা যদি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া একটা কিছু সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়—তবে কাব্যবিচারে তাহাই গণনীয়, অন্য সকল প্রশ্নই অবান্তর। খ্রীষ্টান বা মুসলমান কোনও বড় কবি যদি তাঁহার কাব্যে কোনও মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় দেন, তবে তৎসত্ত্বেও সেই কাব্য কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু আমি এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেম বা জাতীয়তার আদর্শের কথা বলিতেছি—সেই আদর্শ জাতির জীবনে কতটা শক্তি সঞ্চার করিতে পারে তাহার আলোচনা করিতেছি। তাই, এ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেও সেই দিক দিয়া দেখিবার প্রয়োজন স্বীকার করি নাই। এ বিষয়ে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, সেই উপন্যাসগুলি হইতে যদি ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে ভারতীয় জাতির ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা একান্তভাবে হিন্দু, এবং সেই কারণে তাঁহার দৃষ্টি স্বচ্ছ বা অভ্রান্ত ছিল না, তাহা হইলে তাঁহার সেই ভ্রান্তি বা দৃষ্টিহীনতার বস্তুগত প্রমাণ এখনও সুলভ হয় নাই—ভারতীয় বলিয়াই যে-জাতীয়তার অভিমান, তাহা যে হিন্দুরই একচেটিয়া নহে, যেদিন ইহার নিঃসংশয় প্রমাণ আমাদের জাতির জীবনের সকল ক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ আর মার্জ্জনার যোগ্য থাকিবে না।

কিন্তু সেই জাতীয়তাবোধ বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুযায়ী হওয়া চাই —নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়ী করা যাইবে না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতি-প্রেমের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, তাহা রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের জন্য। একরূপ যুক্তিমূলক একতা-বোধ নহে, বরং এই রাজনৈতিক মনোভাবই তাঁহার সেই জাতীয়তা-ধর্ম্মের ঘোরতর শত্রু। আজিকার রাজনৈতিক আন্দোলন যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্র-বাদ আছে। একটা বৃহৎ সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধনের প্রয়োজন, সেই ধনসাম্যমূলক স্বার্থের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন তাহার অভিপ্রেত নয়, তাহাতে মানুষের মন ও দেহ ছাড়া আর কিছুরই মর্য্যাদা নাই—হৃদয়বৃত্তির স্থান তাহাতে নাই, আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকে প্রশ্রয় দেওয়া তাহার নীতিবিরুদ্ধ। অতএব ইহা আর জাতীয়তা-বোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়; মানুষের মনুষ্যত্বের সে সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ, যে পূর্ণ আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় ধরা দিয়াছিল, তাহা আজিকার দিনে অতিশয় অবাস্তব এবং নির্ব্বুদ্ধিপ্রসূত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে—মানুষের আত্মার উপরে তাহার মন-বুদ্ধি জয়ী হইয়াছে, মানবজাতির কল্যাণ সম্বন্ধে ধারণাই অন্যরূপ হইয়াছে। অতএব আজিকার এই আদর্শে কেবল সঙ্ঘ-বন্ধন স্বীকার করিলেই সেই জাতীয়তা-বোধ বা জাতি-প্রেমের পরিচয় দেওয়া হইবে না। ভারতীয় সাধনা ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া—তাহার বিশিষ্ট প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া—অন্য-প্রকার ধাম্মিকতার সংস্কারকে যতদূর সম্ভব শাসনে রাখিয়া, সকল ভারত-বাসী যদি আপনাকে ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব বোধ করে, তবেই বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেম আমাদের জীবনে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিবে। তখন 'বন্দে মাতরম্'-গানে হিন্দু তাহার অন্তরের অন্তরে হিন্দুয়ানির গর্ব্বই

অনুভব করিবে না, এবং যাহারা অহিন্দু তাহারাও তাহাতে ভারতীয় জাতীয়তা-ধর্ম্মের প্রেরণাই অনুভব করিবে—তাহাদের ধর্ম্মসংস্কার-বিরোধী কোনও ভাবের আঘাতে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে না। কিন্তু যুগের হাওয়া সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, তাই সে ভরসা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রকে জাতীয়তা-মন্ত্রের ঋষি বলিয়া আমরা এখনও যে কলরব করি, এবং 'বন্দেমাতরম্' গানের অমর্য্যাদায় আমরা যে ক্ষোভ প্রকাশ করি, তাহা একালের আমাদের পক্ষে কতখানি সঙ্গত ও শোভন তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে, সেই জন্য আমি বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক স্মৃতিপূজা-উপলক্ষ্যে সেই বিষয়েই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

আষাঢ়, ১৩৪৬

সত্যেন্দ্রনাথ-স্মরণে

১

১৩২৯ সালের আষাঢ় মাসে কবি সত্যেন্দ্রনাথ অতিশয় অতর্কিতে আমাদের জগৎ হইতে অপসৃত হন। আজ ১৩৩৪ সাল, আবার সেই আষাঢ় মাস আসিয়াছে। যে নিদারুণ বিয়োগ-বেদনা সেদিন অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা এখনও কালের প্রভাবে মন্দীভূত হয় নাই, বরং যখনই তাঁহাকে স্মরণ করি, তখনই সেই স্মৃতি সদ্যশোকের মত বেদনাময় হইয়া উঠে। ইহার কারণ আছে। তাঁহার তিরোধানে যে স্থানটি শূন্য হইয়াছিল ঠিক সেই স্থানটি পূরণ করিবার মত আর একজনও বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত দেখা দিলেন না, অথচ সাহিত্য-সমাজের অবস্থা দিন দিন এমনই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে যে, একজন ইংরেজ কবি তাঁহার সমসাময়িক সমাজের নিদারুণ অধঃপতনে ব্যথিত হইয়া কবিবর মিল্‌টনকে স্মরণ করিয়া যে উক্তি করিয়াছিলেন, আজ, ঠিক সমভাবে না হইলেও, অনেকটা সেইভাবে, সত্যেন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়া, আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্য-সংসারের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া সেই কথাই একটু বদল করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

> Satyendra ! thou shouldst be living at this hour,
> Bengal hath need of thee.

সত্যেন্দ্রনাথের তিরোভাবে সাহিত্য-সমাজের পক্ষ হইতে এই যে শোক, ইহা সত্য এবং যতদিন অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইতেছে, ততদিন

যাঁহারা সাহিত্য-প্রেমিক, ও যাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথকে চিনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তরে সেই সত্যব্রত সাহিত্য-বীরের মূর্ত্তি দিন দিন প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

নতুবা কবির জন্য শোক অকারণ। কবিগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রতিদিনকার ঘটনার মত নয়, সে ঘটনা সাধারণ জন্ম-মরণ ব্যাপারের মত লাভ-ক্ষতি বা শোক-আহ্লাদের হিসাবে গণনীয় নয়। যিনি যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলেন তাঁহার তিরোধানে সে প্রয়োজন শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যাঁহার শক্তির যেটুকু বিকাশ যে যুগে প্রয়োজন, তাঁহাকে দিয়া যুগ-দেবতা সেইটুকু প্রয়োজন সাধন করাইয়া লন। তাহাতে, আমাদের মনোমত প্রয়োজনসিদ্ধির হিসাব করিয়া শোকার্ত্ত হওয়া উচিত নয়। এই যুগ-প্রয়োজনে অনেকেরই ডাক পড়ে, কিন্তু অল্প ব্যক্তিকেই কাজে লওয়া হয়। সত্যেন্দ্রনাথ সেই অল্প সংখ্যার একজন, এবং তাঁহার কার্য্য তিনি সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি বঙ্গবাণীর যে অঙ্গটির প্রসাধনের ভার লইয়াছিলেন তাহা অতিশয় মূল্যবান, এবং সেই প্রয়োজনের ভারটি যে শক্তি ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত তিনি বহন করিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাঁহার স্থানটি অক্ষয় হইয়া রহিল। রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যে কয়জন লেখক বাণীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

২

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা-অনুযায়ী চরিত্রশক্তি ছিল, অথবা সেই চরিত্রই তাঁহার প্রতিভার মূলশক্তি ছিল। এই শক্তির বলেই তিনি তাঁহার জ্ঞান-পিপাসাকে জাগ্রত রাখিয়াছিলেন, এবং যাহা—অধ্যয়ন, প্রত্যক্ষ-দর্শন, বিচার ও অনুভূতির দ্বারা—তিনি নিরূপণ করিয়া লইতেন তাহা হইতে মনে প্রাণে কখনও বিচ্যুত হইতেন না। দেশের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা ছিল, এবং বঙ্গভাষাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র প্রেয়সী। তাঁহার সমগ্র কাব্যগুলির আলোচনা করিলে তাঁহার কাব্য-প্রেরণার এই দুই মূল সূত্র চোখে পড়ে। দেশকে ভালবাসিতেন বলিয়া তাহার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, দেশকে জানিবার যত কিছু উপায় আছে—দেশের প্রকৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সহকারে আজীবন সন্ধান করিয়াছিলেন। সে ভালবাসায় অন্ধ হৃদয়াবেগ ছিল না, তিনি তাঁহার দেশকে পারিপার্শ্বিক বর্ত্তমান জগতের মাঝখানে রাখিয়া, তাহার সত্যকার গৌরব, তাহার অতীত কীর্ত্তি ও বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি-অবনতির যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া, তাহাকে অন্য সকলের সহিত সমান, এমন কি বড় করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিলেন, যথা—

শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের সাতকোটি।

দেশের অতীতের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা শাস্ত্রসংস্কার বা হিন্দুয়ানির অন্ধতা নয়—চিন্তাশীল ও চক্ষুষ্মান ভাবুকের আত্মসম্মান-জনিত অনুরাগ। দেশের সাহিত্য-ইতিহাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের

খুঁটিনাটি ধরিয়া এই দেশানুরাগ কেমন দৃপ্ত সহজ ও সপ্রতিভ ছিল তাহা তাঁহার অসংখ্য কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানের যাহা-কিছু অধর্ম্ম ও অসত্য, যাহা কিছু ভীরুতা ও জড়তা, তাহাকেই ধিক্কার ও বিদ্রূপ করিতে গিয়া, তাঁহার বাণী বেদনার জ্বালায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত; আবার যাহা কিছু মহান ও সুন্দর বলিয়া তাঁহার প্রাণ স্পর্শ করিত, তাহার বন্দনাগানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। এই রাগ-দ্বেষের মধ্যে তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে কাব্য-কল্পনা অপেক্ষা, তাঁহার প্রাণের সত্যকার আবেগ ও আকৃতি, তাঁহার ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা ও বুদ্ধি-বিচার খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাঁহার মধ্যে, কবি বা আর্টিস্ট, এবং মানুষ—এই দুইয়ের লুকাচুরি প্রায় কোথাও নাই; কবি সত্যেন্দ্র ও মানুষ সত্যেন্দ্র এক—তাঁহাকে বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

সত্যেন্দ্র-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই—তাঁহার এই আত্মপ্রত্যয় ও দুর্দ্দম সাহসই—বর্ত্তমান বাংলা কাব্যে স্বাস্থ্য সঞ্চার করিয়াছে, বাঙালী-জীবনের বাস্তব আদর্শের দিকটি পরিপুষ্ট করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—মানুষের ব্যক্তিগত সত্য-ধারণার দার্শনিক মূল্য যাচাই করিতে যাওয়া বৃথা, কারণ কোন জাগতিক সত্যই নিরপেক্ষ সত্য নয়; সত্য মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই অবস্থান করে, তাহার সেই মূল্য সেই মানুষের আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রাণমনের ঐকান্তিকতা দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়। শাস্ত্রীয় বা দার্শনিক বিচারে সত্যের যে মূল্য তাহা জগতের পক্ষে অর্থহীন; মানুষের প্রাণে তাহার যেটুকু স্পর্শ ঘটে—তাহা যেমনই হউক—তাহাকে যখন মানুষ সারা প্রাণ দিয়া মানিয়া লয়, তখন সে অজেয় শক্তির অধিকারী হইয়া তাহাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে; এবং সেই

প্রয়াসের ফলে রাষ্ট্রে সমাজে ও সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হয়। অতএব সত্যের তত্ত্ব অপেক্ষা সত্যের এই ব্যবহারিক শক্তির মূল্য অনেক বেশি। সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যসেবায় এমনই একটি নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ছিল; সেই সত্যের নিকট তিনি হৃদয়ের মমতা, আত্মপ্রসাদ, আপনার সুখ-সুবিধা সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত —সেই আদর্শকে তিনি তাঁহার কবিহৃদয়ের অনুভূতির দ্বারা ভাষা ও ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; অতি উচ্চ সূক্ষ্ম কল্পনা বা অবাস্তব সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি এই বাস্তব হইতে কখনও দূরে যান নাই; তিনি তাঁহার সরস্বতীকে, মানবের বাস্তব ইতিহাসের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপেই বন্দনা করিয়াছেন।—

ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা,
হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা!
তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী! মহাকবিকূলের জননী!
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী, কর শঙ্খধ্বনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া, চক্রশূল ধর ধনুর্ব্বাণ,
হলবাহী কৃষকের ধরি' হল কভু গাহ গান—
পুলকি' পরাণ!—
সর্ব্ববিদ্যাবার্ত্তাবিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি' উঠে গীতে!

দুর্ল্লভের গূঢ়-তৃষা দীপ্ত রাখ—প্রাণের জল্পনা;
অয়ি দেবী মহতী কল্পনা!
নক্ষত্র-অক্ষরে লেখ 'ক্ষতত্রাণ' 'ক্ষতি অবসান';
বন্দী-মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক্ স্পন্দমান।

দুর্গতের দুঃখ হর'—জগতের জড়ত্বের নাশ
কর তুমি মহাবাণী! হোক্ বিশ্বে পূর্ণ পরকাশ
দীপ্ত তব হাস।
সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা—
হে অপরাজিতা!

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রেরণার আর একটি দৃঢ় সম্বল ছিল—মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অসীম অন্ধ অনুরাগ। তিনি যাহাকে খাঁটি বাংলা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার অধিকাংশ কবিতায় পাওয়া যাইবে—প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও প্রচলিত ভাষা হইতে আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের সহিত তিনি এই খাঁটি বাংলা 'বুলি'কে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাহার নিজস্ব ধাতুতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে যে শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়া অদ্ভুত অবলীলার সহিত তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেবল সংগ্রহ নয়, সেগুলিকে আবশ্যকমত সুমার্জ্জিত করিয়া নূতন করিয়া সাজাইয়া এবং অতি যথার্থ ও নিপুণভাবে প্রয়োগ করিয়া তিনি তাঁহার মাতৃভাষাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বাভরণা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; সেই ভাষার ধ্বনিকেও অফুরন্ত ছন্দ ঝঙ্কারে বাড়াইয়া তুলিয়া, তাহার জন্য নূতন ছন্দবিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সে কৃতিত্বের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, এই ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টিই তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক কীর্ত্তি। ইহারই বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের দীপ্ত প্রতিভার তলে পড়িয়াও সমসাময়িক বাংলা কাব্যে একটি বিশিষ্ট আসন আদায় করিয়া লইয়াছিলেন।

এই যে দেশ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং দেশ-ভাষার সেবায়

তিনি সর্ব্বসমর্পণ করিয়াছিলেন—সেই সজ্ঞান কর্ম্মযোগ ও অক্লা‍ন্ত পরিশ্রমের মধ্যে তাঁহার কবিচিত্ত যখন অবকাশ বা আরাম চাহিত, তখ‍ন কবির অন্তরের অন্তস্তলে যে রং রেখা ও সুরের খেলা জাগিত, তাহা‍র আবেগে তিনি অতি বিচিত্র চিত্র ও সুন্দর সুরলহরী রচনা করিতেন এইরূপ গান ও কবিতার মধ্যে কোনও সমস্যা বা চিন্তার সংস্পর্শ থাকি‍ত না ; এইগুলির মধ্যে, প্রকৃতির নিখুঁত চিত্রাঙ্কণ, প্রাণের নির্জ্জন নিশীথে‍র গীতোচ্ছ্বাস, অথবা কোনও একটি ভাবের খেয়াল লইয়া খেলা— পাঠকের মনোহরণ করে। তাঁহার এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে (নিছক ছন্দ-উল্লাসের কবিতাগুলি বাদ দিয়া) 'গর্‌বা গান' কবিতা‍টি একটি অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এইখানে চিত্রাঙ্কণের কয়েকটি উদাহরণ দিব।—

হাওয়ার তালে বৃষ্টি ধারা সাঁওতালি নাচ নাচ্‌তে নামে,
আবছায়াতে মূর্ত্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে।
দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে !

—

মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে
আল্‌তা-পাটি শিম।

—

জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচাপোকা-রং আলোক জ্বলে।

পেয়ারা-ফুলের রেশ্‌মী মিঠাই
ছড়ায়ে প'ড়েছে দখিনে বাঁয়ে।

—

ঘন ভুরু জিনি' যব শীষ যত
শিহরি' উঠেছে সুখে,

—

পথের শেষে থম্‌কে হঠাৎ চম্‌কে দেখি মাঝ-গগনের কাছে
রাত্রি-দিবার সন্ধি-রেখায় অবাক্‌-চোখে সে চাঁদ চেয়ে আছে—
চেয়ে আছে তুষার-রুচি শ্বেত-ময়ূরের পারা,
হিমে-হানা, কুন্ঠিত-কায়—শীর্ণ-শিথিল পাখনা, পেখম-হারা।

ঊষার আভাস জাগল কি রে? দিনমণির খুল্‌ল মণিকোঠা?
শুকতারাটির শিউলি-ফুলে লাগ্‌ল কি রে অরুণ-রঙের বোঁটা?
পূব-তোরণে চিড়্‌ খেল কি দিগ্‌বারণের নিবিড় দন্তাঘাতে?
ধুৎরো-ফুলের ডালি মাথায় তুষার-গিরি জাগ্‌ছে প্রতীক্ষাতে?
মুক্তাফলের লাবণ্য কি আমেজ দিল মুক্ত নীলাম্বরে?
দিগ্‌বধূরা চামর করে আকাশ-আলোর বিরাট হরিহরে?

৩

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব না, আধুনিক পাঠকের অনেকেই তাঁহার কবিতাগুলির সহিত সুপরিচিত। এইবার সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার চাক্ষুষ পরিচয়ের কথা বলিব।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে

তাহাই বলিতে হয়। তাঁহাকে কবে প্রথম দেখিয়াছিলাম মনে নাই। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতায় আসিলে তাঁহারা কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক একবার করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, হয়তো সেইখানেই তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম; অথবা কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের বাসায় তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া থাকিব। প্রথম দর্শনে তাঁহাকে একটি মিতভাষী, বিনয়ী অথচ আত্মস্থ যুবক বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং সেই ধারণা উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যেও পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। পরে যখন তদানীন্তন 'ভারতী'-সম্পাদক বন্ধুবর স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক বৈঠকে সত্যেন্দ্রনাথকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল তখনকার কথাই বলিব। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই বৈঠকের নিত্য-মনোনীত সভাপতি, যত কিছু মতামত তাঁহার সম্মতি না পাইলে কাহারও মনঃপূত হইত না। দেখিতাম, তিনি গায়ে-পড়া হইয়া কিছু বলিতেন না, প্রসঙ্গ উঠিলেও তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি স্পষ্ট কথাই বলিতেন। গল্পগুজবে কোন আকর্ষণ না থাকিলে, তিনি চেয়ারে আসন-পীড়ি হইয়া বসিয়া গুন গুন করিয়া তুড়ি দিয়া গান করিতেন। কাহারও রচনা শুনিয়া ভাল না লাগিলে, প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিতেন; চাপিয়া ধরিয়া মত জানিতে চাহিলে সংক্ষেপে 'রাবিশ' বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বিবেকবুদ্ধি এমনই জাগ্রত ছিল, তাঁহার বিদ্যাবত্তা এত গভীর ও স্পষ্টবাদিতা এমন নির্ম্মম ছিল যে, ও বিষয়ে সকলকেই বিনা শাসনে বাকসংযম করিতে হইত। কিন্তু আমোদ প্রমোদ বা রহস্যালাপে তাঁহার রসিকতায় কুণ্ঠা ছিল না, তিনি মুক্ত প্রাণে সকলের সহিত যোগ দিতেন। সমসাময়িক লেখকদের সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধায় কোনও রূপ দ্বিধা ছিল না।

তাঁহার আদর্শটি তাঁহার কাছে এমনই স্পষ্ট ও সবল ছিল যে, কিছু দিন ধরিয়া কাহারও রচনা লক্ষ্য করিলেই সেই লেখক সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় হইতে পারিতেন। এ বিষয়ে বহু-পরিচয় ও বন্ধুত্বের খাতিরেও তিনি তাঁহার মত এক চুল পরিবর্ত্তন করিতেন না—ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। তিনি যাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানিতেন সেই মিথ্যাকে, কি সাহিত্যে কি সমাজে, কি রাষ্ট্রনীতিতে যে আশ্রয় করিয়াছে, তাহার সহিত তিনি কোনও কারণে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সন্ধি করিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার অন্তর-বাহিরে ভেদ ছিল না। এইজন্য বন্ধুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া সাময়িক সাহিত্য-সমাজের এক অংশে, তিনি নিজের অজ্ঞাতে একটি সত্য ও উন্নত আদর্শের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

একদিন বৈঠক-শেষে আমাকে একান্তে ডাকিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, আমার কোনও একটি সদ্যপ্রকাশিত কবিতা তাঁহার ভাল লাগিয়াছে; ইহাও বলিলেন যে তাহা সাধারণ পাঠকের রুচি ও রস-বোধের অনুকূল নয়—কিন্তু কবিতাটি খুব ভাল হইয়াছে। তাঁহার সেই আচরণে তাঁহার সাহিত্য-প্রীতি ও কর্ত্তব্যবোধ এমনই ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, আমি মুহূর্ত্তের জন্য শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমার 'নাদিরশাহ' পড়িয়া তিনি খুশি হন নাই, এবং বহুজনের প্রশংসা সত্ত্বেও নিজমত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

ইহার পরেও, তাঁহাকে আমার কবিতা শুনাইতে ভরসা করি নাই। কিন্তু একবার দুইটি কবিতা প্রায় একই সময়ে লিখিয়া বন্ধুমহলে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলাম। কবিতা দুইটি—'বেদুইন' ও 'শেষশয্যায় নূর-জাহান'—তখনও প্রকাশিত হয় নাই। বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

মুখে কবিতা দুইটির অতিরিক্ত প্রশংসা শুনিয়া সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে পড়িয়া শুনাইতে অনুরোধ করিলেন, এবং আমিও যতই বিলম্ব করি তিনিও ততই দেখা হইলেই মনে করাইয়া দেন। একদিন সকালে কান্তিক প্রেসে 'কুহু ও কেকা'র নূতন সংস্করণের প্রুফ দেখিতে আসিয়া আমার সহিত দেখা হইয়া গেল। সেবার আমিই বলিলাম, 'এখন সময় হইবে? কবিতা দুইটি এখন আমার সঙ্গেই আছে।' তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, 'না, এখন আমার কবিতা ভাল লাগিবে না।' ইহার পর কিছুদিন দেখা হয় নাই। তারপর 'ভারতী'তে তাঁহার 'গর্‌বা গান' প্রকাশিত হইলে তাহা পড়িয়া আমি মুগ্ধ ও অধীর হইয়া পড়িলাম। অভ্যাসমত কবি করুণানিধানের বাড়িতে গিয়া তাঁহার সহিত উহা আবার পড়িয়া আনন্দ বৃদ্ধি করিলাম। কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি হইল না, স্থির করিলাম, তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে হইবে। পরদিন আমরা দুইজনে 'ভারতী'খানি লইয়া সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে অনাহূত অতিথির মত প্রবেশ করিলাম, এবং আমি কবিতা দুইটি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইবার অনুমতি চাহিলাম। পরে যথাসাধ্য আবৃত্তি করিয়া মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম—বিনীত বিষণ্ণ মূর্ত্তি; বলিলেন, 'মনে যাহা ছিল ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই, আমার নিজের পূর্ণ সন্তোষ হয় নাই।'—বলিয়াই বলিলেন, 'আপনার কবিতা কই?' এ আশঙ্কা আমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এবং পাছে ভদ্রতার হানি হয় এজন্য এবার কবিতা দুইটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম, নতুবা নানা কারণে আমি উহা পাঠ করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম। করুণাবাবু উৎসাহ সহকারে সায় দিলেন, তিনি প্রথমেই 'বেদুইন' পড়িতে বলিলেন, আমি 'নূরজাহান'টি প্রথমে পড়িলাম; পড়ার পরে রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করিয়া

রহিলাম। প্রশংসার এমন উচ্ছ্বাস, এমন আত্মবিস্মৃতি আমি স্বপ্নেও আশা করি নাই। তিনি মুখে মুখে সত্মপঠিত কাব্যের ভাব-কল্পনা ও সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্যের বিশ্লেষণ করিয়া গেলেন, পরিশেষে হঠাৎ আবেগের মুখে বলিয়া উঠিলেন, "আমার 'কবর-ই-নূরজাহান' ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে।" সত্যেন্দ্রনাথের কবিচরিত্রের একটি অপ্রত্যাশিত দিক সেই দিন হইতে আমার স্মৃতিপটে মুদ্রিত হইয়া আছে। সত্যেন্দ্র-চরিত্রের এক দিক ভাল করিয়াই দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন আর এক দিক দেখিয়া তেমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট কোন রচনা ভাল লাগা যে কত দুরূহ ছিল তাহা জানিতাম, আজ ইহাও জানিলাম—যদি ভাল লাগে, তবে তাহার প্রশংসায় তিনি কেমন পঞ্চমুখ হইতে পারেন। ইহার পর 'বেদুইন' পড়িলাম—তাঁহার ভাল লাগিল না, বলিলেন, " 'নূরজাহানে'র সঙ্গে তুলনাই হয় না, অনেক নিকৃষ্ট।"

ইহার পর হইতে সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন; মনে আছে, 'ভারতী'র বৈঠকে আমাকে দূরে এক পাশে বসিয়া থাকিতে দেখিলে, ক্ষীণদৃষ্টি কবি একাধিক দিন ব্যস্ত হইয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'আপনি নিকটে আসিয়া আমার সম্মুখে বসুন, আপনার মুখ যে দেখিতে পাইতেছি না!'

ইতিপূর্ব্বে আর একদিন সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতে তাঁহার বাড়ি গিয়াছিলাম, বাহিরের দোতলার ঘরে পুস্তকরাশির মধ্যে কবি তখন মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম করিতেছিলেন; আমি মূর্ত্তিমান উপদ্রবের মত তাঁহার নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করিলাম। সেদিন কথায় কথায় আর্য্য-গৌরব ও হিন্দু-ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের কথা উঠিয়া পড়িল। তিনি ভারত-সভ্যতার ইতিহাসে আর্য্য-জাতির সুকীর্ত্তি অপেক্ষা অপকীর্ত্তি

ঘোষণা করিলেন ; যাহারা বেদ উপনিষদ রচিয়াছিল, প্রাচীন শাস্ত্র, সংহিতা ও পুরাণ যাহারা প্রণয়ন করিয়াছিল, তাহাদের অন্যায়, অধর্ম্ম ও অহংকার—তাহাদের আত্মস্বার্থমূলক মনুষ্যত্ববিরোধী শাস্ত্রশাসনের উল্লেখ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বলিলেন, ভারত-সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝায়—ভারতীয় ধর্ম্ম ও চিন্তায় যে উদারতার গৌরব আমরা করিয়া থাকি, তাহা এই আদিম হিংস্র আর্য্যজাতির একক সাধনা নয় ; সেই বর্ব্বর বিজয়ী জাতির যত কিছু রূঢ়তা ও নির্ম্মমতকে ধ্যান-গভীর ও মমতা-মধুর করিয়া তুলিয়াছে বহু অনার্য্যজাতির ধর্ম্ম, আত্মদান ও তপস্যা। অতএব এই সভ্যতার আর যে নাম দেওয়া হয় হউক, তাহাকে আর্য্য-সভ্যতা বলিলে অন্যায় হইবে ; অথবা, ইহার মধ্যে যেটুকু কেবলমাত্র আর্য্যদিগের কীর্ত্তি তাহা লইয়া গৌরব করিবার কিছু নাই। টেবিলের উপর হইতে (বোধ হয় কিছু পূর্ব্বেই পড়িতেছিলেন) একখানি সযত্নে বাঁধানো পুরাণ-গ্রন্থ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিলেন, 'আর্য্য-সভ্যতার উৎকর্ষে মুগ্ধ হইতে চান ? এই কাহিনীটি পড়ুন'—বলিয়া তাহা হইতে যে স্থানটি পড়িয়া শুনাইলেন তাহা সংক্ষেপে এই। এক শূদ্র দারুণ গ্রীষ্মে পথিককে জলদান-মানসে পথিপার্শ্বে একটি কুটীর রচনা করিয়া জল লইয়া বসিয়া থাকিত। একদা দৈবক্রমে এক ব্রাহ্মণ পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপান করিতে চাহিলে, সে শাস্ত্র-শাসন বিস্মৃত হইয়া তাহাকেও জল দান করিল। কিন্তু শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে জলদান করায় তাহার কঠিন নরকদণ্ড হইল, এবং সেই ব্রাহ্মণেরও যথাপরাধ শাস্তি হইল। এই পুরাণ-কাহিনী শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। সত্যসন্ধ সুপণ্ডিত সত্যেন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না ; বুঝিলাম, বাস্তব-সত্যের সেবক মানবকল্যাণকামী

সতেন্দ্রনাথকে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য, হিন্দুশাস্ত্রের অসাধারণ দিব্যদৃষ্টি, এবং ভূ-দেবতা ব্রাহ্মণের মর্ত্ত্য-মহিমা বুঝাইতে যাওয়া নিষ্ফল।

সত্যেন্দ্রনাথের দেশভক্তির মধ্যে মিথ্যা স্বপ্ন বা সুলভ জাতীয়-আত্ম-প্রসাদের আস্ফালন ছিল না। একবার কোনও বৈঠকে খেলাফতের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর অতিরিক্ত সহানুভূতির কুফল আশঙ্কা করিয়া কথা উঠিল—এরূপ ভাবে মুসলমানদের ধর্ম্মান্ধতার প্রশ্রয় দিলে হিন্দুর সমূহ ক্ষতি হইবে, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুকে মুসলমান হইতে হইবে। সত্যেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কেবলমাত্র বলিলেন, 'সবাই মুসলমান হইয়া গেলে কি আমরা স্বাধীন হইতে পারিব? যদি তাহা হয়, তবে মুসলমান হইতে আপত্তি নাই।' তাঁহার দেশানুরাগ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এমনই প্রবল ও গভীর ছিল।

খাঁটি বাংলাভাষা ও সেই ভাষার ছন্দকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করাই যেন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ বিষয়ে তাঁহার এমন একাগ্র নিষ্ঠা ছিল যে, সুরসিক ও সুপণ্ডিত হইয়াও তিনি বাংলা পয়ারের নিন্দা করিতেন—নিজে পয়ার-জাতীয় ছন্দে বহু কবিতা রচনা করিলেও ইদানীং তিনি অক্ষর-মাত্রিক ছন্দ ব্যতীত আর কোনও ছন্দের কবিতা পছন্দ করিতেন না। একবার আমি তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, আপনার 'চার্বাক ও মঞ্জুভাষা' কবিতাটি কি জানি কেন আমার বড় ভাল লাগে। শুনিয়াই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, ও আবার একটা কবিতা! অক্ষর গণিয়া কখনও কবিতা হয়?' আমি নিজে বাংলা পয়ারের অতিমাত্রায় পক্ষপাতী; যদিও অপর ছন্দের মাধুর্য্য অস্বীকার করি না, তথাপি বাংলা পদ্যের উচ্চতম ধ্বনিগৌরব পয়ারেই সম্ভব—ইহাই আমার মত; কাজেই ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিবাদ করিলাম, রবীন্দ্রনাথের

সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিলাম—কিছুতেই ফল হইল না। তখন বুঝিলাম, ইহা একেবারেই ব্যক্তিগত, এখানে যুক্তি চলিবে না; সত্যেন্দ্রনাথের যদি পয়ারেই ভক্তি থাকিবে, তবে তাঁহার নিজস্ব কার্য্যটি এমন করিয়া সাধন করিবে কে? ভাষার অনর্গল প্রাচুর্য্য, শব্দচাতুরী, ও খাঁটি বাংলা শ্লেষ ও রসিকতার বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সহিত কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের একটি গভীর সগোত্রতা ছিল; এইজন্য, একবার যখন বাংলার কবিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কাব্য-পরিচয়-সম্বলিত চরিত-গ্রন্থমালা প্রকাশের প্রস্তাব হয়, তখন শুনিয়া বিস্মিত হই নাই যে, সত্যেন্দ্রনাথ ঈশ্বরগুপ্তের চরিত লিখিবার ভার লইয়াছেন।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। সত্যেন্দ্র-নাথের মৃত্যুর পর যখন নানা পত্রিকায় তাঁহার ছবি বাহির হইল, তখন একদিন আমার এক আত্মীয় যুবক আমার নিকট বড় দুঃখ করিয়াছিলেন। ইনি দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহের আশায় পুরাতন পুস্তকের দোকানে প্রায়ই ঘুরিতেন; অনেকেই বোধ হয় জানেন, সত্যেন্দ্রনাথেরও এই রোগ ছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের ছবি দেখিয়া আমার সেই আত্মীয়টি আমাকে বলিলেন, 'ইনিই সত্যেন্দ্রনাথ! বইয়ের দোকানে ইঁহাকে যে কতদিন দেখিয়াছি! একই পুস্তক সম্বন্ধে দুইজনে কত কথা বলিয়াছি—ইঁহার সহিত যে আমার নিত্য পরিচয় ছিল! আহা-হা, এত চিনিয়াও চিনিলাম না—ইনিই কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ!' এই ঘটনায় সত্যেন্দ্র-চরিত্রের আর এক দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের যে দিকটি তাঁহার অন্তরঙ্গ দিক, তাহা তিনি এমনই ভাবে আড়াল করিয়া রাখিতেন; আত্মপ্রচারে তাঁহার এমনই আশ্চর্য্য সংযম ছিল।

আজ আষাঢ়ের ছায়াচ্ছন্ন প্রভাতে অন্ধকার তরুরাজিবেষ্টিত

গৃহ-কোণে বসিয়া, ভাষা-মাতৃকার দুলাল, ছন্দসরস্বতীর বরপুত্র, সেই ক্ষাত্রিয়-স্বভাব বাণী-ব্রহ্মচারীকে স্মরণ করিয়া হৃদয় অধীর হইয়া উঠিতেছে। আজ সেই অদৃশ্য অমর আত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—কবি! তুমি তোমার সাহিত্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বাংলার বাণী-চত্বরে অমৃত-পদ লাভ করিয়াছ; কিন্তু যে দুর্লভ হৃদয় মন, যে অপূর্ব্ব চরিত্র তোমার জীবনকেই বহুমূল্য করিয়াছিল, তাহা যে আর কোথাও খুঁজিয়া পাই না; তোমার জীবলীলার অবসানে নব্যবঙ্গ-সরস্বতীর কেবল চরণ-নূপুরই খসিয়া যায় নাই, তাঁহার সীমন্তের স্যমন্তক মণিও আজ ধূলায় লুটাইতেছে।

আষাঢ়, ১৩৩৪

কাব্যে আধুনিকতা

১

প্রসঙ্গের প্রারম্ভেই একটা কথা মনে হইতেছে; কথাটা প্রাসঙ্গিক নয়, তবু এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না,—কেন যে, তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। সেদিন তর্ক উঠিয়াছিল—intellectual truth-এর সঙ্গে honesty-র কোনও সম্পর্ক আছে কি না। অর্থাৎ, যাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান-বিচারে মানিয়া লই, Idea-র ক্ষেত্রে যাহাকে স্বীকার করি, বাহিরের আচার-ব্যবহারে তাহা পালন করা অত্যাবশ্যক কি না। অবশ্য intellectual honesty বলিয়া একটা ধর্ম্ম আছে, যথা, তর্কে হারিয়া গেলে তাহা স্বীকার করা; নিজের মত যদি ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তবে তাহা সংশোধন করিয়া লইতে দ্বিধা না করা। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত; Intellect-এর ক্ষেত্রেই উহা সীমাবদ্ধ, উহার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কর্ম্মনীতির কোন সম্পর্ক নাই; কারণ, চিন্তার রাজ্যে, Idea-র রাজ্যে যাহা বিশ্বাস করি, বাস্তবে তাহার অবকাশ কোথায়? অতএব কথায় ও কাজে যে ঐক্য রক্ষা করার নাম—honesty, তাহা ধর্ম্মনীতির অন্তর্গত; তাহাতে Idea-র স্বাধীনতা নাই, আছে বিশ্বাসের শাসন। আধুনিক মানসিকতার যুগে এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হওয়া, জীবনের সর্ব্ব কর্ম্মে একটা কিছুকে ধরিয়া থাকা, কায়মনোবাক্যে কোনও একটা সত্যকে জয়যুক্ত করার প্রয়াস—নিতান্তই কুসংস্কার। এই মানসিক উৎকর্ষের অভাবেই মধ্যযুগের মানুষ একনিষ্ঠার পক্ষপাতী

ছিল। তাহারা সত্যকে শুধু মনে মনে স্বীকার করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারিত না, জীবনে তাহাকে উপলব্ধি করিতে চাহিত; জ্ঞানের আনন্দকেই তাহারা চরম বলিয়া বুঝিত না, বরং যেটুকু জীবনে পালন করিতে সক্ষম হইত সেইটুকুই তাহাদের নিকট সত্য ছিল। এজন্য, Idea-কে তাহারা আচার-অনুষ্ঠানে জীবন্ত করিতে চাহিত, তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্পর্শ করিতে চাহিত, তাহাকে সাধনার দ্বারা রক্তমাংসের রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে বা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে ব্যাকুল হইত। কিন্তু এখন সে সব কিছুই করিতে হয় না—সুর করিয়া দুই চারি কথা বলিবার ক্ষমতা জন্মিলেই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, ঘড়ি ধরিয়া ঘণ্টা-মাফিক চক্ষু বুজিলেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। প্রাচীন কালে এই মানসিকতার উৎকর্ষ হয় নাই বলিয়াই মানুষ অনর্থক অনেক কষ্ট পাইয়াছে। বুদ্ধের কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছিল! যে কথাটা একটুখানি ভাবনা-কল্পনা থাকিলেই চট্ করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়, তাহার জন্য তাঁহার নিজের কি কৃচ্ছ্র সাধন!—এবং পরের জন্য কত ধ্যান-ধারণা কত সাধন-পদ্ধতির ব্যবস্থা! বুদ্ধের সেই তপস্যালব্ধ নির্ব্বাণ, এখন কেমন কোমল ও মসৃণ হইয়া উঠিয়াছে! আধুনিক Intellectual-বুদ্ধপন্থীরা তাহা কত সহজে উপলব্ধি করিতেছেন! কেহ কেহ তাহার নূতন নাম দিয়াছেন, 'boudoir Nirvana'! কোনও হাঙ্গাম নাই, কোনরূপ কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন নাই—সুসজ্জিত কক্ষে আরাম-কেদারায় বসিয়া একটু ভাবের ঘোর প্র্যাক্টিস করিলেই হইল, দুই চারিটি মনোরম বাণী-বিন্যাস করিতে পারিলেই উপলব্ধির চরম হইল! এমনই করিয়া প্রাচীনেরা যে সম্পদ বহু কষ্টে অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আমরা বুদ্ধিবলে তাহাকে অতিশয় মোলায়েম করিয়া লইয়া ভোগ করিতেছি—মানসিক

উৎকর্ষের ইহাই মুখ্য ফল। সেকালে যাহাকে সাধনা বলিত তাহা asceticism বা monasticism-নামক মধ্যযুগীয় প্রেতলীলার আনুষঙ্গিক ব্যাধি। এই জন্যই বোধ হয়, আমাদের দেশে যে নূতন ভারতীয় কাল্‌চারের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে এই মধ্যযুগের পৌত্তলিক কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া একেবারে আদি অকৃত্রিম উপনিষদের বাণীকে আশ্রয় করা হইয়াছে। ভগবান জানেন, উপনিষদের ঋষিরা সেকালের জীবন-সমস্যা, তথা সাধনসমস্যার কতটুকু ধার ধারিতেন; সম্ভবত তাঁহারা অতিশয় স্বতন্ত্র স্বাধীন জীবন যাপন করিতেন। শূল্যপক্ক গোমাংস-ভোজন, নরনারীর স্বচ্ছন্দ-মিলন এবং অপরিমিত সোমরস-পান—এ সকলের মধ্যেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্ফুরিত হইত। সেই মুক্ত পুরুষদের বাণী আমরা যখন উচ্চারণ করি, তখন হিন্দুর সাধন-ভজনের নানা দুর্গন্ধ আমাদের বিভীষিকা উৎপাদন করে না। যাহা শাশ্বত সত্য, তাহার সঙ্গে জীবন-ব্যাপারের যে কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহার একটা বড় প্রমাণ এই যে—উপনিষদের যুগে সমাজ যেমন ছিল, এখন অবশ্য তাহা নাই, তথাপি শাশ্বত সত্যের এমনই মহিমা—তাহা এমনই শাশ্বতভাবে আধুনিক—যে, আজিকার সমাজে বরং উপনিষদের মন্ত্রই অধিকতর উপাদেয়, মধ্যযুগের যত-কিছু তন্ত্র তাহা নিতান্তই অচল—সেই অচলায়তনের ভিত্তিমূল উৎখাত করাই একমাত্র শ্রেয়ঃ পন্থা। এই আধুনিকতা, এই Intellectual-মুক্তিমন্ত্র বিশেষ করিয়া বাংলা দেশেরই গৌরব। কারণ, ভারতের নব যুগাবতার গান্ধী ভারতের সর্ব্বকালের সাধনার সারবস্তুকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন হইতে মধ্যযুগের বোট্‌কা গন্ধ ঘুচে নাই। তিনি কৌপীনবস্ত; তিনি নিরামিষভোজী; আবার তিনি গীতার গুরুমন্ত্র জীবনে উপলব্ধি করিবার

সাধনা করিয়াছেন। তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী নহেন; তিনি—কেবল উপনিষদ্ নয়—মহাভারতের বাণীকেও প্রার্থনাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এক কথায়, তিনি intellectual honesty লইয়াই তৃপ্ত নহেন; তিনি বিশ্বাসী সাধক। তাঁহার জীবনে মতের সঙ্গে পথের, সত্যের সঙ্গে আচারের—অর্থাৎ, ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের—সঙ্গতি রক্ষার সাধনা আছে; যে কেহ তাঁহার আত্মজীবন-চরিত পড়িয়াছেন, তিনিই এই সাধনার পরিচয় পাইবেন। আমাদের দেশে এরূপ বর্ব্বরতার স্থান নাই। আমাদের নবধর্ম্মের নাম 'কাল্‌চার'—অতি আধুনিক সমাজের আদর্শস্থানীয় যাঁহারা, তাঁহারাই ইহার চর্চ্চা ও প্রচার করিয়া থাকেন। ইঁহারা শাশ্বত-পন্থী—যে সত্যের কোনও দেশকাল-বন্ধন নাই, বাস্তবের সঙ্গে যাহার কোনও সম্পর্ক নাই, যাহা intellectual-মুক্তি, বা বিশ্বাস-বন্ধনচ্ছেদের অস্ত্র, যাহা ভাব-চিন্তা বা চিন্তা-ভাবের উদার অধিকারে সকলকেই মহিমান্বিত করে—ইঁহারা সেই সত্যের উপাসক। এই মানস-মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে, ত্যাগের কোনও মূল্যই থাকে না—জীবনের কোন কিছুতেই seriousness থাকে না। সত্য যাহা, তাহা জ্ঞান-বিচারের বিষয় মাত্র; কোন কিছুকে বিশ্বাস করাটাই মূঢ়তা। যাহা সত্য তাহাই যে মিথ্যা, এবং মিথ্যাও যে সত্য—ইহা প্রমাণ করিতে কতক্ষণ লাগে? তাহার কারণ, মানুষ যাহা বিশ্বাস করে অর্থাৎ প্রাণে উপলব্ধি করে, তাহা খণ্ড সত্য মাত্র; ইতিহাসের ধারায়, যুগবিশেষের প্রভাবে, যাহা প্রকাশ পায়—যাহাদের মন ছোট তাহারাই তাহাতে প্রতারিত হয়, বিশ্বাস নামক ভূত তাহাদিগকে পাইয়া বসে। যাহাদের মনের উৎকর্ষ ঘটিয়াছে তাহারা সেই শাশ্বতকে উপলব্ধি করিতে পারে—যাহা কোনও যুগের অধীন নয়; যাহা সত্যও বটে, মিথ্যাও বটে,

অথবা সত্যমিথ্যার অতীত; যাহার আশ্বাসে মানুষের কোনও দায়িত্ব-জ্ঞান আর থাকে না, জীবনটাকে কেবল বচনের বুকনি ও তুড়ি দিয়া ফুঁকিয়া দেওয়া যায়।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক কাব্য' এই নামে একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন—বাংলা সাহিত্যের হাটে 'বিশ্ব-পরিশীলন'-এর সোল এজেণ্ট যাঁহারা তাঁহাদেরই সখের পত্রিকায়। প্রবন্ধটির মধ্যে যে গুরুতর ও গভীর তত্ত্বকথা আছে তাহা শুধুই কাব্যবিচারে নয়, শাশ্বতবস্তুর সম্বন্ধেও খাটে। তাই এই প্রবন্ধে এক ধরনের কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ভুলিয়া, উহাতে 'আধুনিকতা' সম্বন্ধে যে দার্শনিক ভাবুকতা আছে, তাহারই চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম—কাব্য ছাড়াইয়া, যাহা সর্ব্বাশ্রয়ী শাশ্বত, তাহারই ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলাম। কথাটা সহসা অযুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে, তাই আরও দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিব। ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা—আধুনিক যুগের শিক্ষিত বাঙালী সমাজ—যে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, তাহার গুরু রবীন্দ্রনাথ; এবং রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি ঋষি—ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ যাহা রচনা করেন তাহা নিছক 'নন্দন-তত্ত্বে'র এলাকাভুক্ত নয়, তাঁহার কাব্যমন্ত্র অতি গভীর সত্য-মন্ত্রও বটে; তাঁহার কাব্যদৃষ্টির অন্তরালে উপনিষদের ব্রহ্মদর্শন আছে, বুদ্ধের ব্রহ্মবিহারও আছে; এক কথায় তাঁহার কোনও উক্তি একটা খণ্ড-বিষয়ের গণ্ডিমধ্যে আবদ্ধ নয়; তিনি যখন যে বিষয়ে যাহা কিছু বলেন, তাহা ব্যাপকতর ও গভীরতর অর্থেই গ্রহণ করা উচিত; কারণ, এ সকল উক্তি অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বস্তুত, বাংলার

আধুনিকগণ যে কুলচুর-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহার মূলে একটা মহা কবিমনোভাব বিদ্যমান আছে, একটি ভাবময় তুরীয়-অনুভূতিই তাহার বিশেষ লক্ষণ। অতএব, কাব্য-বিষয়ক আলোচনায় এই মূল ভাব-তত্ত্বের কিছু অধিকার থাকিবেই, বরং তাহা না থাকিলে কাব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এজন্য, "আধুনিক কাব্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিকতা'র যে শাশ্বত-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন, উহাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাই আমি এই 'আধুনিকতা'র একটু ভাষ্য রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি—কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে 'আধুনিকতা'র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা Intellectual-শাশ্বতপন্থীদের কি পরিমাণ উপকারে লাগিবে, কাব্যবিচারের ব্যপদেশে রবীন্দ্রনাথ যে শাশ্বত আদর্শের উত্তর-মীমাংসা রচনা করিয়াছেন তাহা আধুনিকগণকে কতখানি আশ্বস্ত করিতে পারে, আমি তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি।

২

উক্ত প্রবন্ধে, আধুনিক কাব্য-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার যে অর্থ করিয়াছেন তাহা যেমন সূক্ষ্ম তেমনই গভীর। কথাটা মৌলিক নয়, কারণ আমাদের দেশে আধুনিকতা বলিয়া কোনও তত্ত্ব কেহ স্বীকার করেন নাই, রবীন্দ্রনাথও করেন নাই। আমরা সনাতনপন্থী, ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায় তাহা লইয়া আমরা কখনও চিন্তা করি নাই, আমাদের সংস্কারই অন্যরূপ। য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার ইতিহাসে 'আধুনিক' কথাটা একটা বড় কথা; মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিকতার

অভ্যুদয় সে দেশের ইতিহাসে একটা মহা যুগান্তর। এই আধুনিকতার প্রভাবে সমগ্র জগৎ ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে—আমরাও গত এক শত বৎসর ধরিয়া আধুনিকতার সাধনা করিতেছি। কিন্তু সে সাধনা আমাদের রক্তগত সংস্কারের এমনই বিরোধী যে, তাহা আজ পর্য্যন্ত মর্কট-বৃত্তির অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না; অথচ সে আধুনিকতা জীবনের দিক দিয়া এতই সত্য যে, তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই আধুনিকতাই এ যুগে আমাদের জাতির পক্ষে সেই পুরা-কথিত Sphinx-এর সমস্যা, তাহার সমাধান করিতে না পারিলে আমরা বাঁচিয়া থাকিব না। অতএব এই আধুনিকতাকে সনাতন সত্যের আদর্শে ব্যাখ্যা করিলে উচ্চ ভাবুকতার পরিচয় দেওয়া হয়, বাস্তবের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা"—তখন আমরা ইহাই লক্ষ্য করি যে, রবীন্দ্রনাথ এখানেও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হন নাই; তাঁহার ভাবস্বর্গে আধুনিকতার উপদ্রব নাই। তিনি 'পাঁজি' অর্থাৎ ইতিহাস মানেন না; তাঁহার নিকট কালচক্র শাশ্বত ভাববিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এক স্থানেই ঘুরিতেছে। এই জন্যই বোধ হয়, তিনি হিন্দু-সাধনার ঐতিহাসিক বিকাশধারার প্রতি শ্রদ্ধাহীন; উপনিষদের ঋষিরাও তাঁহার সমকালবর্ত্তী; হিন্দুসমাজের পরবর্ত্তী ইতিহাসে যে মনীষা ও সাধনার সোপান-পরম্পরা বা তরঙ্গ-প্রবাহ রহিয়াছে তাহাকে তিনি গ্রাহ্যই করেন না। ইহা আমরা জানি, জানি বলিয়াই আধুনিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণায় বিস্মিত হই নাই। কোনও তত্ত্ব শাশ্বত বা সনাতন হইতে পারে, ইতিহাসের ধারার অন্তরালে কোনও একটা একই বুদ্ধির প্রেরণা হয়তো নিহিত আছে; কিন্তু সেই

অন্তর্গত প্রেরণা বা শাশ্বত ভাবসত্যকেই স্বীকার করিয়া তাহার ইতিহাস-গত যুগপ্রবৃত্তিকে অস্বীকার করিলে সৃষ্টিকেই অস্বীকার করা হয়। ব্রহ্মার মানস-নিহিত সৃষ্টি-কল্পনার বীজ, এবং তাহার এই বিচিত্র রূপ-পরিণাম —যাহা ঘটিয়া থাকে দেশে ও কালে—এই দুই তত্ত্বকে পৃথক বলিয়া স্বীকার না করিলে, বাস্তবই উঠিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক' কথাটি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আধুনিকের আধুনিকতাই লোপ পায়। জানি না, এই মনোভাব তাঁহারও আধুনিক মনোভাব কি না, এবং তাহা কোন্ অর্থে। এককালে তিনি দেশকালকে অস্বীকার করিতেন না, শাশ্বত বা বিশ্বমানব এমন করিয়া তাঁহার ভাব-কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে নাই, তাই ভাগবতী সৃষ্টির লীলারসে মজিয়া তিনি উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি করিয়াছেন। আজ তাঁহার নিকট কাল বড় নয়, ভাব বড়; অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ ভাবের হিসাবে একই; মানুষও এখন বিশ্বমানব, তাহার জীবনে নদীর ধারা-বৈচিত্র্য নাই—কালে তাহার গতি-বৈশিষ্ট্য নাই, দেশে তাহার খাত-চিহ্ন নাই; নদী নাই—আছে সাগর; মানুষ নাই—আছে বিশ্বমানব।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, কাল-নিরপেক্ষ শাশ্বত যাহা তাহাই প্রকৃত আধুনিকতা; যুগে যুগে যাহা আধুনিক বলিয়া সম্মান পায়, সেই সাধনার মূলে আছে শাশ্বত ভাব-দৃষ্টির প্রেরণা—'বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা'। তিনি বলেন—

> আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদ্গত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে,

আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র-দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।)

সমগ্র প্রবন্ধটির মধ্যে এই উক্তিটিই সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক ও গভীর—ইহার দ্বারাই 'কাব্য' ও 'আধুনিকতা'—দুইয়েরই চূড়ান্ত বিচার হইয়া গিয়াছে। 'শাশ্বতভাবে আধুনিক'—অর্থাৎ কিনা, সহজবুদ্ধিতে যাহার নাম 'সোনার পাথর বাটি'। বোধ হয়, এইজন্য এই প্রবন্ধেই উক্ত বাক্যের বিরুদ্ধবাদ আছে। কাব্যের ইতিহাস ও কাব্যরসের সার্ব্বভৌমিক ধারণা এক নহে, তাহা আমরা জানি। তথাপি কাব্যের ইতিহাস আছে—যুগান্তরে কাব্যপ্রবৃত্তির একটা স্পষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। সেই পরিবর্ত্তনের সকল লক্ষণকেই যদি একের পর এক—'এহ বাহ্য'—বলিয়া ক্রমাগত ভিতরেই প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে কাব্যজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় কোনও পার্থক্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথ এই 'শাশ্বত আধুনিকে'র ধারণা কাব্যে প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন—'আধুনিক কাব্য নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র-দৃষ্টিতে দেখবে'। এটা ইতিহাসের কথা নয়; কাব্যসৃষ্টির actual fact-এর কথা নয়—একটা তত্ত্বকথা মাত্র। কারণ, 'নিরাসক্ত চিত্ত' 'সমগ্র-দৃষ্টি' প্রভৃতির দ্বারা যে absolute objectivity-র ইঙ্গিত তিনি এখানে করিয়াছেন—প্রথমত, তাহা এ পর্য্যন্ত খুব অল্প কাব্যেই ঘটিয়াছে; দ্বিতীয়ত, কবি-মানসের objectivity বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি নয়; বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতা বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম হইতে পারে, কবির নহে। তারপর, কবিকে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি ও সমগ্র-দৃষ্টি এই দুইয়েরই অধিকারী হইতে হইবে, অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক ভাবে কবি হইতে হইবে—তাহারই নাম শাশ্বতভাবে আধুনিক হওয়া; কারণ, এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিটাই আধুনিক, অথচ, কবি-মনোভাব

শাশ্বতকালের! কিন্তু আধুনিকতা হিসাবে ইহা নিতান্তই এ যুগের; এ পর্য্যন্ত আর কোনও যুগের কাব্যে এই অপূর্ব্ব আধুনিকতার লক্ষণ দেখা যায় নাই; সেই জন্মই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন চীনা কবিতার শরণাপন্ন হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, ঐ চীনা কবিতার নমুনা পড়িয়া আমাদের গায়ে জ্বর আসে—এই গৃহী-অবস্থাতেই লোটা-কম্বলের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করি; কারণ, তখন দুইটি মাত্র বালাই থাকে—জল-পিপাসা আর কম্প। বাপ!—কি ভাবুকতা! কি আধ্যাত্মিক সমগ্র-দৃষ্টি! কি নিরঞ্জনা কবিকল্পনা! নিরাসক্ত চিত্তই বটে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, এই যে আধুনিকতা, য়ুরোপ ইহাকে বিজ্ঞানের মধ্যে লাভ করিয়াছে—কাব্যে এখনও পায় নাই; কিন্তু প্রাচ্য চীন তাহাকে কাব্যেই লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ করিয়াছে কি? না, বোধ হয়। হায় ভারতবর্ষ!

রবীন্দ্রনাথ কাব্যের যে ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায়, এ পর্য্যন্ত কাব্যে সমগ্র-দৃষ্টি অথবা বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি, কোথায়ও দেখা দেয় নাই। ক্ল্যাসিক্যাল যুগ হইতে রোমাণ্টিক যুগ, রোমাণ্টিক যুগ হইতে মধ্য-ভিক্টোরিয় যুগ—এই যে সব যুগান্তর, তাহাতে কবি-প্রকৃতি যে বাঁক বা মোড় ফিরিয়াছে—কই তাহার মধ্যে শাশ্বত-আধুনিকতার সে ছাপ তো নাই? এ সকল যুগের কোনটাতেই কবিগণ একেবারে নিরাসক্তচিত্তে, নির্ব্বিকারভাবে বিশ্বকে দেখেন নাই তো? তিনিই বলিয়াছেন, প্রাচীন কালের কবিগণ গোষ্ঠী, পরিবার, ও সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কাব্য রচনা করিতেন, তাঁহাদের ভাব ছিল সমষ্টিগত। রোমাণ্টিক যুগে ব্যক্তি-মনোভাবই প্রধান হইয়া দাঁড়াইল, কল্পনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা আত্ম-মোহ ফুটিয়া উঠিল। মধ্য-ভিক্টোরিয় যুগে 'বিশ্ব-বিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাই' কবিকল্পনার

বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু এই বিবিধ প্রবৃত্তির মধ্যেই কবিকল্পনা কোথাও নিরাসক্ত নহে; বরং সেই আসক্তির বিভিন্ন ভঙ্গিই এক এক যুগের আধুনিকতা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। তথাপি রবীন্দ্রনাথ বলেন, কাব্যের আধুনিকতা একটা শাশ্বত বস্তু; তিনি আধুনিক ও শাশ্বত, এই দুইকে এক বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, প্রকৃত আধুনিকতা কালগত নয়, ভাবগত—সে ভাব শাশ্বত; তাই আধুনিকতার মূলে আছে শাশ্বতের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা। ভাবের উপরে কালের যদি কোনও প্রভাব না থাকে, ভাবের সঙ্গে কালের যদি কোনও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ না থাকে, তবে বলিতে হয়—এই ভাবের সঙ্গে জাগতিক ব্যাপারের কোনও সম্পর্ক নাই, ভাব যদি কালসম্পর্ক-শূন্যই হয় তবে সৃষ্টিই মিথ্যা হয়; এবং সেই কারণে কাব্যেরও বিশিষ্ট প্রেরণার কোনও অর্থ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সোজা চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে।

'সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে'—এই মর্জ্জিটা কাহার? সময়ের প্রভাব-মুক্ত কোনও ভাবুক ব্যক্তিবিশেষের? না, উহা উপযুক্ত ব্যক্তির আধারে কাল-প্রভাবের অভিব্যক্তি? এরূপ দার্শনিক সমস্যার সমাধানে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা ইহাই জানি যে, কাব্যের মূল্য তাহার অন্তর্গত ভাবহিসাবেই বটে; তথাপি, যে-রূপে তাহা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে তাহাতে জগৎ ও জীবনের ছায়া আছে বলিয়াই সে-রূপের বিবর্ত্তনও আছে। যাহা শাশ্বত তাহার মূল্যবৃদ্ধি হয় কালের বিশেষণে—যুগবিশেষের

'আধুনিকতা'য় ; সেই 'আধুনিক' যখন আমাদের চেতনাকে আঘাত করে, তখন যদি তাহার শাশ্বত ভাব-রূপটিকেই চিনিয়া লইয়া আমরা আশ্বস্ত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা একটি আধ্যাত্মিক নিশ্চেষ্টতার সুখই উপভোগ করিতাম, কাব্যসৃষ্টিতেও কোনও অভিনব ভঙ্গির বিকাশ হইত না।

রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে আধুনিকতার যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারই ব্যাখ্যা অনুসারে যে বিরুদ্ধবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। তিনি বলিয়াছেন (আমরা যেমন বুঝিয়াছি) যে, কাব্যের বিশুদ্ধ আধুনিকতা নির্ভর করে একটি বিশেষ গুণের উপর, সে গুণটি এই—'ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে নিরাসক্তভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা'। প্রশ্ন উঠে, এইরূপ আধুনিকতা ইতিপূর্ব্বে কোনও কালের কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে? ইহার উত্তরে তাঁহার কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'এ আধুনিকতা কোনো বিশেষ কালের নয়, এটা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে'। মূল প্রশ্নের সোজা উত্তর পাওয়া গেল না, কেবল ইহাই জানা গেল যে, যে-কোন যুগেই এই আধুনিকতার অভ্যুদয় হইতে পারে ; কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে কি না—সে প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না পাওয়া গেলেও তাঁহার অন্যান্য উক্তি হইতে বুঝানো হয়, তাহা হয় নাই। কারণ, এই বিশুদ্ধ আধুনিকতার লক্ষণ যদি নিরাসক্ত চিত্ত, 'নির্ব্বিকারভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে জগৎকে দেখা' প্রভৃতি হয়, তাহা হইলে—কি প্রাচীন কি আধুনিক বা অতি-আধুনিক—কোনও কাব্যেই তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে এই সকল লক্ষণ নাই। ক্ল্যাসিক্যাল, রোমান্টিক, মধ্য-ভিক্টোরিয় প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের কাব্য সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, এই বিজ্ঞানসুলভ 'নিরাসক্ত চিত্ত'

বা 'সমগ্র দৃষ্টি' সেই সকল কাব্যে নাই। অতি আধুনিক কাব্য সম্বন্ধেও তিনি সে লক্ষণ স্বীকার করেন না। এই আধুনিক কাব্যের একটা লক্ষণ— ইহা নৈর্ব্যক্তিক, impersonal ; ইহাতে মোহ নাই—ইহাই তাঁহার মত; তথাপি এ কাব্যে সেই শাশ্বত বিশুদ্ধ আধুনিকতা নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিলেই আমাদের সংশয়ের কারণ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তিনি বলেন, "কাব্যে বিষয়ীর (কবির) আত্মতা ছিল উনিশ (?) শতাব্দীতে, বিশ (?) শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা"। আরও বলেন, এ কালে "আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে"। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে বিষয়ীর যে আত্মতা ছিল সেটা একটা মোহ, অতএব তাহা বিশুদ্ধ বা শাশ্বতভাবে আধুনিক ছিল না। আবার এ যুগের কাব্যে ব্যক্তিগত আসক্তভাব একেবারেই নাই ; বস্তুর প্রতি মোহ নাই, আছে তার সমগ্রতার আত্মঘোষণা। তবু এ কাব্য 'আধুনিক' নয় ; কেন ?—রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

> কিন্তু আধুনিকতার যদি কোন তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি, এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার।

এ সকল উক্তির পূর্ব্বাপর সঙ্গতি সম্বন্ধে কিছু বলিব না, কিন্তু অর্থ কতকটা এইরূপ দাঁড়ায় না কি? ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে মোহ ছিল, তবে সেটা চিত্তবিকার নয়, কারণ তাহাতে বিশ্বকে সুন্দর করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি আছে। আর আধুনিক কাব্য এই অর্থে মোহমুক্ত যে

তাহা নৈর্ব্যক্তিক, তাহাতে বিষয়ীর আত্মতা নাই, বিষয়ের আত্মতা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কাব্যও বিশুদ্ধ আধুনিকতা দাবি করিতে পারে না, কারণ মোহ না থাকিলেও ইহাতে চিত্তবিকার আছে। প্রভেদটা অনেকটা Tweedledum ও Tweedledee-র মত নয় কি? একটাতে ব্যক্তিগত ভাব আছে, আর একটা নৈর্ব্যক্তিক—তথাপি, এ-পিঠ আর ও-পিঠ; একটায় যেমন মোহ, অপরটায় তেমনই চিত্ত-বিকার। তাই যদি হয়, তবে এই আধুনিক কাব্য নৈর্ব্যক্তিক হয় কি করিয়া? এ দার্শনিক বিচার বড়ই সূক্ষ্ম।

আসল গোল বাধিয়াছে ওই সংজ্ঞাটি লইয়া। সংজ্ঞাটি চমক লাগাইবার মত বটে, কিন্তু আমরা আরও চমকিত হইতেছি এই ভাবিয়া যে, এই সংজ্ঞা অনুসারে একমাত্র চীনা কবিতাই টিকিয়া গেল; উনবিংশ শতাব্দীর তো কথাই নাই—রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতাও বিশুদ্ধ বা শাশ্বতভাবে আধুনিক হইতে পারিল না। একি সহজ আধুনিকতা! এইজন্যই অন্তত কাব্য সম্বন্ধে এ সংজ্ঞা অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে, গ্রাহ্য করিতে গেলে সকল কাব্যই আদর্শচ্যুত হইয়া পড়ে। যাহাকে কাব্যের objectivity বলে, আমি এখানে তাহার আলোচনা করিব না, যদিও তাহাকেই আমি কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা বলিয়া মনে করি; কারণ, এ যুগে কাব্যের যে রস উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে খাঁটি objectivity-র যেমন কোনও মূল্য আর নাই, তেমনই তাহাকে কেহ স্বীকারই করিবে না। রবীন্দ্রনাথ যে 'ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখা'র কথা বলিয়াছেন তাহা এই objectivity সম্পর্কে খাটে। কিন্তু তিনি যে বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিরাসক্তচিত্তের কথা ঐ সঙ্গে বলিয়াছেন—শাশ্বত ও আধুনিক, এই দুইয়ের যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব নির্দ্দেশ

করিয়াছেন—তাহাতে কাব্য একেবারে metaphysics হইয়া উঠিয়াছে। এইবার আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি পর পর উদ্ধৃত করিব; তদ্দ্বারা এই প্রবন্ধে কাব্য সম্বন্ধে তিনি যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা যে কত সুসঙ্গত ও সুস্পষ্ট সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। এই উক্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই তাহার যুক্তি-প্রণালীটি আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে, যথা—মোহ, মায়া, অনুরাগ, নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্ত চিত্ত, শাশ্বত, ও আধুনিক।

(১) কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপনার নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে. বাইরের সে সজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না।

(২) সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ, সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু বিজ্ঞান তার নাড়ি-নক্ষত্র বিচার ক'রে দেখেছে, বলচে মূলে মোহ নেই, আছে কার্ব্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সে কালের কবি আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকে জানতুম মুখ্য।

(৩) আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হ'লে আমি বলব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে, বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদ্‌গত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র-দৃষ্টিতে দেখবে এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

(অর্থাৎ, বিজ্ঞান যে মনোভাব নিয়ে 'বিশ্লেষণ' করে, কাব্যও ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে 'সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে'। মনোভাব হইবে একই, কিন্তু কাজটা হইবে সম্পূর্ণ বিপরীত—ফরমাসটা খুব সঙ্গত বটে !)

(৪) দেখা যাচ্চে ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে ইংরেজী কাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হোলো আধুনিকতা।

(৫) আমরা যখন ইংরেজী কাব্য পড়া সুরু করলুম তখন সেই আচারভাঙা ব্যক্তিগত মর্জ্জিকেই সাহিত্য স্বীকার করে নিয়েছিল।··· আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্ত কাল।

(৬) পাঁজি মিলিয়ে মডার্ণের সীমানা নির্ণয় করবে কে ? এটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।···এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে।

(৭) বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনে নয়। আমি কি ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড় নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিষটা স্বয়ং ঠিকমত কি সেইটেই বিচার্য্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

(৮) সে (আধুনিকতা) বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা ; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্ম-ঘোষণাকে।

(৯) একেই (একটি আধুনিক কবিতার ভঙ্গিবৈশিষ্ট্যকে) বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর

বিশেষ-আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদদার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে হোলো, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না।...তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাব-ভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিশির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টি-সত্যের দ্বারা।...কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো আর কোনো জবাবদিহি নেই, যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে শুধু থাকে ভাবলালিত্য, তা' হলে সেটা বর্জ্জনীয়।

(১০) এই জন্যে আজকের দিনে যে সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম্ম মেনেচে, সে সাবেক কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই।

(১১) যদি বলা হয় আগেকার কবিরা বাছাই করে কবিতা লিখতেন, অতি আধুনিকেরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পারি নে; এঁরাও বাছাই করেন...অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিষ খায়।...কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তা' হলে শুচি জিনিষে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়?

(১২) কিন্তু আধুনিকতার যদি কোন তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায় তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই।

(১৩) ব্যাপারখানা (বিশ্ববিষয়ের প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতা) স্বাভাবিক নয়, অতএব শাশ্বত নয়। সায়ান্সেই বলো আর আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বাহন, য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েচে কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।

উপরি-উদ্ধৃত উক্তিগুলির উপর পৃথক মন্তব্য করিবার প্রয়োজন নাই —বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এগুলির মধ্যে কতখানি চিন্তার ঐক্য আছে। তথাপি আমরা দুই একটি কথা বলিব। রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা অনুসারে আধুনিকতার দাবি প্রায় কোনও যুগের কাব্য করিতে পারে না, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আধুনিকতম কাব্যের আধুনিকতাও খাঁটি নহে, তাহাতেও চিত্তবিকার বা মোহ আছে। এই উক্তিগুলি হইতে আর একটা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে না যে, "নির্ব্বিকার নিরাসক্ত চিত্তে"র নৈর্ব্যক্তিকতাই বিশুদ্ধ আধুনিকতা—তথা বিশুদ্ধ কাব্যের লক্ষণ হইলেও, রবীন্দ্রনাথ নিজে শেষ পর্য্যন্ত কাব্যে এক ধরনের মোহকে অত্যাবশ্যক মনে করেন; আধুনিকদের বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তি এই যে, তাহাদের এই মোহ অশ্রদ্ধার মোহে পরিণত হইয়াছে—হওয়া উচিত ছিল শ্রদ্ধা বা সুন্দর-প্রীতি। ইহা সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিকের মনোভাবকেই শ্রেষ্ঠ attitude বলিয়া বরণ করিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে, এই মনোভাবকেই তিনি খাঁটি আধুনিকতা বলিয়া স্বীকার করেন, অথচ কাব্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে যত কিছু গোল বাধাইয়া বসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই 'আধুনিকতা' যে কি বস্তু, আশা করি, বহু আলোচনাতেও তাহা কাহারও বোধগম্য হইবে না। অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক ভাষ্য রচনা করিয়া হয়তো তাহা জলের মত পরিষ্কার করিয়া তোলা সম্ভব; কিন্তু সে শক্তি আমাদের নাই। "যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা" যদি কেহ থাকেন, তিনিই এই 'হিং টিং ছটে'র সমস্যা পূরণ করিতে পারিবেন। তখনও যদি আমরা বুঝিতে না পারি, তবে অবশ্য আমাদের আর আশা নাই।

৩

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের এই দ্বিধা-ভাবের কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ঘোরতর আধুনিক—"সবার আমি সমানবয়সী যে, চুলে আমার যতই ধরুক পাক"। কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আধুনিকতা বজায় রাখিতে হইলে এবং সেই সঙ্গে আত্মভাবের ঐক্য বজায় রাখিতে হইলে, 'শাশ্বত আধুনিকে'র দোহাই দিতে হয়। ইহার ফলে—চাপিয়া ধরিলে, বলিতে হয়, আধুনিককে মানি এবং মানিও না। বড় মুশকিলের কথা। সাধারণ মানুষ এই সত্য-মিথ্যার সমন্বয়-মূলক অতি উচ্চ ভাব-মন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কাজেই intellectual honesty-র কথা পাড়িয়া বসে, নানা গোলযোগের সৃষ্টি করে। আধুনিক কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অরুচি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই—অথচ তিনি দেশী আধুনিকদের মধ্যে একজন বড় মুরুব্বি, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই আধুনিক কাব্যের রসে যাহারা ডুবুডুবু, তাহাদেরই অনুরোধে, তাহাদের পত্রিকায় তিনি আধুনিকতার যে ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন—প্রশ্নের যে উত্তর লিখিয়াছেন, তাহা এই সব গুরুমারা চেলাদের অপ্রিয় হইলেও তিনি যেমন এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন নিশ্চয়, তেমনই শিষ্যগণ যতই অনাচার করুক, গুরুর স্মিতহাস্যের আশীর্ব্বাদ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে না, ইহাও নিশ্চিত। অতি-আধুনিক অঘোর-পন্থীদের সঙ্গে এমনই একটা বনিবনাও করিয়া লইয়াই তো রবীন্দ্রনাথ টিকিয়া আছেন, এবং টিকিয়া থাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা। একদিন কবি যে বলিয়াছিলেন—"কালিদাস ত নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে"—সেটা কেবল লঘু পরিহাসের উক্তি নয়, তাহা মর্ম্মান্তিক ভাবে

গুরুতরও বটে। 'আমি আছি'—এইটাই সবচেয়ে বড় কথা, ইহাই শাশ্বত সত্যের আত্মঘোষণা। এই 'আমি আছি'র লীলায় যত বিঘ্ন আছে তাহাই মিথ্যা। 'আমি আছি'র সঙ্গে 'তুমিও আছ' মানিতে হইবে। প্রত্যেক 'আমি' অপর 'আমি'র বিরোধী—এ বিরোধ বাহ্যিক, ইহাই মোহ; বরং বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই যে ঘনিষ্ঠতার ভাব, ইহাই আধুনিক Intellect-ধর্ম্মীর মূল মন্ত্র। অতএব রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিকতার সমর্থন না করিলেও, সাহিত্যিক বিশ্বামিত্রগণ তাঁহারই আশিস্-অভিনন্দনে নন্দিত হইয়া দল বৃদ্ধি করিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এই জন্যই আধুনিকেরা রবীন্দ্রনাথকে অধিকতর শ্রদ্ধা করে, কারণ ধর্ম্মবিশ্বাসের মত কোনও বিশ্বাসের দাসত্ব করাকে তাহারা মধ্যযুগের কুসংস্কার বলিয়াই মনে করে। সত্য জিনিসটাই একটা আপেক্ষিক তত্ত্ব; কোনও কিছুকে নিঃসংশয়ে ধরিয়া থাকা নিদারুণ মূঢ়তা বই তো নয়! রবীন্দ্রনাথ কোনও একটা আদর্শের পক্ষপাতী হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যদি উল্টা আদর্শকে বরদাস্ত করিতে না পারেন, সেইটাই হইবে তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয়। যে Faith একদিন মানুষকে যুদ্ধ করাইত, যে একনিষ্ঠা একদিন মানুষকে তাহার জীবনের সর্ব্ব আচরণে একই নীতির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিত, তাহা যদি রবীন্দ্রনাথকেও বাঁধিয়া রাখে—তাঁহার মত মনীষী যদি কোনও তত্ত্বকে নিরাসক্তভাবে উপলব্ধি না করিয়া, তাহাতে এমন ভাবে আসক্ত হইয়া পড়েন যে সেটা একটা বিশ্বাস হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহার ফলে, তিনি তাঁহার মনকে ছাড়িয়া দিবার মত কোনখানে কোনও সংশয়ের অবকাশ না রাখেন, তবে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা কোথায়?

হয় তো ইহাই সত্য, আমরা তাহা বুঝি না বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের অযথা নিন্দা করি।

কিন্তু সে কথা থাক। 'আধুনিকতা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মনোভাব যাহাই হউক, আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা উদাহরণ সহযোগে তিনি বলিয়াছেন, তাহা এক হিসাবে যেমন মৌলিক, তেমনই যথার্থ। কেবল, কথাটা আর একটু সোজা, অর্থাৎ দার্শনিক পরিভাষা-মুক্ত করিয়া বলিলে আরও উপাদেয় হইত। তিনি বলিয়াছেন—

> (এখনকার কাব্যের যা বিষয় তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তা' হ'লে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়? তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে; ইংরেজীতে যাকে বলে ক্যারেক্‌টার।)

এই ধরনের আরও অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন। এ সকল উক্তির অর্থ এই যে, এ কাব্যে ব্যক্তি নাই, আছে বিষয়; সেই বিষয়ের রূপটি আমাদের মন ভোলায় না; তাহার বিশিষ্ট সত্তা, তাহার ক্যারেক্টার আমাদের মনে ধোঁকা দেয় মাত্র। এইটুকু তাহার কাব্যত্ব! অন্যত্র বলিয়াছেন—

> এখনকার আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্‌টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে।

ইহাও কাব্য-আলোচনার ভাষা নয়, ইহা দর্শনসূত্রের ভাষা। এজন্য এরূপ উক্তির গভীরতর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে এই আধুনিক কাব্যের একপ্রকার গৌরববৃদ্ধি হয়। দর্শনের ইদং-তত্ত্বকে যদি এই আধুনিক কাব্য এমন করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে কাব্য চুলায় যাক, সেইটাই

যে একটা মহাকীর্ত্তি! কিন্তু সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন, আধুনিক কাব্যে মোহ বা চিত্তবিকার আছে, অর্থাৎ 'ইদং'-এর বিশুদ্ধ রূপ তাহাতে নাই; তাহা হইলে পূর্ব্বের উক্তি অনর্থক হইয়া পড়ে। আধুনিক কাব্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া, তাহার কয়েকটি লক্ষণ অতি সুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করিলেও, অতিরিক্ত দার্শনিকতার মোহে তিনি কতকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই 'আত্মতা' বা ক্যারেক্টারের উপর জোর না দিয়া, তিনি যদি আধুনিক কাব্যে কল্পনার একান্ত অভাবের কথাটাই আরও স্পষ্ট করিয়া সহজ ভাষায় বলিতেন, তাহা হইলে আলোচনা এত জটিল হইত না। কথাটা আর কিছু নয়, আধুনিক কাব্যে বিষয়বস্তুর যে প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, তাহার কারণ লেখকদের ভাব-কল্পনার দৈন্য; ইহাদের ভাবও নাই—আছে কাঁচা sensation মাত্র। যে মানসিকতা অলস ইন্দ্রিয়ানুভূতি মাত্র, যাহা কল্পনার উচ্চতর মনোভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না—সেইটুকু মানসিকতাই ইহাদের সম্বল। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে 'বিষয়ের আত্মতা' বলিয়াছেন, তাহা আর কিছুই নয়—সর্ব্ব-পরিবেশমুক্ত একটা খণ্ড সত্তা মাত্র, সমগ্রের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। এই sensation তীব্র হইতে পারে—যেমন, অ্যামি লোয়েলের কবিতায় চটিজুতার আঘাত; কিন্তু তাহা মূঢ়-চৈতন্যের অবস্থায় তপ্ত লৌহশলাকা-স্পর্শের মত—শরীরে তীব্র সাড়া জাগে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ইহাদের এই অনুভূতিমাত্র আছে—পশুর মত শিহরিয়া উঠে, চীৎকারও করে; কিন্তু বস্তু সকলের সম্বন্ধজ্ঞান নাই, এক একটা sensation-এই এক এক বস্তুর শেষ। এই অনুভূতি, এই অতিবিচ্ছিন্ন খণ্ড ইন্দ্রিয়-চেতনা মানুষের পক্ষে যতটুকু বোধযুক্ত বা বুদ্ধিসম্পন্ন না হইয়া পারে

না, ইহাদের কাব্যে তাহারই পরিচয় আছে। ইহাদের রাগ-দ্বেষও **sensation**-গত, ভাবগত নয়; যে মোহ কল্পনার জননী, সে মোহ ইহাদের নাই, কারণ, এই মোহই তো স্বষ্টিপ্রতিভার মূল—বাহিরের খণ্ড বিষয়গুলাকে অন্তরের সেই মোহ বা ভাবসূত্রে গাঁথিয়া জগৎকে পুনঃস্বষ্টি করে। এ স্বষ্টি-প্রতিভা তাহারা পাইবে কেমন করিয়া? তাহাদের যে সেই অন্তর নাই, আছে কেবল বাহিরের খণ্ড-সমষ্টির চেতনা। রবীন্দ্রনাথ যদি এই খণ্ড-জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির নিদান বলিয়া, এবং বৈজ্ঞানিক মনই বিশেষভাবে আধুনিক মন বলিয়া, এই কাব্যকে এক অর্থে আধুনিক আখ্যা দিয়া থাকেন, তবে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কেবল ওই সঙ্গে আর একটি কথা যোগ করা দরকার, তাহা এই যে, এ সকল রচনা 'আধুনিক' হইতে পারে, কিন্তু কোন অর্থেই তাহা 'কাব্য' নয়।

বৈশাখ, ১৩৩৯

অতি-আধুনিক প্রতিভা

১

যাহাকে অতি-আধুনিক বলা হইয়া থাকে, বাংলা সাহিত্যে সেই বস্তুর আবির্ভাব আকস্মিক বোধ হইলেও বাঙালীর জীবনে তাহা খুব আধুনিক নহে। বাঙালীর জীবনে, বিশেষ করিয়া তাহার নাগরিক জীবনে, যে একটা পরিবর্ত্তন বিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌কালেই আরম্ভ হইয়াছে, আধুনিক য়ুরোপীয় জীবনের সহিত নানা দিক দিয়া উত্তরোত্তর প্রবল সংঘাতেই তাহার জন্ম; ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর ভাব-জীবনে যে বিঘ্ন ঘটিয়াছে, এবং তাহার ফলে আমাদের প্রাণে-মনে যে 'আধুনিকতা'র প্রবৃত্তি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা এক পুরুষেরও অধিক কালের কথা। বিগত পঁচিশ বৎসর ধরিয়াই আমরা আমাদের জীবন-যাত্রায় ক্রমশ নিরালম্ব, নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি—আমাদের বাস্তুভিটায় ভাঙন ধরিয়াছে। যে অচলায়তনের আশ্রয়ে আমরা এতকাল—সেই বিদেশীয় কাল্‌চারের প্রথম আক্রমণের যুগেও—ভাব-জীবনের উচ্চ-উদার আদর্শকে জীবন-সংগ্রাম হইতে পৃথক রাখিয়া, পশ্চিমের সঙ্গে একটা রফা করিয়া, আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, সেই বহুধিক্কৃত সমাজ-সৌধের ভিত্তিমূল, প্রথমে মহামারী ও পরে দুর্ব্বল দেহমন-সুলভ ক্ষুদ্র-সুখ-পিপাসার ফলে ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল। পূর্ব্বতন সমাজের শাসন অযৌক্তিক ও দুর্নীতিমূলক বলিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে নূতনতর জীবন-যাপনের আগ্রহে বাঙালী স্বাতন্ত্র্য-সাধনের পক্ষপাতী হইল, তাহাতে সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যের গণ্ডি সংকীর্ণ হইয়া আসিল, কোনরূপ

আত্মিক শক্তিচর্চ্চার সামাজিক প্রয়োজন আর রহিল না। বহুবৎসর-ব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বাঙালীর আধুনিক ইতিহাসে যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ ঘটে নাই। বাঙালীর বাঙালী-জীবনের প্রধান বিকাশ-ভূমি পল্লীগ্রাম ইহারই প্রকোপে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আমি পশ্চিম-বঙ্গের সেই অঞ্চলের কথা বলিতেছি, অষ্টাবিংশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাল্‌চার ও সভ্যতা যেখানে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই অচলায়তন ভাঙিতে আরম্ভ হইল, অথচ তাহার স্থানে আমরা কোনও নূতন আশ্রয় আজ পর্য্যন্ত গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। জীবনে যেখানে যেটুকু স্বাবলম্বন পূর্ব্বে ছিল, তাহা আমরা খোয়াইয়াছি; পুঁথিগত বিদ্যার বলে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছি এবং সেই পুঁথিরই ভাব-স্বর্গে চক্ষু মুদিয়া বড় বড় কথার মোহে নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা ঢাকিতেছি।

সমাজ ও বাস্তুভিটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'সোঁতের শেহালা'র মত মূলহীন জীবন যাপন করাই যখন অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালীর গত্যন্তর হইয়া দাঁড়াইল, তখন বাহিরের জাতি-সমূহের জীবন-সংগ্রামের প্রতিকূল প্রখরতা সেই স্রোতের মধ্যেই অনুভূত হইল। ১৯০৫ হইতে যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সুরু হইয়াছে, বাঙালীর পক্ষে তাহার কারণ কিছু ভিন্ন। যে পরিমাণে আমরা জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হইতেছি, সেই পরিমাণেই আমাদের মধ্যে একরূপ নৈরাশ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইতেছে—শক্তি নয়, অশক্তির অন্তিম আক্ষেপই আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মূলে। স্বদেশী আন্দোলনের মূলে যে তাড়না ছিল, তাহা বিজাতীয় আদর্শে বাঁচিবার আগ্রহ। বয়কট হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু পন্থা আমরা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে বাঙালীর প্রতিভা বিদেশীর অনুকরণ

করিয়াছে; এবং স্বাদেশিকতার যে মন্ত্র আমরা তখন হইতে জপ করিতেছি, তাহাতে আশানুরূপ সিদ্ধিলাভ করি নাই এই জন্য যে, সে মন্ত্র সাধন করিতে হইলে আমাদের সমাজ ও সমগ্র জীবন বিদেশী আদর্শে ঢালিয়া সাজিতে হইবে; স্বধর্ম্মের সঙ্গে পরধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের শক্তি আমাদের আর নাই, তাই পদে পদে আমরা বিড়ম্বিত হইতেছি। এই দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রীয় সাধনার নিষ্ফলতার কারণ—আমরা আপনাকে হারাইয়াছি, তাই পরস্বকে স্বকীয় করিতে পারি না; আমাদের সর্ব্ব-প্রচেষ্টার মূলে একটা মূঢ় অনুসরণ-প্রবৃত্তি আছে।

এই প্রবৃত্তি যখন আর চাপা দিবার উপায় রহিল না, অর্থাৎ যখন আর আত্ম-প্রবঞ্চনার সুযোগ রহিল না, যখন আমরা ক্রমশ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে, আমরা হারিয়াছি, আমাদের আর দাঁড়াইবার স্থান নাই—যে স্রোতে গা ঢালিয়া ছিলাম, সে স্রোতের উজানে চলিবার বা তাহাকে রোধ করিবার শক্তি আর নাই—তখন হইতে সকল নীতি ও আদর্শের কথা বন্ধ হইয়াছে, স্রোতের গতি-নির্ণয়েও আর প্রবৃত্তি নাই; এক্ষণে আমাদের জীবনে অতীতও নাই, ভবিষ্যৎও নাই, আছে কেবল বর্ত্তমানের নিকট আত্মসমর্পণ—জড়বুদ্ধির অসহায় উত্তেজনা। এ অবস্থায় আত্মিক শক্তি একেবারে নিষ্ক্রিয়—অসাড় দেহমন যে কোনও স্ফুলিঙ্গের স্পর্শেই একটু চমক অনুভব করে। আমাদের জীবনে ইহারই নাম আধুনিকতা। কুসংস্কার-মুক্তির আস্ফালন, উচ্চতর আদর্শের জয়-ঘোষণা, অতিরিক্ত জীবনোল্লাস, বা বিশ্বসভ্যতার তালে তালে অগ্রগমন —যে স্পর্দ্ধাই আমরা করি না কেন, যে কেহ একটু ভাবিয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিবেন, আজ চারিদিকে বাঙালী-জীবনের সর্ব্বস্তরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, যে নির্জ্জীবতা ও অবসাদ, মস্তিষ্কবিকৃতি ও

চরিত্রহীনতা, বিলাসিতা ও চালাকি প্রকট হইয়া উঠিতেছে—তাহা নবপ্রভাতের অরুণিমা নয়, আসন্নসন্ধ্যার রক্তরাগ।

২

সাহিত্যে এই আধুনিকতার সূত্রপাত হইয়াছে—উনবিংশ শতাব্দীর নব্য বাংলা-সাহিত্যের প্রভাব ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এ প্রভাব ক্ষীণ হওয়ার কারণ সহজেই অনুমেয়। যে ভাবকল্পনা ও রসপিপাসা সে সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল, তাহা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল—জীবনযাত্রায় জাতীয় আদর্শচ্যুতি, দেহমনের স্বাস্থ্যহানি, এবং জীবন-ধারণের পক্ষে নানা প্রতিকূল অবস্থা আমাদের প্রাণশক্তি অপহরণ করিল; যে শক্তির বলে আদুল গায়ে ধূলামাটির উপরে বসিয়াও আমরা উচ্চ আদর্শ, উচ্চ চিন্তা এবং উৎকৃষ্ট কাব্যরসের নিশ্চিন্ত উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই নাই, সেই শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল; আমরা কতকটা স্বখাত সলিলে ডুবিতে আরম্ভ করিলাম। আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের উৎকট আদর্শও আমাদের রসবোধকে অনেক পরিমাণে বিপন্ন করিয়াছে। সে সাহিত্যের রসকল্পনাহীন মানস-ব্যায়াম, অথবা সূক্ষ্ম মনোবিলাস, আমাদের অলস অবসাদগ্রস্ত অসুস্থ চিত্তের পক্ষে উপাদেয় হইয়া উঠিল। য়ুরোপীয় জীবনে যাহা বাস্তব, যাহা সত্যকার মন্থনোদ্ভূত গরল, তাহাই আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়-মনের—স্বল্প-সুখকাতর সমাজের পক্ষে, এক প্রকার ভাববিদ্রোহের পরিপোষক হইল। ইহার অন্তরালেও একটা গূঢ়তর কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে সামাজিক মনোভাব বা জাতীয় সংঘবুদ্ধি আমাদের দেশে কখনও রাষ্ট্রীয়

চেতনার দ্বারা পরিপুষ্ট হয় নাই, একটা ধর্ম্মনৈতিক আদর্শ ই যাহাকে এতকাল সংস্কারের মত পালন করিয়াছিল, সেই সংঘবুদ্ধি যখন আর টিকিল না, তখন তাহার পরিবর্ত্তে আমরা যে য়ুরোপীয় আদর্শের দোহাই দিতে লাগিলাম, তাহা আমাদের জীবনে কখনও সত্য হইয়া উঠে নাই। সমাজ গেল, একান্নবর্ত্তী পরিবারও গেল—ব্যক্তিগত সুখচর্য্যা ছাড়া জীবনে আর কোনও কর্ত্তব্য-নীতির শাসন রহিল না; রহিল কেবল আত্মসুখ-সাধনা ও প্রাণহীন ভাব-বিলাস।

এ অবস্থা, আর যাহাই হউক, স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়; সমষ্টিজীবনের মহত্তর অনুপ্রেরণায় ব্যষ্টিজীবনের যে সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ তাহাই যদি লোপ পায়, তবে সত্যকার সাহিত্য-রস-পিপাসা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? সত্যকার রসিকতা বা রসবোধ জীবন-ধর্ম্মেরই অন্তর্গত—ভাববিলাস রসিকতা নহে। যাহা জীবনে অনুভব করি না, জীবনেরই গূঢ়-গভীর গহনতলে, অন্ধকার আকাশে বিদ্যুদ্দীপ্তির মত, যাহাকে কখনও আভাসেও অনুমান করি নাই, সাহিত্যে তাহার রস-রূপ উদ্ভাবন করিব কিরূপে? জীবনের সহিত সম্বন্ধহীন হইলেই, রস, আস্বাদনের পরিবর্ত্তে, একটা মনোবিলাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। ঠিক এমনই অবস্থায় বাংলা সাহিত্যে এমন এক প্রতিভার আবির্ভাব হইল, যাহার অলোকসামান্য কাব্য-কল্পনায় বাঙালীর রসবোধে অতি-সূক্ষ্ম ভাববিলাস ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হইল। এ আদর্শের সাধনায় অতীত ও বর্ত্তমান সকল চিন্তাই তুচ্ছ হইয়া যায়, একটা সার্ব্বভৌমিক রসতত্ত্বের আশ্রয়ে ব্যক্তির ভাব-মুক্তি ও সমষ্টির মোক্ষলাভ হয়। সেই পরম তত্ত্বের সৌন্দর্য্য-ধ্যানে—যাহা নিকট ও প্রত্যক্ষ, তাহা একটি নিত্য-সুদূর মহামহিমার তুলনায় তুচ্ছ হইয়া যায়; বাস্তব জগতের কর্কশতা ও সমাজ-জীবনের

মূঢ়তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আদর্শের সাধনা বা আত্মরতির আনন্দই পরম আস্বাদের কারণ হয়। নব্য-বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে আমরা জীবন ও জগৎকেই একটা মহত্তর আদর্শ-কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইয়াছিলাম; আধুনিক কালে, প্রাণের পিপাসা মিটাইবার প্রয়োজনই যেন আর নাই; জীবনকে ফাঁকি দিবার, এবং সেই সঙ্গে রসকে মনো-বিলাসের আড়ালে ঢাকা দিবার যে প্রবৃত্তি এ অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী, তাহার পক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই প্ররোচনা বড়ই কাজে লাগিয়াছে; তাহার প্রভাবে বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে 'কাল্‌চার' নামক যে বস্তুটির আদর দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, তাহার নাম 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি' বা 'পরিশীলন'—যাহাই হউক, তাহা জীবন-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত, আত্মপরায়ণ ভাব-সর্ব্বস্বতা ভিন্ন আর কিছুই নহে; দোষে ও গুণে বাঙালী জাতির যে বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা তাহার জীবনধর্ম্মের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে সমাজে, ধর্ম্মে, উৎসবে, ব্যসনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এই 'কাল্‌চার' সেই শক্তির পরাভবের প্রমাণ।

আধুনিক বাঙালী-জীবনে রবীন্দ্র-প্রতিভা এই পরিমাণ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। মাটি প্রস্তুত ছিল বলিয়াই এইরূপ আশাতীত ফললাভ হইয়াছে। এজন্য রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে দায়ী করা যায় না—দুর্ভাগ্য দেশের, দুর্ভাগ্য কালের। দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়াই যে প্রতিভা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাকে দেশ ও কালের শাসনে বদ্ধ করিবার কথাই উঠিতে পারে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে নির্ভীক কল্পনা, যে গভীর ভাবুকতা অপূর্ব্ব সৃষ্টি-সুষমায় মণ্ডিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যে বস্তু-সমস্যাহীন ভাব-সঙ্গীত আছে—যাহার মোহে দেশ জাতি ও সমাজের দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া, স্বয়ম্ভু ও স্বয়ম্প্রধান হইয়া

আত্মরতির রস উপভোগ করা যায়, তাহাই তাহার উপাস্য। ভাষা ও ছন্দের যে সুর-সুষমা তাঁহার গদ্যের অর্থকে এবং পদ্যের বস্তুকে অতিক্রম করিয়া অবশ স্নায়ুমণ্ডলকে সুখ-পীড়িত করে, রবীন্দ্রকাব্য-প্রীতির মূলে অধিকাংশ স্থলে তাহার অধিক কোন উপলব্ধি নাই। কিন্তু এই সকলের মধ্য দিয়া যে একটি বাণী বা ভাবনা-নীতি অলক্ষ্যসঞ্চারে বহুরূপে ও বহুভঙ্গিতে, বাঙালী-চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি। ১৯০৫ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত, মোটামুটি এই বিশ বৎসর বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের যুগ; এই যুগই অতি আধুনিকের পূর্ব্বযুগ, ও তাহার উদ্যোগপর্ব্বের কাল। অর্থাৎ, যাহাকে অতি-আধুনিক বলা যায়, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহার অনুকূল মনোভাব যেমন নানা কারণে পূর্ব্ব হইতেই গড়িয়া উঠিতেছিল, তেমনই সাহিত্যক্ষেত্রে, রবীন্দ্র-প্রতিভার গৌণ ও বিকৃত-প্রভাবের ফলে—সুস্থ রসবোধের অভাব, এবং অলস ব্যক্তি-অভিমান, তলে তলে বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে প্রকট হইয়া উঠিল।

৩

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার কথা বলিয়াছি, তাঁহার ব্যক্তিপ্রভাবের কথা পরে বলিব। আমি জানি, আধুনিক কালের 'কাল্‌চার'-বিলাসীরা এবম্বিধ আলোচনার পক্ষপাতী নয়—এরূপ সিদ্ধান্তে আদৌ শ্রদ্ধাবান নয়। যাঁহারা অতি-আধুনিক সাহিত্যের অনুরাগী, অথবা নিজেরাও তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যে যুক্তির আশ্রয় লইবেন তাহাও জানি। সর্ব্ববিধ ব্যভিচার, পাপাচার ও মিথ্যাভাষণের মূলে আছে ঐকান্তিক অক্ষমতা ও আত্মাভিমান—তাহার পক্ষে কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করাই

একমাত্র ক্ষমতার পরিচয়। আমি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভাকে দায়ী করি নাই ; আমার বক্তব্য এই যে, আমরা একালের বাঙালী, সে প্রতিভার মুখ্যফলে লাভবান হই নাই ; দেশ-কালের দোষে তাহার গৌণ ফলটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। অতিশয় দুর্ব্বল, দিন দিন অধিকতর পরাজিত এই জাতি যদি নির্ব্বিশেষ ভূমার ব্যোম-পাথারে সন্তরণ করিবার পটুতা দাবি করে—কবি রবীন্দ্রনাথের যে জীবন, সেই জীবনের আদর্শকে আত্মসাৎ করিবার ভান করে, তবে তাহা কি সত্য ? তবু যে সেই আদর্শে আকৃষ্ট হয়, তাহার কারণ কি ? সে আপনার জাতি-জন্ম বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বদায়িত্ব-মুক্তির এক অভিনব রসপন্থা অন্বেষণ করিতেছে। যে কাব্যে ভাব প্রায় বস্তুহীন, যাহাতে অর্থ অপেক্ষা সুরের প্ররোচনা অধিক, যাহাকে জীবনের দিক দিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হয় না, অথবা যাহাকে বুঝিতে পারিলে একটি ভাবস্বর্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়—সে তাহাকেই বরণ করিতে উৎসুক। কোথায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগ্রাসী আত্মভাবসাধনা—বহির্জগতের উপর দুর্দ্ধর্ষ আত্মপ্রতিষ্ঠা, আর কোথায় তাহারই অনুভাবনায় আত্মভ্রষ্ট, আত্মভীত, দেহ-দুর্ব্বল মনোবিলাসীর আশ্রয়-সন্ধান !

এই দিশাহীন, আশাহীন, চরিত্রহীন, জীবনে যে সাহিত্য উপাদেয় হইয়া উঠিতেছে তাহার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথমত ইহাতে সুর নাই, আছে গোঙানি ও চীৎকার ; গোঙানির নাম Realism, এবং চীৎকারের নাম ব্যক্তিত্ব-ঘোষণা। এই চীৎকারের বাক্য-অংশ য়ুরোপ হইতে ধার করা—ভাষা ও অর্থ দুই-ই ! ইহার আস্বাদনীয় অংশ যদি কিছু থাকে, তাহা কটু ও ঝাল, মধুর না হওয়াই তাহার গৌরব ; কারণ তাহা শুষ্ক জীবন-পল্বলের নীরস

পঙ্ক ; তাহা যে পরিমাণে কঠিন, সেই পরিমাণে সত্য ; যে পাঠকের পক্ষে তাহা দুর্গন্ধ, বা বমনোত্তেজক, সে হতভাগ্যের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ! বাঙালী-জীবনে যাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত, যাহা বিজাতীয় বলিয়াই অবাস্তব, তাহারই অপরিপাকজনিত উদ্গার এ সাহিত্যের মৌলিকতা। স্বজাতির জীবনোদ্ভূত রস-কল্পনার পরিবর্ত্তে, বিজাতির সমাজে আধুনিক কালে যে জীবনসংগ্রাম চলিতেছে তাহারই ঘর্ম্ম-ক্লেদ ও দুর্ভাবনার উত্তাপকে অতি স্থূলভ কল্পনায় আত্মসাৎ করিবার ভান এবং তাহারই আস্ফালন—এ সাহিত্যের প্রধান কৃতিত্ব। অর্থাৎ নিজেদের জীবন-চেতনা যখন লোপ পাইতেছে, তখন দেহে hot bottle-এর সাহায্যে উত্তাপ রক্ষার চেষ্টা হইতেছে। জীবনের অগ্নিহোত্রে য়ুরোপ যে হবিঃ ও ইন্ধন তাহার সুগোপন অগ্নিগৃহে সঞ্চয় করিতেছে—যে যজ্ঞে আমাদের অধিকার নাই, যে অগ্নি আমাদের দেহ-মনের অগোচর—তাহারই বহিরুৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ ও ধূমরাশি আহরণ করিয়া এখানকার প্রেতভূমিতে ভৌতিক উপদ্রব চলিতেছে। যাহাকে চিরদিন রসিকসমাজ রস বলিয়া উপভোগ করিয়াছে সে বস্তুর দাবি করাই মূঢ়তা,—তাহা বাস্তবধর্ম্মী সত্যপন্থী বীর-বিদ্রোহীর উপযুক্ত নয়। এ পর্য্যন্ত মানুষ যাহা কিছু তপস্যার বলে লাভ করিয়াছে, সত্য ও সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে পূজার্হ বলিয়া মনে করিয়াছে, যাহার অনুপ্রেরণায় মানুষ আপনার ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতায় নিরতিশয় লজ্জা পাইয়াছে, এবং যাহাকে সাধন-মন্ত্ররূপে আশ্রয় করিয়া নরজন্ম সার্থক করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে —এই অতি-আধুনিকেরা তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করে, কারণ সে আদর্শ ধর্ম্ম বা আত্মিক শক্তির অপেক্ষা রাখে—পরাজয়ে লজ্জা, এবং জয়লাভে আত্মপ্রসাদ দাবি করে। এজন্য এ সাহিত্যের যাহা ভাববস্তু,

তাহা জীবনাবেগ-প্রসূত নয়। তাহা মুমূর্ষুর চিত্তবিকারজনিত প্রলাপ-উচ্ছ্বাস; তাহাতে রস নাই—আছে কতকগুলি উক্তির আস্ফালন; সে উক্তির বাক্যগত অভিপ্রায় পরস্ব, তাহার আবেগ দুর্ব্বলদেহে কম্প-জ্বরের মত।)

অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তের অকাট্য প্রমাণ ইহার ভাষা। অতি-আধুনিকেরা যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে, তাহার কোনও জাতি নাই। সকল ভাষার মত বাংলা ভাষারও যে একটি নিজস্ব রীতি-প্রকৃতি আছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া ভাষার জীবন-রক্ষা হয়, তাহার প্রাণ-স্পন্দনের সেই গূঢ় ভঙ্গিটিকে ইহারা খুঁজিয়া পায় না, তাই ভাষাকে জড়যন্ত্রের মত ব্যবহার করে। ভাব ও অর্থ যেন শব্দের ঢেলা ভাঙিয়া চলিয়াছে, কোনও একটা idiom-এর বালাই নাই। বিভিন্ন প্রাদেশিক রীতির অপূর্ব্ব মিশ্রণ, শব্দ ও বচনের অপপ্রয়োগ, সংস্কৃত সন্ধি-সমাসের অসংস্কৃত ভ্রূকুটি, এবং সর্ব্বোপরি ইংরেজী idiom-এর অনুকরণে বাংলা শব্দযোজনা—ইহাদের ভাষাকে যে মূর্ত্তি দান করিয়াছে, তাহা যেমন কৃত্রিম তেমনই বিকট। এ ভাষা দেখিয়া মনে হয়, ইহারা কোন ভাষার ধর্ম্মই মানে না—স্তিমিত প্রাণশক্তির ব্যভিচার-স্পৃহা ইহাদের ভাষাতেও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভাষার এই রীতিভ্রংশই জাতির মৃত্যু সূচনা করে। প্রতিভাশালী লেখকের ভাষায় যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়—এ ভাষার স্বপক্ষে সে দৃষ্টান্ত হাস্যকর ও নিরর্থক। শক্তিমান লেখকের দ্বারা ভাষা ভগ্ন বিকল বা জখম হয় না, বরং ভাষার প্রকৃত-রূপ নানা ভঙ্গিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভাষার যে স্বরূপ প্রথমে বীজ অবস্থায় অপ্রত্যক্ষ থাকে, তাহাকেই সুবিকশিত করা প্রতিভার কাজ। প্রতিভার স্পর্শেই ভাষার রূপ আরও বিশিষ্ট হইয়া উঠে, ভ্রূণ-অবস্থা হইতে ভাষা যেন

সাহিত্যে ভূমিষ্ঠ হয়; এবং প্রতিভাশালী লেখক পরম্পরার সাহায্যে তাহার যে আকৃতি সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে, তাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না, পরিবর্দ্ধিত হয় মাত্র। ভাষার সেই বীজ প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার শক্তি কোনও লেখকের নাই—ইহাকে আবিষ্কার করিয়া এবং দৃঢ়ভাবে আত্মসাৎ করিয়াই ব্যক্তিগত রীতি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। ভাষার প্রকৃতিগত এই নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া যে লেখক মৌলিকতা জাহির করিবার চেষ্টা করে সে শক্তিমান নয়, শক্তিহীন; তাহার নিজের জীবন ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া সে ভাষার জীবনে নিজ জীবন যুক্ত করিতে পারে নাই —বাগ্‌দেবতাকে সে বশ করিতে পারে নাই। ভাষার সে নবত্ব একটা রীতি কিংবা style নয়; কুব্জ খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ মানুষের চেহারা যেমন, ইহাদের ভাষার সেই ভঙ্গি একটা style নয়—বিকৃতির লক্ষণ।

সর্ব্বাপেক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়াছে এই যে, ঠিক যে কালে আমরা বাঁচিবার জন্য, জাতিহিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছি, ঠিক সেই কালেই আমাদের সাহিত্য ও ভাষায় এই আত্মিক শক্তিলোপের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমরা যদি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই যে, নবসৃষ্টির জন্য যেমন পুরাতন সব কিছুকেই ভাঙিয়া গড়িবার প্রয়োজন হয়, তেমনই ভাষাকে নূতন করিয়া গড়িবার জন্য আমরা তাহার সকল বন্ধন শিথিল করিয়াছি—তবে তাহার মত আত্ম-প্রবঞ্চনা আর নাই। ভাষা সম্বন্ধে এ কথা খাটে না; কারণ সাহিত্যে ভাঙনের আবেগ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ পাইলেও, সাহিত্য-কর্ম্মটাই একটা সৃষ্টি, ভগ্নস্তূপ নয়; এবং ভাষা সেই সৃষ্টির মূলাধার; লেখকের শক্তি ও প্রতিভার—এক কথায়, আত্মার ছাপ পড়ে তাহার ভাষায়। ভাষাকে ভাঙিয়া ফেলার অর্থ নিজেই ভাঙিয়া যাওয়া। গত শতাব্দীতে রাশিয়ায় যে অবস্থার মধ্যে

এবং তাহারই তাড়নায়, যে সাহিত্য জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাতে রুশ জাতির নবজন্মের পরিচয় আছে; ভাঙনের আবেগ সাহিত্যে সৃষ্টিপ্রেরণা হইয়া উঠিয়াছে—সে জাতির প্রতিভা যেন নীলকণ্ঠ হইয়াই অমৃত বণ্টন করিয়াছে। সে জাতি যে ভাঙিবার আবেগে আপনাকে ভাঙে নাই—সে যে বাঁচিবার শক্তি হারায় নাই, সে যুগের সাহিত্যসৃষ্টিতে তাহার প্রমাণ আছে। এই নবজন্মের লক্ষণ আমাদের গত শতাব্দীর সাহিত্যে কিছু আছে, যদিও এ দেশের তদানীন্তন অবস্থায় সে জীবন কল্পনা ও ভাবুকতাকে আশ্রয় করিয়াছিল। তথাপি সে সাহিত্যের ভাষায় ও ভাব-কল্পনায় সুস্থ আত্মচেতনার পরিচয় আছে; আজিকার সাহিত্যের মত তাহাতে পশুতার আস্ফালন, দুর্ব্বল কামকল্পনার বিলাস বা বিজাতীয় ভঙ্গির ভাষায় বিজাতীয় ভাব-সাধনার গৌরব-ঘোষণা ছিল না। এক্ষণে ভাষার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সুবিখ্যাত ইংরেজ মনীষী জন মর্লীর নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি স্মরণযোগ্য।—

> Let the words of a country be in part unhandsome and offensive in themselves, in part debased by wear and wrongly uttered, and what do they declare but by no light indication, that the inhabitants of that country are an indolent, idly-yawning race, with mind already long prepared for any amount of servility? On the other hand, we have never heard that any empire, any state did not at least flourish in a middling degree as long as its own liking and care for its language lasted.

৪

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্র-প্রতিভার অতিশয় সহজলভ্য ফলস্বরূপ আমরা কিরূপ কাল্‌চারের অধিকারী হইয়াছি, আমাদের সাহিত্যিক রসবোধও কেমন তুরীয় মার্গে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু, কেবল এই কবি-প্রভাবই নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপ্রভাবও, অর্থাৎ সাহিত্যের নীতি-নির্ণয়ে ব্যক্তিগত-ভাবে এবং ব্যক্তিগত সাহিত্যিক-সম্পর্কে—বিশেষত শেষের দিকে—তিনি যে আদর্শ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও এই অতি-আধুনিক সাহিত্যের স্বৈরাচারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়াছে। 'সবুজ পত্রে'-র সবুজ অভিযান হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি ভাবে, চিন্তায়, উপদেশে ও আচরণে, অবুঝের স্পর্দ্ধাকেই প্রাণের স্বাস্থ্য বলিয়া অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন। অতিশয় চপল, অপরিণতবুদ্ধি যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে—মনের সকল দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া, প্রাণকে কেবল লতাপুষ্পের মত প্রাকৃতিক প্রভাবের মধ্যে মেলিয়া ধরার—একটা অতিশয় unmoral আদর্শের প্রতিষ্ঠায় তিনি বহুদিন যাবৎ ব্যাপৃত আছেন; কেবল যুবকগণের সাহিত্য-সাধনায় নয়, বালক ও কিশোরদিগের শিক্ষাপদ্ধতিও তিনি এই আদর্শে সংস্কার করিবার পক্ষপাতী। প্রতিভার দৈবীশক্তি বলে যে শাসন তিনি নিজে মানিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই—বাহিরের সমাজকে, জাতির বাস্তব জীবন-প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া যে আত্মরতির সাধনায় তিনি কাব্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—সেই শাসন-না-মানার নীতিকে ভাব-কল্পনার ক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া তিনি আপামর বাঙালী নর-নারীর আদর্শরূপে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষী। ইহার কারণ, জগৎময় তিনি আপনাকেই দেখেন, তাই পরের কল্যাণ-পন্থাকে

পৃথক মনে করিতে পারেন না। এই জন্যই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথ জাতি-ভাব বা nationalism-এর বিরোধী ; তিনি ব্যক্তি-ভাবের দ্বারা অন্ধ বলিয়াই, সমষ্টিগত সত্তার মূল্য বুঝেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ, নীতির যে উচ্চ আদর্শ, প্রীতির যে সূক্ষ্ম বিভাবনা, এবং শ্রুতি-স্মৃতির যে নূতন অর্থবাদ প্রচার করিতেছেন, তাহা সর্ব্বনীতি, সর্ব্বপ্রীতি ও সর্ব্বস্মৃতির negation ; ভাবের জগতে তাহা যেমন মহাসত্য, বাস্তব জগতে তাহা তেমনই মহা মিথ্যা। এই অতি উচ্চ ভাবের নাস্তিক্য-নীতির অনুসরণে তিনি আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রেও অরাজকতার বীজ-বপন করিয়াছেন। 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, ওরে আমার কাঁচা' বলিয়া একদা যাহাদিগকে তিনি 'পুচ্ছটি উচ্চে তুলিয়া নাচিবার' জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহারা সে আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই, কারণ, পুচ্ছছাড়া তাহাদের অন্য সম্বল ছিল না। আজ তাহাদেরই পুচ্ছতাড়নায় বঙ্গ-সরস্বতী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন।

এই স্বৈরাচার-নীতিকে উচ্চ আদর্শে শোধন করিয়া প্রচার করা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ চিরদিন তাঁহার ব্যক্তিগত সাহিত্যিক জীবনে আর একটি নীতি পালন করিয়াছেন, তাহারও ফল সাহিত্যক্ষেত্রে কম বিষময় হয় নাই। তিনি চিরদিন নবীনতা ও তারুণ্যের পক্ষপাতী,—এ পক্ষপাত কেবল ভাববিশেষের প্রতি নয়, বস্তুগত পক্ষপাত ; নবীন ও তরুণ যাহারা, তাহাদের সহিত মেলামেশা করিতে তাঁহার কোনও কুণ্ঠা নাই—নিজের অপরাজেয় চির-তারুণ্যের এই লক্ষণ তাঁহার গর্ব্বের বস্তু। ইহার আরও একটা কারণ বোধ হয় এই যে, বাংলা দেশে যে রসিকতার অভাবে তিনি তাঁহার প্রাপ্য কবিযশ কখনও পূরাপূরি পান নাই—প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া এক শ্রেণীর তরুণ তাঁহার কাব্য ও ব্যক্তিত্বের

মোহিনী শক্তি স্বীকার করিয়া সেই রসিকতার অভাব পূরণ করিয়াছে। তাহাদের বয়স এমন যে, তাহারা মুগ্ধ হইয়াই কৃতার্থ হয়—কোনও প্রশ্ন করে না, করিতে দেয় না। আলাপে পরিচয়ে, পত্র-ব্যবহারে তিনি যত অপরিণতবুদ্ধি, প্রতিভালেশহীন সাহিত্যাভিমানী ছোকরার দলকে তাহাদের এই মুগ্ধ হওয়ার বিনিময়ে যেরূপ প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহাতে বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্র নানা কীটপতঙ্গের আত্মশ্লাঘাগুঞ্জনে ভরিয়া উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির সঙ্গে সাহিত্যিক মৈত্রীর স্পর্দ্ধায়, তাঁহার শিষ্যত্ব-গৌরবে, অতিশয় অক্ষম ব্যক্তিও সাহিত্যস্রষ্টা বা সাহিত্যের সমঝদার বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে, তাহাদের সুস্পষ্ট অক্ষমতা সত্ত্বেও, নানা প্রকারে সমসাময়িক সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এ আচরণের মূলে যে মনোবৃত্তি আছে, তাহা যতই নির্দ্দোষ হউক—তিনি যে একটা নিতান্তই ব্যক্তিগত অভাব বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, আত্মমর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিয়াছেন, 'শস্যক্ষেত্রে ফসলের চর্চ্চাকে কাঁটাগাছের স্পর্দ্ধা'র দ্বারা অবমানিত হইতে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আজ কেহ স্বীকার করিতেও সাহস পাইবেন না জানি, কিন্তু আশা করি, বাংলা সাহিত্যের এ যুগের এই অরাজকতার কারণ-নির্ণয়ে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি যে 'সবুজ-অবুঝ'দের পুচ্ছ নাচাইতেই উৎসাহিত করিয়াছেন তাহা নয়—সে পুচ্ছের স্ফীতি-সম্পাদনেও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

সাহিত্যের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ এককালে ব্রতী তপস্বীর মত রক্ষা করিয়াছিলেন, বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা-রীতিও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, শেষে সে আদর্শের সংযম ত্যাগ করিয়া, প্রতিভাকে

সৃষ্টিকার্য্য হইতে অবসর দিয়া, তিনি তাহাকে যে আত্মবিনোদনের লীলাখেলায় নিয়োগ করিলেন, তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ভাষার নূতনতর প্রবৃত্তির মধ্যে। তিনি ক্রমশ ভাষার আর্ষ-রীতি ত্যাগ করিয়া বৈঠকী-রীতি আশ্রয় করিলেন; এ রীতির সঙ্গে তাঁহার পরবর্ত্তী মনন-ভঙ্গির যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। শক্তিমানের লীলাখেলাও সুন্দর; কিন্তু বাংলা ভাষা তাঁহার অনুকরণে এই নূতন রীতির চর্চ্চায় যাহা হারাইল তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার অবকাশ আজও হয় নাই। কবি-যাদুকর নূতন নূতন ভেল্কি দেখাইতে লাগিলেন, ভাবের অবাস্তব মনোহারিত্বে ও শব্দ-বিন্যাসের কুহকে ভাষার কৌলীন্য-সংস্কার দূর হইল। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-কীর্ত্তির মূল্য বিচার করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার সৃষ্টিশক্তির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে যে ভাষায়, পদ্যের যে ছন্দে ও গদ্যের যে রীতিতে তাঁহার প্রতিভা মধ্যাহ্নদীপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহাই বাংলা সাহিত্যকে মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর প্রৌঢ়-শ্রী দান করিয়াছে। সে সৃষ্টিশক্তি বুঝি আর তাঁহার নাই, তাই তাঁহার ভাষার এই অধুনাতন ভঙ্গি সে প্রতিভার জরতীবেশ ঢাকিবার একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু ভাষার এ রীতিতেও প্রতিভার যে শেষ প্রভা বিচ্ছুরিত হইয়াছে, অন্যের পক্ষে তাহা দুর্লভ হইলেও—এ ভাষা 'চল্‌তি' না হইয়া পারে না, এ ভাষায় শুইয়া গড়াইয়া হাই তুলিয়া কলম চালানো যায়; ভাব-অর্থহীন কলকাকলী, কল্পনাহীন মস্তিষ্ক-কণ্ডুয়ন ও বিদ্যাবিহীন বাচালতার পক্ষে এ ভাষা বড়ই উপযোগী। এই ভাষার খনিত্রযোগেই অতি-আধুনিকতার পয়ঃপ্রণালী প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই। অতি-আধুনিক সাহিত্যে লেখকদিগের ভাষার অক্ষম ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সাধ হইল,

ভাষার জাতিনাশ করিতে হইলে কেমন করিয়া তাহা শক্তিসহকারে ভাল করিয়া করিতে হয়, তাহাই দেখাইবেন। শক্তির অভাবে তরুণেরা যাহাকে আঁচড়াইয়া খামচাইয়া নাক-কান ছিঁড়িয়া হতশ্রী করিতেছিল, তাহার দেহটাই মুচড়াইয়া মটকাইয়া, একেবারে তাহার নাম ভুলাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজের দারুণ তারুণ্য প্রমাণ করিলেন 'শেষের কবিতা' নামক অতিশয় চমকপ্রদ গল্পটিতে। বাংলা ভাষার এ রূপও আমাদের দেখিতে হইল, তাহাও রবীন্দ্রনাথের হাতে! রীতিমত কুস্তিগীর পালোয়ানের মত, এই লেখায় রবীন্দ্রনাথ ভাষার সহিত মল্লক্রীড়া করিয়াছেন। যাহার সম্বন্ধে অপূর্ব্ব সংযম রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ, তাঁহার শক্তির অন্তর্লীন সুষমা যাহার মধ্যে চির-প্রকাশ,—অকাল-তারুণ্যের তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বৃদ্ধবয়সে সে ভাষার যে দুর্দ্দশা করিলেন তাহাতে আমরা শুধুই লজ্জা পাই নাই, ত্রাসযুক্ত হইয়াছিলাম। অতি-আধুনিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত বাণী-সাধকের এই পাল্লা দেওয়ার চেষ্টায় আমরা বুঝিয়াছিলাম, এ ভাষার আর নিস্তার নাই, যেটুকু বাকি ছিল রবীন্দ্রনাথই তাহা শেষ করিয়া যাইবেন। 'শেষের কবিতা' পড়িলে ইহাই মনে হয় যে, অতি আধুনিকতার চরমসিদ্ধিকে আগাইয়া আনিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিভার শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষে ব্যয় করিতে চাহিয়াছেন। ভাষা ও ভাবের যে বিজাতীয়তা তরুণেরা রসকল্পনার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না, সেই বিজাতীয় মনোবৃত্তি ও অনুকরণমূলক কাল্‌চারকে একটা জীবিত-রূপ দিবার জন্য তিনি যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা তাঁহার মত কবিরই আয়ত্ত; এবং ভাষাকে অনুরূপ গতি দিবার জন্য তিনি যে বলপ্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। শক্তির prostitution-এর

কথা আমরা শুনিয়া থাকি, কিন্তু এত বড় শক্তির এতখানি আত্মবিস্মৃতি আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। 'শেষের কবিতা' সর্ব্বপ্রকারেই অতি-আধুনিকতার জয়ধ্বনি, এই একখানি পুস্তকের প্রভাব রসাতল-যাত্রীদের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, ভাবের মদোন্মত্ত হাওয়ায় ভাষার তকমা-তাবিজ ছেঁড়ার এমন ভরসা ও আশ্বাস তাহারা আর কোথাও পায় নাই।

৫

বাংলা সাহিত্যে অতি-আধুনিকতার প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়িতেছে, এই কথা ধরিয়া বর্ত্তমান আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই অতি-আধুনিকতার সূচনা কবে হইতে, ইহার উৎপত্তি হইয়াছে কোন্ অবস্থার বশে, এবং ইহার পরিপুষ্টির মূলে আধুনিক কালের একচ্ছত্র সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-প্রভাব ও কবি-প্রভাব কতখানি, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। অতি-আধুনিকতার মূলে প্রচ্ছন্ন ও প্রকটভাবে, অজ্ঞানে ও সজ্ঞানে, যে প্রতিভার বিকৃত প্রেরণা রহিয়াছে, আমার জ্ঞানবিশ্বাস মত তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। এ আলোচনার যে সকল সিদ্ধান্ত আছে তাহা অভ্রান্ত বলিয়া আমিও দাবি করি না; কেবল যে দিকটির আলোচনা করিতে কেহ এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হন নাই, অথচ যাহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য, আমি তাহারই সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সত্যভাষণের সাহস করিয়াছি। আমার মতে যাহা সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে তাহা যদি কিয়দংশে, অথবা সর্ব্বাংশেও অযথার্থ বলিয়া এ সাহিত্যের অপক্ষপাত সমালোচকের মনে হয়, তাহাতে আমার

কোনও আপত্তির কারণ নাই। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে সত্যসন্ধানের অধিকারী; সে সত্য বহুমতসিদ্ধ না হইলেও, প্রত্যেকেরই সত্যসন্ধানে যদি জিজ্ঞাসার আন্তরিকতা থাকে, তবেই ক্রমে সত্যলাভের সম্ভাবনা ঘটে। বাংলা সাহিত্যের এই দুর্দ্দিন যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, যাঁহারা দেশ জাতি ও সাহিত্যের কল্যাণ কামনা করেন, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অনুরাগ বা আনুগত্যের মোহে যাঁহারা বিবেকবুদ্ধির অবমাননা করিতে রাজী নহেন; যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের, বাঙালীর জীবন ও বাঙালী প্রতিভার স্বাস্থ্য কামনা করেন, এবং সে সাহিত্যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের খেয়ালের পরিবর্ত্তে শাশ্বত সারস্বত ধর্ম্মের বিকাশ দেখিতে চান—আমি তাঁহাদেরই দরবারে আমার এই আলোচনা উপস্থিত করিয়াছি। অতি-আধুনিক সাহিত্যের প্রতি সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আর অস্পষ্ট নহে; মধ্যে মধ্যে এ সাহিত্যের প্রশংসার ফাঁকে ফাঁকে তিনি যে সাবধান-বাণী অথবা কূটবাক্য বসাইয়া দেন তাহাতে কাহারও ভুল বুঝিবার অবকাশ থাকে না। রবীন্দ্রৈক-দেবতার উপাসক যাঁহারা, তাঁহারাও এই অতি-আধুনিকতার পক্ষপাতী। ইহার আরও একটা কারণ বোধ হয় এই যে, আজিকার অভিনব কাল্‌চারবিলাসী নব্য ইঙ্গবঙ্গ এ সাহিত্যে বাংলা অক্ষরে অতি-আধুনিক বিলাতী ভাব ও ভাষার ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বলিতে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনাই বোঝে,—যাহার মধ্যে এমন একটি সর্ব্বসংস্কারমুক্তির দীক্ষা আছে যে, বাঙালী বা বাংলা বলিয়া কোন কিছু মানিবার প্রয়োজন হয় না। তথাপি এই অতি-আধুনিকতার প্রসার সম্বন্ধে সজাগ হইবার প্রয়োজন আছে কি? আমি এ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিব, এতখানি আলোচনার পর সে বিষয়ে

বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। সে উত্তর এই যে, বাঙালী জাতি যদি মরিতেই বসিয়া থাকে, তবে এই অতি-আধুনিকতার নামই অন্তিমতা, তজ্জন্য ভাবনা করিয়া লাভ নাই। যদি বাঁচে, তবে এই আবর্জ্জনার ভস্মস্তূপ হইতেই তাহার ভাষা ও সাহিত্য নবজন্ম লাভ করিবে—তখন ভাষার স্বপ্রকৃতি ও সাহিত্যের বিশুদ্ধ প্রাণ-প্রেরণা ফিরিয়া আসিবে; কারণ, এ দুইটি কোথাও পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যে এই অতি-আধুনিকতার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছেন সেজন্য বিস্মিত হইবার কারণ নাই কেন, তাহাই বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

রবীন্দ্রনাথ সহসা এতকাল পরে তাঁহার সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে প্রতিভার পর প্রতিভার আবিষ্কার করিতেছেন, ইহা মনে করিয়া আমাদের নিরতিশয় পুলকিত হইবারই কথা। এতদিন পরে তাঁহার দ্বারা অভিভূত বাংলা সাহিত্যে যে 'স্বকীয়তা'র পরিচয় তিনি পাইতেছেন, তাহাতে আশা হয়, এতদিনে বাংলাসাহিত্য বুঝি রবিগ্রাসমুক্ত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই স্বকীয়তার প্রশংসা করিতে এতই অধীর যে, 'খুসী হইয়াছি' এমন কথা বলিলে পাছে মুরুব্বিয়ানার মত শোনায়, তাই জোড়হস্তে তাহার জন্য মাফ চাহিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, যাহারা এই অতি-আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে, তাহারা কাঁটাগাছের আবাদ করিয়া উপাদেয় ফসলের হানি করিতেছে বলিয়া ক্ষোভ দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রশংসা ও ক্ষোভ প্রকাশের কারণ বোধ হয় এই যে, বাংলা দেশের একশ্রেণী রসজ্ঞানহীন 'দুর্গতগণ' ইহাকে আমল দিতে চাহিতেছে না; তাই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এ কর্ত্তব্যের প্রয়োজন পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, তাঁহার

জীবিতকালে বাংলা সাহিত্যে এমন কোনও ছোট, বড়, বা মাঝারি প্রতিভার উদয় হয় নাই—যাহাদিগকে প্রকাশ্যে অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করার কোনও প্রয়োজন ছিল, কারণ, তাহাদের প্রতিভার বিরুদ্ধবাদী কোনও প্রতিপক্ষ ছিল না; তাই, তাহাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই উপযুক্ত হইয়াছিল। বাঙালী-জাতির চরিত্র দুর্ব্বল; এ দেশ কবির লড়াই ও তর্জ্জার দেশ, তাই এমন উৎকৃষ্ট বস্তুকে তাহারা বিদ্বেষ করে। কিন্তু যে শিষ্টতা, শালীনতা ও চারিত্র্যনিষ্ঠার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এহেন সদ্‌বস্তুর প্রশংসা করেন, অথবা কোনও অসদ্‌বস্তুর অপ্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত, তাহার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র লোভ নাই—যেটুকু মোহ ছিল তাহাও অনেকদিন কাটিয়াছে। বাংলাসাহিত্যের যে অবস্থা চোখে দেখিতেছি, তাহার মূলে এই সকল গুণ আছে বলিয়াই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির প্রাণপণ প্রয়াসে এই নিষ্ঠুরতা ও অশিষ্টতার ধ্বজা তুলিয়াছি। ইহাই আমাদের গর্ব্ব। এ দেশ তর্জ্জা ও কবির লড়াই-এর দেশ বলিয়াই অসভ্য ও চরিত্রহীন হইয়াও আমরা এখনও বাঁচিয়া থাকিবার আশা রাখি, সমগ্র বাঙালী জাতি যদি এই ভূমার খেলায় যোগ দিত, তবে সেই তর্জ্জা ও কবির-লড়াই-রসিক পূর্ব্বপুরুষগণের জলপিণ্ড যে একেবারেই লোপ পাইত!

আমাদের একমাত্র আশ্বাস এই যে, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বাংলা সাহিত্য বড়—রবীন্দ্র-প্রতিভাতেই তাহার শেষ নয়। ইহা যদি সত্য না হয়, বাংলা সাহিত্য রসাতলে যাক—ক্ষতি কি?

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা

(১)

আজকাল নানা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বহু পত্র প্রকাশিত হইতেছে, এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। এ পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অসতর্ক ব্যক্তি-মন অনেক স্থানে অনেক confession করিয়া ফেলিতেছে। এগুলি 'ছিন্নপত্র' নয়, এগুলিতে কবি অপেক্ষা মানুষটির পরিচয় বেশি পাওয়া যায়—তাই ইহা কম লাভ নয়। এই আত্মকথা বলিবার ইচ্ছা তাঁহার অন্যান্য আধুনিক লেখাতে প্রকাশ পাইতেছে। মনে হয়, কবি শেষ-জীবনে নিজের সম্বন্ধে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন—আত্মপ্রকাশের সঙ্কোচ আর টিকিতেছে না। পত্রে এইরূপ ব্যক্তিগত মনোভাবের অভিব্যক্তির কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত অন্যবিধ রচনা হইতে একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

> সাহিত্যই যদি আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হোত তা হ'লে এই কাঁটাবন দিয়েও চলতে হ'ত।···সংসারে যে ক্ষেত্রে ধূলি উড়িয়ে মল্লযুদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল কাটালুম, এমন কি বঙ্গসাহিত্যের গঞ্জন-হাটের মাঝখানে ব'সে সম্পাদকীও করেচি।···এ কথা যদি কবুল করি যে আধুনিক সাহিত্যিক হাটের রাস্তা দিয়ে চলা প্রায় বন্ধ করেচি তা হ'লে আমার এই সঙ্কোচ নিন্দার যোগ্য বলে কেউ মনে করবেন না।

কথাগুলি বেশ ভারী এবং কঠিনও বটে। প্রথম দিকের উক্তিটা সত্যই চিত্তাকর্ষক। 'সাহিত্য তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়'—আজ রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এককালে সাহিত্যই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইহাতে কাহারও কোনও সংশয় থাকিতে পারে না; কবির নিজেরও যে ছিল না, তাহার বহু প্রমাণ সেকালকার কবি-মানসের বহুতর অভিব্যক্তির মধ্যে আছে। এখন, বাংলাসাহিত্য তো নহেই, সাহিত্যই তাঁহার নিকট ছোট হইয়া গিয়াছে, এ কথা নিজ মুখে স্বীকার করায় আর কোনও সংশয়ের কারণ থাকিবে না। অথচ সেদিনও কবি তাঁহার জন্মদিনে যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আর সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া অতিশয় সরল ও স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি কবি—আর কিছু নহেন। দেখা যাইতেছে, সে কথাও যেমন সত্য, এ কথাও তেমনই সত্য; অর্থাৎ কবির মনে তাঁহার নিজের জীবন-মন্ত্র সম্বন্ধে একটা দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা-ভাব কিছুতেই ঘুচিতেছে না। অথচ এ কথাও আমরা বাহির হইতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, তিনি যে 'উচ্চ আদালতে'র কথা অন্যত্র (দিলীপ রায়কে লিখিত পত্রে) উল্লেখ করিয়াছেন—সে আদালতের বিচারে তাঁহার একটি দাবিই সাব্যস্ত হইবে—যে, তিনি কবি; সাহিত্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধন, একমাত্র লক্ষ্য; আর যাহা কিছু, তাহা তাঁহার ব্যক্তিজীবনের অভিমান-প্রসূত মরীচিকা মাত্র।

তথাপি, এ কথারও একটা অর্থ আছে। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে তাঁহার জন্মগত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া একটা আধ্যাত্মিক সত্যোপলব্ধির দিকে বড় বেশি করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কল্পনা এই জগৎকে, এই ধূলামাটির জীবনকেই লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে

পারে নাই ; কবি-প্রতিভার নিবর্ত্তন-কালে, তাঁহার অশান্ত আত্মচিন্তা একটা ধ্রুবতর আশ্রয় সন্ধান করিয়াছে—তাঁহার আত্মপরায়ণ কল্পনা এই জগৎকে উত্তীর্ণ হইয়া বৃহত্তর প্রতিষ্ঠাভূমির সান্ত্বনা লাভ করিতে চাহিয়াছে। সাহিত্য সে সান্ত্বনা দেয় না,—যাহার প্রধান আশ্রয় এই জগৎ ও এই জীবন, তাহাকে ধরিয়া থাকিতে প্রাণ আর চায় না। যাহাকে এককালে শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে বরণ করিয়া তিনি তাঁহার জীবনে চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, জীবনশেষের ছায়ান্ধকারে তিনি তাহাকেই একটা অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু সাহিত্যই যে এককালে তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার কারণ কি ? জীবনে এককালে যাহা সত্য ছিল, আজ তাহা সত্য না হইতে পারে ; কিন্তু আজিকার দিনে যে আর মনোহরণ করে না, একদিন সেই যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল—প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেও সে স্মৃতি যাহাকে বিচলিত করে না, সে কি কখনও ভালবাসিয়াছিল ? রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যলক্ষ্মীকেই একান্ত করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি অস্বীকার করিলেও, তাঁহার যে জীবন কাব্যের অমরতা লাভ করিয়াছে, তাহাকে হত্যা করিবার শক্তি যে তাঁহারও নাই ! এককালে সাহিত্যই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সে কথা তিনি অস্বীকার করিলেও, কাল যে অস্বীকার করিবে না !

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি আমাদের মনে পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের আজিকার এই মনোভাব এই পংক্তিগুলিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শাজাহান যে ভালবাসিয়াছিলেন, কবির মতে সে ভালবাসা মানবাত্মার মুক্তিপথের অন্তরায়—প্রাকৃত জীবন তাহার সেই মহাজীবনের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ।

শাজাহান তাজ গড়িয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকল্পনা এই তুচ্ছকেই আশ্রয় করিয়া, মানবাত্মার সেই অমর-জীবনের একটি উড়ে-পড়া বীজকে শিল্পকীর্ত্তিতে সফল করিয়াছে। প্রেমের চেয়ে এইরূপ আর্ট বড়। কিন্তু আত্মার অবাধ মুক্তগতির পক্ষে এই আর্ট, এই শিল্প-কীর্ত্তিও একটা ভারমাত্র, তাহাকেও পশ্চাতে ফেলিয়া আত্মা অনন্তের পথে নব-নব লোকলোকান্তে মহতো-মহীয়ানের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করে। পংক্তিগুলি এই—

চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখ পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েচ তা ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি 'পরে
তব চিত্ত হ'তে বায়ু-ভরে
কখন্ সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে খসা।
তুমি চলে গেচ্ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেচে অম্বর পানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
যতদূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই!

কবি শাজাহানকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিজের সম্বন্ধেই তাঁহার স্বগতোক্তি। তাঁহার কাব্যকীর্ত্তিকে পিছনে ফেলিয়া তাঁহার আত্মা অসীমের অভিসারে যাত্রা করিতে উৎসুক। যে প্রেম তাঁহার সাহিত্যের প্রেরণা ছিল, যে পথের ধূলার মত তাঁহার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়াছিল—সে ধূলা তিনি ধূলিকেই ফিরাইয়া দিয়াছেন। জীবনের মাল্য হইতে খসিয়া-পড়া যে বীজ 'চিত্ত হ'তে বায়ুভরে' সেই ধূলির উপরে উড়িয়া পড়িয়াছিল—সেই বীজ কাব্যের অমর অঙ্কুরে অম্বর পানে উঠিয়াছে; কিন্তু সে অমর শিল্পকীর্ত্তিও তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবে না—আত্মার মহিমার নিকটে সেও তুচ্ছ। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সাহিত্যই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়।

আত্মসাধনা-পরায়ণ কবির পক্ষে শেষে এই বিশ্বাসই স্বাভাবিক। তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনার পক্ষে হয়তো সাহিত্যের মূল্য এখন কমিয়াছে। কিন্তু এই জগতের সুখদুঃখচঞ্চল মোহ-মুগ্ধ প্রেমিক যাহারা, তাহারা তাজমহলকে প্রেমের তীর্থ-রূপে, এবং তাঁহার কাব্যগুলিকে মরজীবনের অমৃত-উৎস রূপেই পূজা করিবে—সেই কীর্ত্তিকেই তাহারা স্বীকার করিবে। কীর্ত্তির অন্তরালে যে কবি আছেন, তাঁহার কি হইল—লোক-লোকান্তরে তাঁহার আত্মা কতদূরে কোথায় বিচরণ করিতেছে, সে ভাবনা তাহারা করিবে না। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাধনার উচ্চ আদর্শ, এবং তাঁহার রচিত সাহিত্য, এই উভয়ের মূল্য মানুষের পক্ষে যে এক নহে, তাহা আমরাও ভুলিয়া যাই। সাহিত্য যদি রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য না হয়, তাহাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, সে কথা আমাদের পক্ষে সত্য নহে। আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কবি—আর কিছুই নহেন। তাঁহার

যত কিছু রচনা, যত কিছু উক্তির মূল্যবিচার সেই দিক দিয়াই করিব।

এই উক্তির সঙ্গে আর যে কথাগুলি আছে, তাহার আলোচনা এখানে না করিলেই ভাল হইত। তবুও না করিলে নয়। জগতে যিনি যে ক্ষেত্রেই যত বড়, তাঁহার লক্ষ্য একমাত্রই হইতে দেখা যায়, বাকি যাহা কিছু তাহা উপলক্ষ্য মাত্র। সে যাহাই হউক, এককালে কবি বঙ্গসাহিত্যের 'গঞ্জন-হাটে' সম্পাদকী পর্য্যন্ত করিয়াছেন, তবু সাহিত্যই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না বলিয়া, সে পাপ সেইখানেই চুকাইয়া দিয়া মুক্তিস্নান করিয়াছেন। এখন তিনি 'সাহিত্যিক হাটের রাস্তা দিয়ে চলা প্রায় বন্ধ' করিয়াছেন! সাহিত্যই যদি তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে এই কাঁটাবন ভাঙিয়া আজিও চলিতে হইত। এই সকল কথার মধ্যে, তাঁহার জীবন-ভোর বাংলা সাহিত্যের 'গঞ্জন-হাটে' একটা অস্বস্তি-ভোগের আভাস পাওয়া যায়। তিনি এককালে সম্পাদকী করিয়া বাংলা সাহিত্যের যে সেবা করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া এখনও তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠে! তিনি আপনার চিত্তকে বাহিরের সর্ব্ববিধ কলঙ্ক-কলুষ হইতে মুক্ত রাখিতেই তৎপর; বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রের আবহাওয়া এমন অস্বাস্থ্যকর যে, তাহার সম্পর্ক এককালে যেটুকু বাধ্য হইয়া রাখিতে হইয়াছিল তাহার ফল হজম করিতেই তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। এখনও সেই হাটের মাঝখান দিয়া চলিতে যদি না পারেন—আবার এখনকার এই কাঁটাবন ভাঙিতে যদি সঙ্কোচ বোধ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে কেহ দোষ দিবে না। রবীন্দ্রনাথ আজীবন বাংলা সাহিত্যের সেবা কি ভাবে করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বাঙালীর মনে তাঁহার প্রতি যদি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ

জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা এমন রূঢ়ভাবে বিচলিত করা তাঁহার উচিত হয় নাই। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যেখানে ধূলি উড়াইয়া মল্লযুদ্ধ হয়, তাহার যে অংশটা কাঁটাবন—সেখানকার ধূলি উড়াইতে বা কাঁটা বাড়াইতে যাওয়া অবশ্যই তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু তাহার সম্পর্ক হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার এই আগ্রহ, তাহার সম্বন্ধে কেবল একটা সঘৃণ ঔদাসীন্য পোষণ করা, কোনকালেই তাঁহার মত শক্তিমান পুরুষের কর্ত্তব্য নয়। আত্মসমর্থনে তিনি বলিয়াছেন—সাহিত্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। অন্য বৃহত্তর লক্ষ্য কি হইতে পারে তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি; এই উক্তির মধ্যে নৈরাশ্য ও আত্মাভিমান দুই-ই আছে—তাহার কোনটাই এত বড় কবির পক্ষে গৌরবজনক নহে।

মাঘ, ১৩৩৮

(২)

'প্রবাসী'র গত দুই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একজন 'কল্যাণীয়া'কে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার যে মতামত জানাইয়াছেন, তাহাতে আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নূতন কিছু জ্ঞানলাভ করিলাম না। এই কল্যাণীয়া মহিলাটি রবীন্দ্রনাথকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিলেও তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু ভিন্ন-ভাবাপন্না; অথচ তাঁহার চিন্তাশীলতা ও আন্তরিকতা দুই-ই আছে। রবীন্দ্রনাথ এই মহিলাটিকে তাঁহার ধর্ম্মমতের সঙ্কীর্ণতা ও অন্ধ-সংস্কার, এক কথায় তাঁহার হিঁদুয়ানির অজ্ঞানতা সম্বন্ধে সচেতন করিতে উৎসুক, অন্তত আমাদের এইরূপই অনুমান হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের কোনও

বুদ্ধি, বিদ্যা, উৎসাহ বা উপলব্ধি নাই, অতএব মাথাব্যথাও নাই ; কিন্তু কথাটা রূঢ় হইলেও বলা প্রয়োজন মনে করি যে, রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি এবং যত বড় ভাবুকই হউন, আমাদের যদি কোনদিন ধর্ম্মপিপাসা জাগে, যদি কখনও আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনের আগ্রহ হয়, তবে তাহার পথ বাতলাইয়া লইতে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকটে কখনও যাইব না।

পাঁঠা-বলির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নূতন কথা কিছুই বলেন নাই ; ও কথা বড় বেশি পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে দোষ নাই ; সত্য যাহা তাহা অতি পুরাতন, তাহা জীবন্ত-নূতন হইয়া উঠে বক্তার জীবন-সত্যের আলোকে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'পাপটা যেখানকার সেখানেই থেকে যায়, বরঞ্চ কিছু বেড়ে ওঠে। মাঝে থেকে হতভাগা প্রতীকটা পায় দুঃখ।' অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান হিসাবে পাঁঠাবলিটা জীবহত্যা বই আর কিছুই নয় এবং তাহা নিষ্ঠুর বলিয়া সেটা একটা পাপই। বেশ কথা, অতি সত্য কথা ; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাহিরেও জীবহত্যা পাপ কি না ; পাঁঠাটিকে যখন প্রতীকরূপে বলি দেওয়া হয়, কেবল তখনই কি সে 'হতভাগা দুঃখ পায়'? না, কসাইখানাতেও পাইয়া থাকে? তাহা হইলে এই উক্তি হইতে আমরা কি অনুমান করিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ মাংসাশী নহেন? হয়তো সে অনুমান ঠিক নহে, কারণ ওখানে আর একটা বৃহত্তর সত্যের উপলব্ধি করিতে হইবে। খাওয়ার সম্পর্কেও যাহারা কোনও সংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়—তাহার মধ্যেও যাহারা বন্ধন স্বীকার করে, আচার-অনুষ্ঠানের শুচিতা মানিয়া চলে—তাহারা নিজেরাই যে যূপবদ্ধ পশু! প্রাচীন ভারতের ঋষিরা যে মাংসাশী ছিলেন না, তাহার কোনও প্রমাণ আছে? বর্ত্তমানকালে যে ভূখণ্ডে ঋষির সংখ্যা সব চেয়ে বেশি, সেই য়ুরোপ তো খাদ্যাখাদ্য

বিচার করে না, তাহারা ঘোরতর মাংসাশী। তাহা ছাড়া 'যারা জ্ঞানী তাদের তো কোনো ভাবনা নেই, তারা সকল ক্ষেত্রে স্বতই ঠিক পথ চেয়ে চলে।' রবীন্দ্রনাথের মতে—

> যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে সারাজীবন অত্যন্ত শুচি হয়ে কাটালেন, ভাবরসে মগ্ন হয়ে রইলেন, তাঁরা তো নিজেরই পূজো করলেন—তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার, তাঁদের রসসম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত; আর মুক্তি বলে' তাঁরা যদি কিছু পান তবে সেটা তো তাঁদেরই পারলৌকিক কোম্পানির কাগজ।"

আমাদের দেশে পুরাকালে এবং একালেও যে সকল ব্যক্তি আচার-অনুষ্ঠানে শুচিতার পক্ষপাতী তাহাদের কোনও আশাই নাই; যেহেতু তাহারা আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, অতএব তাহারা ধার্ম্মিক আখ্যা পাইবার অথবা মুক্তিলাভের উপযুক্ত নহে, তাহারা ভাল লোক নহে। তাহাদের মুক্তি ইহলৌকিক কোম্পানির কাগজ না হইয়া পারলৌকিক কোম্পানির কাগজ হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা 'নিজেরই পূজা করে' 'তাদের রসসম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত'; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম তাহা নয়, তাঁহার আদর্শ য়ুরোপ, যথা—

> য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দ্বারা তাঁদের কর্ম্মকে মহৎ করে তোলেন,—তাঁরা দূর কালের জন্যে প্রাণপণ করেন; সর্ব্বদেশের জন্যে। তাঁরা যথার্থ ভক্ত।

দূরকাল ও সর্ব্বদেশ না হইলে বিশ্বমানবের উপলব্ধি সম্ভব হয় না। যদি কেবলমাত্র নিজের দেশ, নিজের জাতি ও বর্ত্তমানকাল লইয়াই থাকিতে হয়, তবে তাহা বিশ্বমানবের সেবা নয়। কারণ বিশ্বমানব একটা

খুব বড়, খুব মহান নাম-গোত্রহীন রহস্যময় সত্তা ; কবি নিজের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিয়াছেন—"তিনি কে ?—

—জানি না কে, চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী—

এই বিশ্বমানবের মহিমা কেহ বুঝিল না, বুঝিলে কত সহজে অমৃতকে লাভ করিতে পারিত ! রবীন্দ্রনাথ তাহা করিযাছেন, যথা—

> চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আমার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি—নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিতে চাই, তার মধ্যে অনুভব করতে চাই, আমার মধ্যে সত্য যা কিছু জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমি আমার ছোট-আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড়-আমি, মহান আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি।

এসব কথা তিনি লিখিয়াছেন একজন 'কল্যাণীয়া'কে। কিন্তু এ সাধনার করণ ও উপকরণ কি কি, তাহা তিনি বলিয়া দেন নাই ; একটা কথা বলিয়াছেন বটে—"আমি গোড়া থেকেই একঘরের দলে ভিড়েছি, ঘরের কোণ-বিহারীদের মাঝখানে যারা বেগানা—আমি সেই হা-ঘরেদের খাতায় নাম লিখিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লুম—ঘোরো যারা তারা মারতে আসবে, মারতে এসেই বোরোতে শিখবে।" এ কথা ঠিক, তবু এই যে বেরিয়ে-পড়া, এর রাহা-খরচের হিসাবটা জানাইলে ভাল হইত নাকি ? এ মুক্তির মূল্য কত পরিমাণ কোম্পানির কাগজ তাই ভাবিয়াই যে আমরা 'ঘরের কোণবিহারী' হইয়া আছি। নহিলে "ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিয়ে" আমার মধ্যে "সেই যিনি

বড় আমি, মহান আত্মা"—সেই বিশ্বমানবের ধ্যান করিয়া, তাঁহার স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইতে, অমৃতকে উপলব্ধি করিতে কাহার না সাধ যায়! কিন্তু বিধি যে বাদী—সম্বলের মধ্যে সেই প্রাচীন ভারতের লোটা আর কম্বল; তেমন ভাল আলখাল্লা নাই, মোটর এয়ারোপ্লেন নাই, তেমন খানার আয়োজনও নাই। য়ুরোপীয় ঋষিদের মত আমাদের সে রাষ্ট্রীয় তপস্যা-ফল কোথায়? বিশ্বমানবকে শোষণ করিবার বিরাট যন্ত্র এক দিকে চালনা করার ব্যবস্থা না থাকিলে অপর দিকে সেই শোষণ-রসের অমৃতগন্ধটুকু উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটিবে কেমন করিয়া? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> যে য়ুরোপ শক্তিপূজার বীভৎস আয়োজনে বিজ্ঞানের খর্পরে নর-রক্তের অর্ঘ্য রচনা করেছে সেই য়ুরোপ জানে না—বাহিরের যন্ত্র মনের দৈন্য তাড়াতে পারে না, যন্ত্রযোগে শান্তি গড়বার চেষ্টা বিড়ম্বনা।

যদিও আবার সেই সঙ্গেই ইহাও বলিয়াছেন যে—

> যে য়ুরোপ জ্ঞানকে সংস্কার-মুক্ত ক'রে কর্ম্মকে বিশ্বসেবার অনুকূল করেছে সেই য়ুরোপ উপনিষদের মন্ত্রশিষ্য, তা সে জানুক বা না জানুক।

অর্থাৎ য়ুরোপ শক্তিপূজাও করে, আবার উপনিষদও মানে—য়ুরোপের আত্মার দুইটা ভাগ আছে। রবীন্দ্রনাথ একটাকে স্বীকার করেন, আর একটাকে করেন না। কিন্তু এমন হইতে পারে না—ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। আত্মার দুই তলা থাকিতে পারে—নীচের তলায় শক্তি-পূজার আয়োজন হয়, উপরের তলায় উপনিষদ-চর্চ্চা হইয়া থাকে; একটা নীচে না থাকিলে অপরটি উপরে থাকিতে পারে না। কাজেই য়ুরোপকে যদি এতই ভাল লাগিয়া থাকে, তবে কাঁটা বাদ দিয়া শুধুই তাহার ফুল শুঁকিলে চলে কি? কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ফুলই ভালবাসেন, কাঁটা সহ্য

করিতে পারেন না। তাই য়ুরোপের গুণ্ডাদের ত্যাগ করিয়া ঋষিদের সঙ্গে গুরুভাই পাতাইয়াছেন।

এই ঋষিদের কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। কি বর্ত্তমানে কি অতীতে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ কোনও ঋষির সাক্ষাৎ পান নাই—এক সেই উপনিষদ ছাড়া। যেমন Theology শিখাইতে Medville College-এ ছাত্র পাঠাইতে হয়, তেমনই ঋষি বা সাধু-সঙ্গমের জন্যও য়ুরোপেই তীর্থযাত্রা করা উচিত; অন্যত্র আর কোথাও এত ঋষি তো নাই!—

> সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাদের বেশী দেখলুম, কিন্তু তারা যে দেশে থাকে সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্ব্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক এই আমার কামনা।

এর চেয়ে স্পষ্ট করিয়া নিজ দেশের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ বোধ করি আর কোথাও প্রকাশ করেন নাই। এত উচ্চভাবের স্ববারি আমরা আর কোথাও দেখি নাই।—ইহারই নাম বিশ্বমানব-পূজা, ইহারই সাধন-পন্থা বিশ্বপরিশীলনচর্চ্চা! সেই বিশ্বমানব য়ুরোপেরই এক অংশে প্রকাশ পাইয়াছেন, তিনি সেইখানেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন; দেশে কোথাও তাঁহার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই—দেশে তাঁহার অপ্রকাশের দিকটাই তিনি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং সেজন্য দেশ তাঁহাকে অতিশয় পীড়া দেয়। তাই বার বার দেশ ছাড়িয়া তিনি বিদেশে ছুটিয়া যান। তিনি বলেন—

> য়ুরোপে যে অংশে তিনি সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েছেন সেখানে আমি আনন্দ করি, আমাদের দেশে যে অংশে তিনি মুগ্ধ, আচারে আচ্ছন্ন সেখানে আমার মন অত্যন্ত পীড়িত।

বাছাই করিবার কি অসাধারণ ক্ষমতা! আনন্দ করিবার জন্য য়ুরোপের অংশবিশেষ, এবং পীড়াবোধের জন্য দেশের অংশবিশেষ তিনি বাছাই করিয়া লন!

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে উপনিষদকে একদা বাংলা দেশের নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিলেন রামমোহন রায়ের জাল-করা, যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার···যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব···ইত্যাদি।

আরও যোগ করা যায়—যে উপনিষদের 'কবি-প্রাণনা'য় রবীন্দ্রদেব বিশ্বমানব হইয়াছেন, এবং য়ুরোপে সেই ঋষিদের আধুনিক সংস্করণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বড় ভাল কথা, বড় যথার্থ কথা। কিন্তু বাংলা দেশ তো উপনিষদ কখনও মানে নাই, এখনও মানে না। এই বর্ব্বর অনার্য্য-অধ্যুষিত দেশে উপনিষদের বাণী প্রচার করিয়া রামমোহন রায় জাতির যে উপকার করিয়াছেন, তাহা তো এখনও আমরা চাক্ষুষ করিতেছি না; কয়েকজন সমাজত্যাগী শৌখিন বাবু মার্জ্জিত চশমার আড়াল হইতে উপনিষদের জ্যোতিবিচ্ছুরিত স্তিমিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন বটে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত জাতির জীবনে, তাহার রাষ্ট্রচেতনায়, তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠানে, তাহার সমাজ-জীবনে—কোথায়ও উপনিষদের মন্ত্র-প্রভাব তো আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। বরং, এ জাতির ধর্ম্মে-কর্ম্মে, প্রাণের প্রবৃত্তি ও মনের উৎসাহে যদি কোনও নবজীবনের সাড়া জাগিয়া থাকে তবে তাহার উৎস সন্ধান করিতে হয় অন্যত্র—অন্য মহাপুরুষের অনুপ্রাণনায়। বাংলা দেশে উপনিষদের আবিষ্কার না হয় রামমোহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের অন্যান্য দেশে উপনিষদের চর্চ্চা নিশ্চয় একেবারে লোপ

পায় নাই, তাহারা উপনিষদের মন্ত্রে কতখানি সাড়া দিয়াছে? ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিভিন্ন যুগে যে নব-নব ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্ম-গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে উপনিষদ কি কাজ করিয়াছে? বাংলা দেশ উপনিষদকে যদি গ্রহণ না করিয়া থাকে, তবে ভালই করিয়াছে, কারণ, ধর্ম্ম পুঁথিগত ভাব-সাধনা নয়; জাতির জীবনগত সাধনা। ভারতবর্ষে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও তৎসমুদয়ের আদর্শমূলক যে ধর্ম্ম-সাধনার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার মন্ত্র পরবর্ত্তী বহু জাতির রক্তধারা ও ভাবধারার সমন্বয়-প্রসূত। স্বভাব ও স্বধর্ম্মের গতি-প্রকৃতির নিয়মে যে ধর্ম্ম স্বতঃপ্রবর্ত্তিত ও স্বতঃনিয়ন্ত্রিত হইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রতিপদে জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়াছে—তাহা কখনও জাতির ঐতিহ্য বা লোকধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করে নাই। জাতির সেই জীবন-ধর্ম্মী আত্মাকে কোনও নিছক ভাববাদ বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যদর্পিত বিশ্বমানববাদ কখনও পুষ্ট বা তৃপ্ত করিতে পারে না। রামমোহন রায় কর্ত্তৃক উপনিষদ আবিষ্কার বাংলার যে সম্প্রদায়েরই মহাগৌরবের বস্তু হউক, কয়েকজন জাতি-ধর্ম্মহীন কুলচুর-বিলাসী অন্তঃসারশূন্য অপদার্থ বাবু তাহা লইয়া যতই আস্ফালন করুক, এ যুগেও উপনিষদ কাহারও প্রাণকে সঞ্জীবিত করে নাই। যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই কর্ম্ম-সাধনার যুগে, কেবল বাংলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে যে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ধর্ম্মপিপাসু গৃহী, অথবা জাতিপ্রেমিক কর্ম্মী ও মনীষীর প্রাণে-মনে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, সে গ্রন্থ 'গীতা'। এ যুগে ইহার পঠন-পাঠন, টীকা-ভাষ্য এবং প্রচার-প্রচেষ্টার অন্ত নাই। ভারতে যে বিশেষ ধর্ম্ম এখন লোকধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহার প্রভাবে ভারতের নানা স্থানে নরদেবতার অসংখ্য আবির্ভাব

দেখিতেছি—প্রেমে কর্ম্মে ও ত্যাগে মানুষের জীবনে যে মহাকাব্যের মহিমা দেখিতেছি—সেই ধর্ম্মের যাঁহারা গুরু, তাঁহারা এই গীতাকেই সুগীতা করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলা দেশে এই গীতার আদর অনেক দিন হইতে দেখা দিয়াছে, কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষ তাহাকে লইয়া বহু বিদ্রূপ করিয়াছে—বাংলা সাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে। 'গীতা' হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া তাহা এখনও অস্পৃশ্য হইয়া আছে; অন্তত এই উপনিষদ্-ধ্বজীরা কখনও গীতার নামোল্লেখ করেন না—তাহার আলোচনা বা চর্চ্চা তো দূরের কথা। সত্য কথা বড়ই অপ্রিয় হয় জানি—কিন্তু সত্যকে চোখ বুজিয়া অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মুখে আমরা কখনও গীতার শ্লোক শুনি নাই। তাহাতে দুঃখ করি না, কারণ 'গীতা'কে যাঁহারা মাথায় করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাই আজ এ জাতির ইহ-পরত্রের কাণ্ডারী—সমগ্র ভারত আজ তাঁহাদের চরণে মাথা রাখিয়া ধন্য হইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিরদিন মাথায় করিয়া রাখিব—কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায়, তাহা আমরা ভালরূপই জানি।

আর একটা কথা। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ হইতে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, এবং প্রাচীন ভারতের সেই বাণীকে শ্রদ্ধা করেন বলিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করেন। কিন্তু ঐ শ্লোক-গুলির যে ব্যাখ্যা তিনি করিয়া থাকেন, তাহা কি সেই ঋষিদের মনের কথা, না নিজের মনোমত করিয়া সেগুলির তিনি নূতনতর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন? উপনিষদের যে আসল তত্ত্বকথা, তাহা কি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানববাদের সমর্থন করে? তাঁহার মৌলিক কবি-কল্পনার সাহায্যে, তাঁহার নিজেরই আত্মগত ভাবসাধনার রূপে, তিনি উপনিষদকে আত্মসাৎ

করিবার অধিকারী হইতে পারেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রে উপনিষদের শ্লোক নয়, রবীন্দ্রকৃত ভাষ্যই আসল বস্তু—তাহার ঋষি রবীন্দ্রনাথ নিজেই, তাহা আসলে রবীন্দ্রোপনিষৎ। তাঁহার নিজের ভাবসাধনার পক্ষে যাহা উপাদেয়, তাহাকে উপনিষদের শ্লোকে মণ্ডিত করিয়া স্বপক্ষে উপনিষদের সাক্ষ্য এমন ভাবে খাড়া করিয়া, অজ্ঞ জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার এই অধ্যবসায় কি তাঁহার মত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেও উচিত? উপনিষদের আত্মতত্ত্ব যে এইরূপ বিশ্বমানবতার মন্ত্র নয়, য়ুরোপীয় ঋষিগণও যে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষপাতী নহেন, তাহা য়ুরোপীয় চিন্তা ও সাধনার ইতিহাস যাঁহারা এতটুকু জানেন, এবং ভারতের চিন্তার বৈশিষ্ট্য যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কি অপূর্ব্ব মনস্বিতা!—তাঁহার হাতে পড়িয়া আজ উপনিষদকে কবুল করিতে হইতেছে যে, বুদ্ধও তাহারই ভক্তিমান শিষ্য, এবং আধুনিক য়ুরোপের বিশ্বপ্রেমিকেরা তাহারই বিশ্ব-ব্রহ্মবাদের তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞাতসারে আত্মসাৎ করিয়াছে। উপনিষদের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়ের কারণ আছে—যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকারী তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই আমি এ কথার উল্লেখ করিলাম। উপনিষদ, রবীন্দ্রনাথ বা সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি নয়; ভারতীয় ভাবসাধনা ও তত্ত্বসন্ধানের যে মৌলিক প্রতিভা তাহাকে এত মূল্যবান করিয়াছে—ব্যক্তিবিশেষের আত্মভাব-সাধনার দলিল-রূপে তাহার সেই গৌরব হ্রাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

বৈশাখ, ১৩৩৯

রবীন্দ্রকাব্য-প্রেরণা—পরিণাম ও পুরস্কার

(১)

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে গিয়া 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র চর্চ্চা কেবল সঙ্গত নয়, কর্ত্তব্যও বটে ; কিন্তু যৌবনের পুষ্পোদ্যানটিকেও তথায় তুলিয়া লইয়া গিয়া চম্পক-শাখায় হরতকী ফলাইবার চেষ্টা শুধুই হাস্যকর নহে, মিথ্যাচারও বটে। রবীন্দ্রনাথ যে অধুনা কবি হওয়া অপেক্ষা ঋষি হওয়ার দিকে ঝুঁকিয়াছেন তাহা আমরা জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে, ষোল বৎসর বয়স হইতে সত্তর পর্য্যন্ত তিনি যে কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই—করিয়াছেন, এই কথাটি আমাদিগকে বিশ্বাস করাইবার জন্য এ সাধ্য-সাধনা কেন? রবীন্দ্রনাথ পত্রচ্ছলে লিখিয়াছেন—

> এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু কবি বললেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের, এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোনখানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সেও আমি জানি। আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে ও ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং মানুষ অব্যক্তে।

"কবির প্রেরণা কিসের, এবং তাহার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্‌খানে এর একটা পরিষ্কার জবাব চাই"—তাহারই জবাবে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলি বলিয়াছেন। জবাবটি যে পরম উপাদেয়, সে বিষয়ে আশা করি দুই মত হইতে পারে না, কিন্তু জবাবটিতে বড় বিলম্ব ঘটিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা তাঁহার কাব্য পড়িয়াছিল

তাহারা নিশ্চয়ই এ রহস্য জানিত না। তবে কি, কবির 'সাধনার শেষ ঠিকানা' না জানায়, 'কবির প্রেরণা কিসের' তাহা সম্যক বুঝিতে না পারিয়া, তাহারা কাব্যরস আস্বাদনে বঞ্চিত ছিল? তাহারা যখন যে কবিতা পড়িয়াছে সেই কবিতার প্রেরণা কবিতাকেও অতিক্রম করিয়া কবির নিজস্ব ব্যক্তিগত সাধনায় কোথায় গিয়া পৌঁছিবে—সে সংবাদের অপেক্ষা তাহারা কি রাখিত? না, এক একটি কবিতার মধ্যে যে রসসৃষ্টি সম্পূর্ণ হইয়া আছে তাহাতেই তাহারা পরিতৃপ্ত হইত? কবির এই দুর্দ্দম ঋষিত্ব-প্রেরণার পরিচয় যাহারা পায় নাই, কোন্ ঘাটে তাঁহার তরী আসিয়া ভিড়িয়াছে তাহা জানিবার সুযোগ যাহাদের হয় নাই, যাহারা ইতিমধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে, সেই দুর্ভাগাগণ কি অন্ধকারেই ঘুরিয়া মরিল? রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাগুলি যে ফলের ফুল সেই ফল যখন তাহারা দেখিল না, তখন ফুলের গন্ধ-মধুর কি অসম্পূর্ণ পরিচয়ই তাহারা পাইয়াছে! রবীন্দ্রনাথের সব অনুভূতির ধারা যে-মানবের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে মানব তখনও প্রকট হইয়া উঠেন নাই—উঠিলে, কি ভূমানন্দই তাহারা ভোগ করিতে পারিত! তাহারা 'রবীন্দ্রনাথ'-কাব্যের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠাই পড়িয়াছে; একটিও সম্পূর্ণ কবিতা পড়ে নাই—সে সকল কবিতা বিচ্ছিন্ন পংক্তি মাত্র। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কবিতা পড়িলেই হইবে না, আমাকে পড়; আমার শেষ না পাইলে আমার কবিতার শেষ পাইবে না।

কবি একটি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন—

বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমলে'র যে একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

"মানুষের (sic) মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

> তার মানে হচ্চে, এই মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডিগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারিনে। স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি করে' নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না, কেন না অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্ব্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।

—'তার মানে হচ্চে'—শুনিলেই ভয় করে! কবি এখন একাধারে কালিদাস ও মল্লিনাথ। সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে কবিকেও কি এমন মরা মরিতে হয়! রবীন্দ্রনাথের কি একবারও মনে হইল না যে, তিনি বুড়া হইলেও তাঁহার কবিতা বুড়া হয় নাই? সেই চির-যৌবনা অপ্সরীকে এমন করিয়া নিজের সঙ্গে সহমরণে বাঁধিতে চাহিলে সে শুনিবে কেন? 'কড়ি ও কোমলে'র ঐ কবিতাটির উপর অত্যাচার না করিয়া তাঁহার আধুনিক কালের কোনও শুক্লকেশিনীকে বাছিয়া লইলেই তো ভাল হইত! কিন্তু তিনি যে প্রমাণ করিতে চান—কবিতার হবিষ্যান্নই তিনি আজীবন পাক করিয়াছেন! হায় 'মানব'! তুমি তখন 'প্রাণের খেলায় তরঙ্গিত' হইতে—'বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়'! তুমি তো তখন 'নিখিল-মানব' হইয়া উঠিতে পার নাই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই 'নিখিল-মানব' বহুবচন নয়—একমেবাদ্বিতীয়ং, যথা—"আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই"। এ সেই ব্রহ্মণ—একেবারে **neuter gender**। 'স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি করে এঁকে ঠেকিয়ে রাখা' তাঁহার অসাধ্য। কবির মনে আজকাল স্বাজাত্যের বিভীষিকা এতই বেশি যে, পাছে, মানুষকে ভালবাসার কথায় স্বদেশ-বিদেশের কথাও আসিয়া পড়ে, তাই সমগ্র

মানবগোষ্ঠীকে পিণ্ডীভূত করিয়া তাহার ব্রহ্মনির্য্যাসটুকুই তিনি পেটেণ্ট করিয়া লইয়াছেন।

'কড়ি ও কোমলে'র সেই কবিতাটি নাকি এই ব্রহ্ম-নির্য্যাসভরা একটি শিশি। পাঠকগণ মূল কবিতাটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে', 'এই সূর্য্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে' 'জীবন্ত হৃদয় মাঝে', 'মানবের সুখে দুঃখে', 'তোমাদেরি মাঝখানে'— এ সকলের 'মানে হচ্ছে'—'মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই।' কেন না, অমরতা তাঁহারই মধ্যে যে মানব 'সর্ব্বলোকে',—'এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে' নয়! 'জীবন্ত হৃদয় মাঝেও' নয়, কারণ তাহা হইলে যে সত্যই মরিতে হইবে—'জীবন্ত হৃদয়' তো জীবন্ত বলিয়াই একদিন মরিতে বাধ্য। 'তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল, তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই'—এ কথারও বোধ হয় অর্থ—'যেখানে মানুষ অমর সেইখানে'। অপূর্ব্ব!

কিন্তু এ রোগের কি ঔষধ আছে? রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, তিনি যাহার জনক তাহাকে গলা টিপিয়া মারিবার অধিকারও তাঁহার আছে।

এককালে মানুষকে মানুষের চক্ষে দেখিয়া, মানুষের প্রেমকেই মহিমান্বিত করিয়া নির্ব্বিশেষ নিখিল-মানবের পরিবর্ত্তে এই দেহধারী বিশেষ-দেবতার বন্দনা করিয়া তিনি যে পাপ-কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার দায়িত্ব কি এমনই করিয়া অস্বীকার করা যায়? এই আত্ম-পরায়ণতার মোহে তিনি তাঁহার এককালের যথার্থ কবিত্বের উপর আজকাল যে অত্যাচার স্বরু করিয়াছেন, তাহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। পুরানো নাটকগুলিকে ক্রমাগত ভাঙিয়া যে ভাবে তাহাদের মুণ্ডপাত করিতেছেন, তাহাতে কাহার না দুঃখ হয়? এখন আবার সেকালের কবিতাগুলিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, তাঁহার নিজেরই সেই ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি বা সত্য হইল!—

পরজন্ম সত্য হ'লে
কি ঘটে মোর সেটা জানি,
আবার আমায় টানবে ধ'রে
বাংলাদেশের এ রাজধানী।

যে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে পাতে,
আমার ভাগ্যে হ'ব আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।
আমায় হয় ত' করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

অতএব সাধু সাবধান! রবীন্দ্রনাথের যে জন্মান্তর ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন রবীন্দ্রনাথের হাত হইতেই রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলিকে বাঁচাইবার জন্য সকলের অবহিত হইতে হইবে।

(২)

এবারকার একটা অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তিনি কবি, আনন্দদানই তাঁহার কাজ, অতএব প্রতিদানে কেবল প্রেমই তাঁহার প্রাপ্য। বড় ভাল কথা। আদান-প্রদানের দুই দিকই বেশ সরল সহজ নয় কি? কাব্য যাহার ভাল লাগে সেই কবিকে ভালবাসে। ইহার অর্থ কিন্তু ইহাই নয় যে, কবিকে কাব্য হইতে পৃথক করিয়া ভালবাসিতে হইবে। কাব্যের মধ্যে যদি কবিই ব্যক্ত হন, মানুষটি অব্যক্ত থাকেন, তাহা হইলে আনন্দও যেমন সুলভ হয়, প্রতিদানে ভালবাসাও তেমনই সহজ হইয়া উঠে। কিন্তু অব্যক্ত মানুষটি যেখানে বেশিমাত্রায় ব্যক্ত হইতে চান, এবং কাব্যের বাহিরেও যদি ব্যক্তিটি নানা ভঙ্গিতে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তাহা হইলে এই প্রেম অবিচলিত থাকিতে পারে না। আবার যদি কবির সঙ্গে ব্যক্তিটিকেও অভিন্ন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা হইলে অন্তত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বাধা বিস্তর। কারণ, যে দিক দিয়াই হউক, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসা সম্ভব হইলেও, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার সেই ব্যক্তিত্বকে এমন 'অব্যক্ত' করিবার পক্ষপাতী—শুধু ব্যক্তিপ্রেম নয়, স্বাজাত্যবোধকেও অস্বীকার করিয়া 'নিখিল-মানবে'র ধ্যানে এমন নিমগ্ন যে, সেখানে মানবীয় সংস্কারের ভালবাসা পৌছিতে পথ পায় না। এমত অবস্থায় কাব্যগত

কবিটিকে ধরি-ধরি করিয়াও ধরা যায় না। তিনি নিজ কাব্যের যে টীকা-ভাষ্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে সে কাব্যে মানুষের পাঞ্চভৌতিক সত্তাই লোপ পাইতে বসিয়াছে। এ অবস্থায় প্রেম যে পথ খুঁজিয়া পায় না! কবিকে ভালবাসা আগেকার কালে সহজ ছিল; কারণ, তখন কবিতার শ্লোকেই কবির পরিচয় নিবদ্ধ ছিল—সে কবিতায় কোনও আধ্যাত্মিক মতবাদ, কোনও স্বতন্ত্র আদর্শ-সাধনা, কোনও ব্যক্তি-ধর্ম্মের ঘোষণা থাকিত না।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রেম দাবি করিয়াছেন, তাহা কবি-ব্যক্তির প্রতি প্রেম বলিয়াই মনে হয়। কাব্যে যিনি আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন তিনি অবশ্যই কবি—কিন্তু সেই আনন্দের প্রতিদানে যিনি প্রেম চাহিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় কেবল কবি নহেন, মানুষও বটে; এ প্রেম সেই ব্যক্তির প্রতিই প্রেম বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভালবাসিতে হইলে রক্তমাংসের মানুষ চাই—উভয় পক্ষেই। কবি আনন্দ দেন বলিয়াই কবি-ব্যক্তিটিকে প্রেম করার প্রয়োজন হয় না—কবি-ব্যক্তির সহিত কাব্যের কবিমানসের কোনও সম্পর্ক নাই; তাই কবিতা ভাল লাগে বলিয়া মানুষটিকে ভাল লাগিবে এমন কোনও কথা নাই। দেখা যায়, যাহারা এই কবি-মানুষটিকে লইয়াই নাচে, তাহারাই কবিতার ভাবনা সবচেয়ে কম ভাবে। আবার ইহাও দেখা যায়, যে কবি যত যথার্থ কবি তিনি জন-সমাদরে তত উদাসীন। রবীন্দ্রনাথও যদি এই জন-সমাদরই বিশেষ করিয়া চাহিতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি এত বড় কবি হইতে পারিতেন না। কিন্তু আজ তাঁহার সেই কবিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, তাই জন-সমাদরের প্রতি তাঁহার লোভ আর চাপা থাকিতেছে না। কে কোথায় তাঁহার কবিতার ছল ধরিতেছে, কাহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে না

বলিয়া ভয় দেখাইতেছে, কোন্ দলকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন্ দলের প্রীতি সাধন করিতে হইবে—এই সকল ভাবনা তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে। তিনি এখন নিজ কাব্যের মূল্য নিজেই নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে—সে কাব্যের আদি ও শেষ-প্রেরণার সঙ্গতিসাধন করিতে, সকল কালের সকল কবিতায় সেই এক ঋষিমন্ত্রের বিকাশ বুঝাইয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

জানি, অনেকেই বলিবেন, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁহার কবিকর্ম্মের পুরস্কার-স্বরূপ দেশের কাছে একটু প্রেমই দাবি করিয়া থাকেন, তাহাতে এত কথা বলবার প্রয়োজন কি? কবির পক্ষে এইটুকু দুর্ব্বলতা কি অতিশয় স্বাভাবিক নয়? কিন্তু যাঁহারা উক্ত প্রতিভাষণটি ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, কথাটা শুধু ইহাই নয়। রবীন্দ্রনাথ জানেন, তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে আশানুরূপ প্রীতির উদ্রেক করিতে পারেন নাই; এবং ইহাও আমরা জানি যে, তিনি তাঁহার কাব্যের যথার্থ সমালোচনা পছন্দ করেন না। তাঁহার অভিভাষণের এক স্থলে ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও আছে। প্রথমটির সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহার কাব্যে জনমনমোহিনী কল্পনার অবকাশ খুবই অল্প—কাব্যে যে হৃদয়-ঘনিষ্ঠ ভাবসংস্কারের আন্দোলনে সাধারণ মানুষের প্রাণ সাড়া দেয়, সেই স্থূল সুখ-দুঃখ হর্ষ-শোক তাঁহার কাব্যের প্রধান প্রেরণা নয়; এ কারণ, যে জন-সমাদর তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন তাহা তাঁহার প্রাপ্য নয়। সেজন্য দুঃখ করাও উচিত নহে। কবিকে মানুষ ভালবাসে যে গুণে, ঠিক সেই গুণ তাঁহার কাব্যে নাই; কিন্তু কবিতাকে ভালবাসিবার মত যথেষ্ট গুণ তাঁহার কাব্যে আছে; সে ভালবাসা—প্রেম নয়, সূক্ষ্ম রসবোধের অপেক্ষা রাখে। অতএব যাহারা তাঁহার কাব্যকে ভালবাসে, তাহারা যথার্থই কাব্য-প্রেমিক। কিন্তু এ ভালবাসা ব্যক্তি-সম্পর্কের ভালবাসা

নয় বলিয়াই তাহারা তাঁহার কবিতাকে তাঁহার কবিতা বলিয়াই ভালবাসিবে না—তাঁহার সকল কবিতাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবে না। তাহাতে যদি কবির প্রতি প্রেমের অভাব প্রকাশ পায়, তাহাতে কবির আত্মাভিমানে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু চিরন্তনী কাব্যসুন্দরীর তাহাতে কোনও অমর্য্যাদা হইবে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিব। রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' নামক কবিতাটি একটি অতি উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয় কবিতা বলিয়াই আমরা জানি। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাভঙ্গী, তাঁহার জন্মগত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, একটা ভাব-বিরোধের মধ্যে পড়িয়া আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটি জনপ্রিয় হইবার কারণ, উহার কতকগুলি পংক্তিতে তিনি বাস্তব-জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশার ওজস্বিনী বর্ণনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং তাহার প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন—

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি' চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি',
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া! সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,

দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ;

—শুনিলে মানুষ মাত্রেরই হৃদয় সাড়া দেয়, মনুষ্যত্ব-পিপাসা জাগে। কবি তাঁহার নির্জ্জনবাসিনী আত্মমুগ্ধা কল্পনাকে জনতা-জীবনের দিকে ফিরাইবার জন্য কবিতালক্ষ্মীর নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইয়া এই কবিতাটি আরম্ভ করিয়াছেন। বেশ বুঝা যায়, ব্যক্তিগত আদর্শের সজ্ঞান সাধনায় তিনিও মাঝে মাঝে কুণ্ঠা বোধ করেন ; তাঁহার জ্ঞান যেন অতি উচ্চ ভাবসাধনাতেই নিঃশেষ না হয়, বাস্তব জীবন-সংগ্রামে তাহা যেন মানুষের প্রাণে আশা উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চার করে—এমন ইচ্ছাও হয়। কিন্তু, এই কবিতাটিতেই আমরা দেখিতে পাই, এ প্রবৃত্তি তাঁহার কবিতার পক্ষে সম্ভব নয় ; তাহার সে প্রেরণা অতি শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া যায় ; কিয়ৎক্ষণ মাত্র এই বাস্তব দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা, এই আর্ত্তত্রাণব্রতের মানবপ্রেম ঘোষণা করিয়া তাঁহার কবিতা আবার সেই ব্যক্তি-স্বপ্ন, সেই লোকাতীত আদর্শচর্য্যা, সেই 'বিশ্বপ্রিয়া' ও 'নিরুপমা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী'র ধ্যানে এই ধরা ছাড়িয়া ঊর্দ্ধ স্বর্গে উন্মার্গগামী হয়। কোথায় বাস্তব জগতের বাস্তব দুঃখের প্রতিকার-বাসনা, আর কোথায় সুদূর নক্ষত্র-লোকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া কেবল আত্মগত আদর্শের সত্যনিষ্ঠাভিমানের জয়যাত্রা !—

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যের করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুতে করি না শঙ্কা ! দুর্দ্দিনের অশ্রু জলধারা

মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে,—জীবনসর্ব্বস্ব ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি! কে সে? জানি না কে! চিনি নাই তারে,
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি' রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপ খানি!

কিন্তু কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কবি বলিতেছেন—

সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,—

অথচ ইহার জন্য তিনি মানুষকে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চান, তাহাতে জনহিতৈষণা অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-সাধনার আত্মনিষ্ঠা অথবা আধ্যাত্মিক সত্য-পিপাসার আবেগই প্রবল। এই সকল মূঢ় মূক ম্লান মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার পক্ষে—প্রাণ, স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু প্রভৃতি লাভের পক্ষে—খ্রীষ্ট, চৈতন্য, বুদ্ধ, গ্যালিলিও, লুথারের সত্য-সাধনা কতখানি উপযোগী? সে সকল মহাপুরুষের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক চরিত্র-মহিমা মানুষের জীবনকে যে দিক দিয়া যে ভাবে অনুপ্রাণিত করে, সাংসারিক দুর্দ্দশা-মোচনের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কতটুকু? সম্মুখেতে যে কষ্টের সংসার রহিয়াছে, তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হইলে কি এইরূপ সত্য-সাধনার পন্থাই উপযুক্ত? বরং এই একটি অতি সহজ সত্য আমরা জানি যে, মানুষের দুঃখমোচন-ব্রত যিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার

কাছে এই প্রত্যক্ষ নরমূর্ত্তি ছাড়া আর কোনও নারায়ণ থাকিতে পারে না; তাঁহার কাছে, বিশ্বমানব, বিশ্বজীবন বা বিশ্বপ্রিয়া প্রভৃতি যাবতীয় ধারণা কল্পনাবিলাসমাত্র: তিনি নিজ ইষ্টদেবতার সাযুজ্য লাভ বা কোনরূপ স্বর্গ কামনা করেন না—নিরুপমা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর ধ্যানও করেন না। তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা হয় এই—

> ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং।
> কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণীনামার্ত্তিনাশনং॥

অতএব দেখা যাইতেছে, এই কবিতাটি যেন পূর্ব্বমুখে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, সহসা মধ্যপথে পশ্চিমমুখে ফিরিয়াছে; অর্থাৎ যেদিকে ছিল সেই দিকেই ফিরিয়া গিয়াছে। 'এবার ফিরাও মোরে—' কবির আবেদন তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী মঞ্জুর করেন নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, বরং কবিকল্পনা এখানে স্বধর্ম্মই পালন করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, এই কবিতাটির মধ্যে যে সুস্পষ্ট ভাব-বিরোধ ঘটিয়াছে, তাহাতে ইহাকে একটি সুপরিকল্পিত, সুসম্বন্ধ বা সুসম্পূর্ণ কবি-কীর্ত্তি বলা যায় না। কিন্তু না বলিলেও রক্ষা নাই। উহার মধ্যে কত ভাল ভাল sentiment উৎকৃষ্ট বাক্যবিন্যাস! এবং অপূর্ব্ব ছন্দ-ঝঙ্কার রহিয়াছে—তাহাতে কোন্ বাঙালী পাঠক মুগ্ধ না হইবে? যে মুগ্ধ না হয় সে শুধুই হতভাগ্য নয়, দুর্ব্বৃত্তও বটে—রসের আবার বিশ্লেষণ করে! কাব্যরস যে ফুলের গন্ধের মত—তাহা কি বুঝিবার বা বুঝাইবার? কবিতায় ভাব-বিরোধ হইলেই বা! সকল ভাব কি সেই এক রসে গিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায় না? তাহা ছাড়া, কবি যদি বড় কবি হন, তাহা হইলে তাঁহার সকল কবিতাই বড় কবিতা। এমন করিয়া সমালোচনা করিলে কবিকে প্রেম করা হয় না।

এই প্রেম-নিবেদনের প্রসঙ্গে সবশেষে একটা কথা বলিব। রবীন্দ্রনাথকে এযুগের বাংলা সাহিত্যিক যে প্রেম নিবেদন করিয়াছে, তাহার তুল্য প্রেম আর কোন্ কবি পাইয়াছেন? আর কোন্ সাহিত্যে এক যুগ ধরিয়া আর কোন্ কবির—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই অকথিত বাণী এমন ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে? রবীন্দ্রোত্তর বাংলাসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছে—সে সাহিত্যের আর কোনও ধর্ম্ম নাই—সে রবীন্দ্রময় হইয়াছে; তাই একালের বাংলাসাহিত্য সেই সকল সাহিত্যিকগণের মুখ দিয়া যথার্থই বলিতে পারে—'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরও কি তোমার চাই!'

মাঘ, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র

শরৎচন্দ্রকে বাড়াইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রতিভার প্রতি যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহার জন্য সম্প্রতি একখানি পত্রিকায় কোন এক লেখক বিস্তর দুঃখ করিয়াছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের এই মত-পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা লেখকের সহৃদয়তার প্রশংসা করিলেও সুবুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমরা কিঞ্চিৎ আমোদও না পাইয়াছি এমন নয়। লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রতি রূঢ় হইতে সঙ্কুচিত নহেন, সে সৎসাহস তাঁহার আছে; কিন্তু শরৎচন্দ্রের মহিমা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করিতেও তাঁহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

লেখক যখন বঙ্কিমের পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন দুইটি কথা তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল। প্রথম, বঙ্কিমচন্দ্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন এমন ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথেরও নাই; বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার জবান যদি সত্যই বেঠিক হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রতিবাদ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য কান্নাকাটি আদৌ শোভন নয়। বাংলাসাহিত্যের দেব-সভায় বঙ্কিমচন্দ্র বজ্রপাণি ইন্দ্র; তাঁহার সেই বিদ্যুৎ-বলয়িত রাজ-মহিমার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মহিমা যে নিতান্তই তুলনার অযোগ্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কি উকিল খাড়া করিতে হইবে? শরৎচন্দ্র স্থলেখক ঔপন্যাসিক মাত্র—তিনি একজন কথাশিল্পী, তিনি কবি-মনীষী নহেন; বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবেও অতি উচ্চ কবিদৃষ্টির অধিকারী, সে কবি-প্রতিভার সঙ্গে যে মনীষা যুক্ত হইয়াছিল, তাহা আধুনিক কালে কয়জন বাঙালী দাবি করিতে পারে? আজ যদি কথাশিল্পের নূতন আদর্শ বা ফ্যাশন অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি বাতিল হইয়া যায়, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার গৌরবহানি হয় না—শেক্সপীয়ার মিল্টন, গেটে, হিউগো, এ কালের রসিকসমাজে বাতিল হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বকালের রসিক-সমাজে তাঁহাদের আসন কি অচল অটল হইয়া নাই? এ কালের বাঙালী বড় দরদী হইয়া উঠিয়াছে, কাব্যে উপন্যাসে যে লেখকের যত 'দরদ', সে-ই তত জনপ্রিয়; তাই রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের আড়ালে পড়িয়াছেন। যেমন ধর্ম্মে, তেমনই সাহিত্যে, এই জাতিগত sentimentalism আমাদের মাথা খাইয়াছে—সাহিত্যেও "নদে' ভেসে যাওয়া" চাই, যে যত ভাসাইতে পারে সেই তত মনের মানুষ। শুধুই আধুনিক কালের মনোভাব বলিয়া নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে

শরৎচন্দ্রকে স্থান দিবার প্রবৃত্তি এ জাতির স্বভাবধর্ম্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূল্য বুঝিতে হইলে যে ধরনের রসবোধ, ভাবকল্পনাতেও যে পৌরুষ ও চারিত্র্যপ্রীতির প্রয়োজন, তাহা এ জাতির সংস্কারে নাই। আমাদের দেশে সাহিত্য-বিচারের বালাই এ কালে প্রায় নাই বলিলেই চলে; সাহিত্য-বিচারের নামে বিদ্বন্মন্য আপ্‌রুচিওয়ালাদের নিন্দা-প্রশংসার নাগরদোলায় কে কখন উঠিতেছে ও পড়িতেছে, তাহার হিসাব রাখিয়া কোনও লাভ আছে?

উক্ত প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অনুযোগ করিয়াছেন—এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার এই মত-পরিবর্ত্তনের মূলে আর কোনও কারণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার একটা বিরাগের কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বমানবতার অতি-উদার কাল্‌চার আয়ত্ত করিতে পারেন নাই; তিনি জাতির ধর্ম্ম ও জাতির ইতিহাসকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করিতেন। তাহা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই যেভাবে মানুষ হইয়াছিলেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁহার একটা সুগভীর অশ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইবার কথা; এক দিকে 'তত্ত্ববোধিনী' এবং অপর দিকে 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' হিন্দুর হিন্দুত্ব লইয়া যে বিবাদ-বিতর্ক চলিয়াছিল তাহার কিছু আভাস এই প্রবন্ধ-লেখকও দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা সেকালে রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করিলেও, কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইলেও, আর এক দিকে একটা বিরোধমূলক বক্রতা চিরদিনই প্রচ্ছন্ন থাকিবার কথা। প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে রবীন্দ্রনাথের যে আক্রমণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যাহার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উক্তিটি—

'রবির পশ্চাতে ছায়া'র কথা—অনেকেরই স্মরণ আছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই; বঙ্কিমচন্দ্র নিজ-দেশ জাতি ও ধর্ম্মকে ভালবাসিয়া তৎকালীন কুসংস্কারমুক্ত বিচারপন্থী নবজ্ঞানবিজ্ঞানগর্ব্বিত সমাজের নিরতিশয় অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি এ সমাজের মনোভাব বুঝিতে হইলে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের প্রথম যৌবনের রচনা *New Essays in Criticism* নামক পুস্তক হইতে কিছু উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে শীল মহাশয়, সেই বয়সেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয়স্বরূপ লিখিয়াছেন—

> The successive waves of revival and transfiguration of the old regime in Europe traced above will prepare us for a study of the parallel movement in Bengal known as neo-Hinduism, or the Hindu revival....
>
> Said Chateaubriand, the leader of the third movement in France, "I am a Bourbonist in honour, a monarchist by conviction, and a republican by temperament and disposition" ; and in this country, in need of an equally comprehensive plea, stands, no doubt, the thinker who contributed to its literature of Illumination an article entited 'Mill, Darwin and the Hindu Religion', another headed 'Miranda, Desdemona and Sakuntala', an exposition of the Sankhya Philosophy, and a pamphlet on Samya ('Egalite'), once the leader of the vanguard of emancipation and deliverance, now the Balaam of the children of Moab and, we may say too, of Philistia !...

"Navajiban (the New Life), a journal which was started as the organ of neo-Hinduism, suggests by its very title, the working of that impulse which led Hardenberg, the rhapsodist of the fourth European movement of romantic revival, to call himself Novalis. Many of the articles in this journal on the Puranic gods and goddesses, on Hindu Pantheism and Ethics, on Hindu festivals, ceremonials and customs, illustrate that grotesque and incongruous blending of the physical with the spiritual which in Germany reached its apex in Novalis's Disciples at Sais. A hopeless sterility, a blank stunned stare, an incongruous mysticism, a jelley-fish structure of brain and heart are the characteristic features of this hybrid literature of impotence, as we may call it, in distinction from the literature of power and the literature of knowledge.

এ প্রসঙ্গে আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে, তারপরে পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয় নাই। আজ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের মূল কারণ সন্ধান করিতে গিয়া সেকালের কিঞ্চিৎ কাহিনী উদ্ধার করিতে হইল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অতুলনা কাব্যপ্রতিভা ও মনীষার বলে একদিন এ জাতির আত্মসম্মান প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই যে সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন, তাহাকে যে সম্প্রদায় কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই, আজ সেই সম্প্রদায়েরই গৌরবস্থল রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তাঁহার সেই সাধনাকে আমরা অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছি। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ এ জাতির কেহ নয়, আজ আমরা সকলেই নাকি রামমোহন রায়ের মানস-পুত্র!

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেম ও কবি-প্রতিভা, এই দুইয়ের মধ্যে ভাবের বিচ্ছেদ ছিল না, ইহাই তাঁহার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক—সাহিত্যিক হিসাবেও! আজিকার এই বিশ্বমানবতা ও মানস-মুক্তির দিনে বঙ্কিমচন্দ্র অচল। রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা যেভাবে ধরিয়া দিয়াছেন, তাহাতে শরৎচন্দ্রেই তাহার চরম পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁহার দুইটি অভিযোগ, একটি—তাঁহার উপন্যাসে Realism নাই, তিনি রোমান্সের পৈঠার উপরে উঠিতে পারেন নাই; দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি উপন্যাসে ধর্ম্মতত্ত্ব ও সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রেমের সুলভ উচ্ছ্বাসের দ্বারা কবিকল্পনার মর্য্যাদা হানি করিয়াছেন। দ্বিতীয় অভিযোগটির সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; রবীন্দ্রনাথ আজ যে বিশ্বমানবতার মহাভাবে বিভোর, তাহার মূল কোথায়—আমের পোকা যে মুকুলেই জন্মায়—তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সংস্কার জিনিসটা অতি অল্প বয়সেই গড়িয়া উঠে, তার পর বয়সে মানুষের প্রতিভা ও মনীষা যত বড় হইয়াই দেখা দিক, তাহার মনে সেই সংস্কারই প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অতিশয় মৌলিক ও অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহা যে কোনও সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়—এমন কথা অযথার্থ। আনন্দমঠ, সীতারাম বা দেবীচৌধুরাণীর যে দোষই থাক, সেই দোষ সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে যে কবিশক্তির পরিচয় আছে, যে প্রতিভার প্রমাণ আছে, তাহা যদি সুলভ হইত—যদি সেই জাতীয় আরও বিশ-পঁচিশখানা উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত—এক কথায়, ঐ সকল উপন্যাসেই যে শক্তি যে মাত্রায় সফল হইয়াছে তাহাই যদি আর পাঁচজন লেখকের মধ্যে আমরা পাইতাম, তাহা

হইলে বাংলা সাহিত্য যে অধিকতর সমৃদ্ধ হইত না, তাহা কে বলিবে! ধর্ম্মসমস্যা ও স্বদেশপ্রেমের সম্পর্ক থাকায় উহা যদিও খাঁটি সাহিত্য হইয়া না থাকে; অর্থাৎ কবিকল্পনা যেমনই হউক, তাহার বিষয় লইয়া যদি আপত্তি উঠে—উপন্যাসে যদি সাইকলজির সাদা জলের পরিবর্ত্তে, যুগ জাতি ও সমাজের রং লাগিয়া থাকে, এবং সেই জন্যই যদি তাহা অপাংক্তেয় হয়—তবে সাহিত্যের ইতিহাসে এই আধুনিক যুগ ছাড়া, আর কোনও যুগের প্রতিভাকেই গ্রাহ্য করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের এক শ্রেণীর উপন্যাসে তাঁহার কবিকল্পনা যে খানিকটা মোচড় খায় নাই, আমি সে কথা বলিতেছি না; কিন্তু রসিকমাত্রেই জানেন যে, এই অবান্তর অভিপ্রায় সত্ত্বেও সেই সকল উপন্যাসে যে পরিমাণ রসসৃষ্টির পরিচয় আছে, তাহা তাঁহার প্রতিভার অসাধারণত্বই প্রমাণ করে; রবীন্দ্রনাথও যে তাহা বুঝেন নাই বা বুঝিতে সম্মত নহেন, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি।

এখন প্রথম অভিযোগটির কথাই বলিব। রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্র যে-শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কল্পনার সত্য নাই, তাহা নিছক রোমান্স-জাতীয় অপরিপুষ্ট সাহিত্য। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠতা একেবারে অস্বীকার করা হইয়াছে। এক কালে যখন রবীন্দ্রনাথ মাত্র কবি ছিলেন, যখন কাব্যকে কাব্য-হিসাবেই উপভোগ করিবার ও তাহার রস বিশ্লেষণ করিবার শক্তি, কবিশক্তির মতই তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল, তখন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার পূজা করিয়াছিলেন—এক 'রাজসিংহে'র সমালোচনাতেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আজ তিনি সাহিত্যের আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর আধুনিকতার আদর্শে আকৃষ্ট, তাই কাব্য-সৃষ্টিতেও

যেমন, কাব্য-সমালোচনাতেও তেমনই, তাঁহার সে শক্তি আর নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে, তাঁহার উপন্যাস-কাব্যগুলির সৃষ্টিনৈপুণ্য সম্বন্ধে, এ প্রসঙ্গে কোনও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই; কেবল দুই চারি কথা এখানে বলিব। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়, এক যুগের রস-কল্পনা হইতে অপর যুগের রস-কল্পনার পার্থক্য নির্দ্দেশ ও তাহার হেতু নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে; কবিগণের সমসাময়িক যশ ও প্রতিপত্তির মূল্য নির্দ্ধারণও হইয়া থাকে; কিন্তু কাব্য-সৃষ্টির নানা form ও ভঙ্গির যে বৈচিত্র্য যুগে যুগে প্রকাশ পায়—তাহার তুলনামূলক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার কি রসিকের কাজ? যে যুগে যে ভঙ্গিরই প্রাদুর্ভাব হউক, শক্তিশালী লেখকের হাতে সেই ভঙ্গির প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সাহিত্যে তাহা অমর হইয়া থাকে। যুগে রুচির পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সাহিত্যে যাহা classic বা 'চিরন্তন', তাহা চিরদিনই স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যুগধর্ম্মী গড্ডালিকার দল তাহাকে অরুচিকর মনে করিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা সাহিত্যের রসপ্রমাতা, তাঁহারা তাহার মূল্য সম্বন্ধে কখনও ভুল করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স লিখিয়া কিছুমাত্র অপরাধ করেন নাই; রোমান্স লিখিবার শক্তি তাঁহার ছিল, গল্প রচনা করিবার অসাধারণ সৃষ্টি-প্রতিভা তাঁহার ছিল—তাঁহার নিজের কবিধর্ম্ম তিনি পালন করিয়াছিলেন; বাংলা সাহিত্যে সে ধরনের শক্তি আর কাহারও হয় নাই, আমরা ইহাই জানি। রোমান্স বলিয়াই যদি নিকৃষ্ট কাব্য হয়, এবং রিয়ালিষ্টিক উপন্যাস যদি রিয়ালিষ্টিক বলিয়াই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য আজকালকার অনেক রিয়ালিষ্টিক লেখক রাম শ্যাম হরিও বঙ্কিমের অনেক উপরে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই জানেন যে, আরব্য উপন্যাসও বিশ্বসাহিত্যের একটি ক্লাসিক; তিনি যদি বলেন

তাহার মধ্যে 'আষাঢ়ে' গল্প বলিবার যে শক্তি আছে—তাহাই তাহার মূল্য, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে Real ও Romance-এর একটা জগা-খিচুড়ি আছে, তাহাতে কবিশক্তির সাফল্য নাই, তবে অবশ্য আমরা নাচার। কিন্তু রোমান্স বলিয়াই তাহা হেয়, এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে এই রোমান্স ঝরিয়া গিয়া যখন Real প্রকাশ পাইল, তখনই আমরা প্রকৃত উপন্যাসের আস্বাদ পাইলাম—ইহা সাহিত্যিক রসবিচার নহে—ইহা রুচিবিবর্ত্তনের কথা; ইহাকে বলা যায়—আর্টেও ক্রমবিকাশনীতির সমর্থন। যদি তাহাই হয়, তবে অজন্তার চিত্রলিখন-পদ্ধতি এখনও এত মূল্যবান কেন? কালিদাসের 'শকুন্তলা' আজিকার এই নব্য-নাটকীয় রীতির যুগে অপাংক্তেয় নয় কেন? 'শকুন্তলা'র কথাই ধরা যাক। উক্ত নাটকে হিন্দুসমাজের একটা বিশিষ্ট আদর্শ, হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একটা বিশেষ নীতির সমর্থন আছে; তাহা ছাড়া রোমান্সের তো ছড়াছড়ি; তথাপি কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যতখানি সদয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাহার অর্দ্ধেকও নহেন কেন? রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে ইদানীং যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথেরই একটা নূতন পরিচয় আমরা পাইলাম—সেই উক্তির দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কবিযশের বিন্দুমাত্র লাঘব ঘটিবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স রোমান্স হইলেও তাহার মধ্যে যে বাঙালীদুর্ল্লভ পুরুষ-প্রতিভার পরিচয় আছে—যে প্রতিভা মহাকাব্য ও নাটক-সৃষ্টি প্রতিভার সমজাতীয়, যাহা এ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আর কোনও লেখকের ভাগ্য ঘটে নাই তাহার মূল্যনির্ণয় এ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক করিবেন; এ যুগে তাহা হইবে না, কারণ, এখন সাহিত্যে একেশ্বরবাদের যুগ, যাহার

সাহিত্যেও 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-মন্ত্রের উপাসক, তাহারা এক-কে পাইয়াই উন্মত্ত হয়; তাহাদের রসবোধ কোথায়?

বৈশাখ, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ও রামমোহন

সাহিত্যের কোন সংস্কার বা প্রেরণা রামমোহনের ছিল না। রামমোহনকে তাহার জন্য দায়ী করাই অন্যায়। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে জন্মিয়া একপ্রকার তীক্ষ্ণধার নৈয়ায়িক বুদ্ধির অধিকারী হইয়া, নিজের মানস-অভিজাত্য ও সামাজিক অভিজাত্যের অভিমান মিটাইবার জন্য সমাজ-সংস্কারে ও ধর্ম্মসংস্কারে একরূপ শৌখিন মনোবৃত্তির চর্চ্চাই যাঁহার জীবনে লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার মধ্যে কোনরূপ সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা অসম্ভব বলিয়াই তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে কুত্রাপি তাহার পরিচয় নাই। জ্ঞানবৃত্তির যে উদ্দীপনায় একপ্রকার সাহিত্যের জন্ম হইয়া থাকে তাহাও এইরূপ বাদবিসম্বাদের তাড়নায়, অর্থাৎ, আত্মমত-ঘোষণার নিরন্তর চেষ্টায়, সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে, এই প্রকার প্রতিভার দ্বারা বাংলাভাষায় কোন সাহিত্যের পত্তন যে হয় নাই, রামমোহনের রচনার বিষয় ও ভাষাই তাহা প্রমাণ করিতেছে। সে ভাষার ছাঁচ ও ভঙ্গি পরীক্ষা করিলে দুইটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়; প্রথম, সেই কালেই তাহা অপেক্ষা সৌষ্ঠবযুক্ত ও সাহিত্যগন্ধী ভাষা, অপর লেখকের রচনায় দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয়ত, রামমোহনের যে ভাষা, সে ভাষা বাংলা-গদ্যের বিকাশধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; পরবর্ত্তী যুগে যে ছাঁচে

যে ভঙ্গিতে বাংলা-গদ্যের ক্রমবিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে রামমোহনের ভাষার চিহ্নমাত্র নাই—সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার মত যুক্তি বা প্রমাণ আর কি হইতে পারে? আজ আমাদিগকে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে যে সাহিত্যজ্ঞান, যে তথ্যপ্রমাণ, ও যে আদর্শ অনুসারে চলিতে হইবে, তাহাতে এইরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা ব্যক্তিগত ভক্তির কোন স্থান নাই। রামমোহনের কালে বাংলা সাহিত্যের জন্মই হয় নাই; সাহিত্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের ভাষারও জন্ম হয়, তৎপূর্ব্বে হয় না; কেবল, যখন কোন সাহিত্যিক প্রতিভার উদয় হয়, তখনই ভাষা ও সাহিত্য রূপসৌষ্ঠব লাভ করে। আজ বিংশশতাব্দীর এই যুগেও বাংলার শিক্ষিত-সমাজে এইরূপ মূর্খতা যে প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, ইহাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষার পক্ষে নিরতিশয় লজ্জাজনক।

কিন্তু রামমোহনকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবি-ভাষা ও কবি-যুক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কবির পক্ষে যুক্তি অপেক্ষা প্রাণের আবেশপ্রসূত মনোহারিণী উপমাই অধিকতর স্বাভাবিক হইলেও, রবীন্দ্রনাথ তখন কল্পনাকুঞ্জ ছাড়িয়া বিচারাসনে বসিয়াছেন—কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাসের এমনই দুর্ভাগ্য যে, বিচারপতির বেশে তিনি ওকালতির চরম করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে নানা চিন্তাপূর্ণ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনার পরে তাঁহার আসল বক্তব্যটি এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা রাজা রামমোহন রায়ই প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে গদ্য সাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।" তৎপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'সর্ব্বসাধারণের ভাষা' ও 'সাধারণ সাহিত্যে'র প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 'ভাবুক

সভার জন্য পদ্য, ও জনসভার জন্য গদ্য'—ইহাও ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। তথাপি, রাজা রামমোহনকেই নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বাংলা দেশে গদ্য-সাহিত্যের ভূমি-পত্তনকারী আখ্যা দিয়াছেন। নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এমন কি চতুর্থ সৃষ্টিকর্ত্তার কথাও ভাবনার বিষয় হইয়া উঠে; সে সম্বন্ধে তিনি আর কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। আবার, বিষয়টি "বাংলা জাতীয় সাহিত্য"; রামমোহন সেই সাহিত্যের ভূমি-পত্তন করিয়া থাকিলে—বিদ্যাসাগরের কালে ভূমিষ্ঠ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত যে-সাহিত্য বাঙালী হিন্দুর ধ্যান-জ্ঞান, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব ও ভাবনার প্রোজ্জ্বল প্রভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল, ঊনবিংশ শতকের সেই শেষ পাদে যে সাধনার পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেই অপূর্ব্ব বাণীতে—যে বাণীতে সর্ব্বযুগের ভারতীয় সাধনা—বেদ-পুরাণ-তন্ত্র—একই আত্মার অমৃত পন্থারূপে সমন্বিত হইয়াছিল—সেই সাহিত্যের সেই বাণীর কোন্ অংশে রাজা রামমোহনের বাণীর প্রেরণা আছে? 'জাতীয় সাহিত্য' যদি সর্ব্বসাধারণের সাহিত্য হয়, তবে রামমোহন জাতির মনে-প্রাণে অবতরণ করিয়া, ভারতীয় সাধনার সর্ব্বযুগাশ্রয়ী বিচিত্র ভাবধারায় তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া, কোন্ চতুর্দ্বারমুক্ত তীর্থমন্দিরে, তাহারই আত্ম-দেবতার সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়াছিলেন? 'জাতীয় সাহিত্য' অর্থে যদি সাধারণের সাহিত্যই হয়, তাহা হইলে রামমোহনের দ্বারা তেমন সাহিত্য সৃষ্টি কি সম্ভব? রামমোহন ছিলেন ঘোর আভিজাত্যাভিমানী, স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী পুরুষ। তিনি ব্যক্তি-জীবনে যেমন ঘোর আত্ম-সচেতন বিষয়ী পুরুষ ছিলেন, দেশের ও দশের কার্য্যও তিনি তেমনই সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে, আত্মগত ধারণা ও অভিরুচি অনুসারে যেটুকু

করিয়াছিলেন, তাহাতে একরোখা মনের ভাব ও নিরাপদ পৌরুষ-প্রচারের লক্ষণই পরিস্ফুট। তিনি যত কিছু লেখনী-কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার বিষয় বা প্রেরণা যেমন সাহিত্যিক নয়, তেমনই তাঁহার ভাষাও বাদ-বিতর্ক ও মত-প্রতিষ্ঠার ভাষা, এবং সে ভাষাও কোন প্রকারে বাক্যের আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। অতএব রামমোহনের সাহিত্য যেমন 'জাতীয় সাহিত্য' নয়, তেমনই তিনি জ্ঞানবিতরণের জন্য যে ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নয়—সুপাচ্যও নয়। কিন্তু তাঁহারই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এখন জনসভার জন্য গদ্য অবতীর্ণ হইল।...রামমোহন রায় আসিয়া সরস্বতীর সেই আম-দরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদ্ঘাটিত করিয়া দিনেন।" যদি দ্বার উদ্ঘাটনের কথাই হয়, তবে কোন্ অর্থে রামমোহনই প্রথম সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন? 'দ্বার উদ্ঘাটন' তো তাঁহার সমসময়ে এবং পূর্ব্বে আরও অনেকে করিয়াছিলেন। আবার, তাঁহারই উদ্ঘাটিত সেই দ্বারপথে পরবর্ত্তীদিগের কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেখা যায় না। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছন্দ আকারে গদ্য রচনা করিয়াছিলেন, যথা, কৃষ্ণমোহন বা অক্ষয়কুমার, তাঁহাদের কেহই রামমোহনের সেই গদ্যের ছায়াও মাড়াইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যদি বলা যায় তিনিই প্রথম অতিশয় গুরুতর তত্ত্ব ও চিন্তারাজিকে একপ্রকার সরল গদ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও গদ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয় না কারণ, বিষয় যেমনই হউক, গদ্য-রচনায় ভাষার এমন একটি রীতি ধরাইয়া দেওয়া চাই, যাহা পরবর্ত্তী লেখকগণের সাক্ষাৎ সহায় হইয়াছে দেখা যায়; রামমোহনের গদ্য যে সেরূপ কোন প্রয়োজনে লাগিয়াছিল তাহার প্রমাণ বাংলাসাহিত্যের বিকাশমুখে কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না

১৮৪০ হইতে আমরা যে প্রকৃত গদ্য-সাহিত্যের সূচনা লক্ষ্য করি তাহাতে রামমোহনকে স্মরণ করা বা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি রামমোহনের সেই সাহিত্যকে 'রাজভোগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং এমন রাজভোগ তিনি যে প্রজাসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন—তাঁহার সেই রাজোচিত বদান্যতার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিত্বকেই ধন্য করিয়াছেন। রামমোহন যাহা করিয়াছিলেন তাহা যে সর্ব্বসাধারণের দুষ্পাচ্য, অতএব আর যাহাই হউক, সে বস্তু যে সাহিত্যপদবাচ্য নয়—এই অতিশয় সহজ কথাটাকেই পাশ কাটাইবার জন্য তিনি যে উপমার যুক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাও একাধিক কারণে চমকপ্রদ। তিনি লিখিয়াছেন--

> সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদিগের জন্য কি উপহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন? বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ।···আমাদের দেশে অধুনাতন কালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথমে মানবসাধারণকে রাজা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, সাধারণ নামক এই মহারাজকে আমি যথোচিত অতিথি সৎকার করিব—আমার অরণ্যে ইহার উপযুক্ত কিছুই নাই, কিন্তু আমি কঠিন তপস্যার দ্বারা রাজভোগের সৃষ্টি করিব।

"বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ"—ইহাই সাধারণ-নামক মহারাজের রাজভোগ! সেকালে এই রাজভোগ 'সাধারণ নামক মহারাজ' কেমন উপভোগ করিয়াছিলেন তাহা জানি না, কিন্তু আজিকার দিনের সেই মহারাজ (আমি গত চল্লিশ বৎসরের কথা

বলিতেছি) সে রাজভোগ যে অঙ্গুলি-মুখেও আস্বাদন করিয়া থাকেন, সে সংবাদ তাঁহারাই জানেন—যাঁহাদের মতে সেই রাজাই নব্যবঙ্গের সৃষ্টিকর্ত্তা। য়ুরোপে যাঁহারা মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহারই যে সাধারণ নামক মহারাজের রাজভোগ প্রস্তুত করিয়াছিলেন —এ কথা মানি, কেন না, বাইবেল একাধারে কাব্য, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র; এমন গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে পরম উপাদেয় হইবারই কথা; কিন্তু বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতির অনুবাদও যে সাধারণের রাজভোগ—এ কথা রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যতত্ত্বদর্শী কবির মুখে যে কারণে বাধিল না—তাহাকে যদি অন্ধ-ভক্তি বলা না যায়, তবে তাহা কি?

রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক-মনোভাবাপন্ন বলিলে কথাটা যথার্থ হইবে না, তাহা জানি; কিন্তু এইরূপ উক্তির মূলে যাহা আছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানা স্থানে—হিন্দুসমাজ, হিন্দু-আদর্শ ও হিন্দু-সংস্কারের বিরোধী, এবং অপর এক তন্ত্রের পক্ষপাতী সেই মনোভাব, তাঁহার কবিপ্রেরণা ও ধর্ম্মগত আদর্শের মূলেও লক্ষ্য করা যাইবে। ইহা যদি ব্যক্তিগত না হইয়া সাম্প্রদায়িক হয়, তবে তাহা আমাদেরও দুর্ভাগ্য।

রামমোহনকে লইয়া এই যে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী। রামমোহন আজিকার দিনের মত ব্রাহ্ম ছিলেন না; তিনি কোন নূতন সমাজ সৃজন করেন নাই, বরং পুরাতন সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষার একান্ত প্রয়াসী ছিলেন—অর্থাৎ কোন বিষয়েই তিনি নির্ব্বোধ ছিলেন না। কোন নূতন ধর্ম্ম স্থাপন নয়—স্বাধীন ধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য তিনি যে একটি চক্র গঠন করিয়াছিলেন, সেই সভাতেও গায়ত্রী বা বেদপাঠ ব্রাহ্মণের দ্বারাই হইত; এরূপ সভা-স্থাপন একজন

নিষ্ঠাবান নৈয়ায়িক বা বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। রামমোহন উপবীত, গঙ্গাজল, ব্রাহ্মণ পাচক—এ সকলেরই মূল্য বুঝিতেন; এবং জ্ঞানে ও ধ্যানে (আত্মীয় সভার উপাসনায়) পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিলেও, দেবোত্তর সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগে তাঁহার কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। তিনি হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়াই, এক দিকে সেকালের হিন্দুগণ যেমন তাঁহার প্রাপ্য সম্মান ও প্রশংসার বিষয়ে কোন সাম্প্রদায়িক কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই, তেমনই তাঁহার মত একজন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির স্বাধীন মতামত, ও কোন কোন কার্য্য আশঙ্কাজনক মনে হওয়ায়, তাঁহার কথা ও কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহাও রামমোহনের জীবিতকাল ও তাহার ঠিক পরবর্ত্তী সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য মাত্র। রামমোহন দেশ ও সমাজকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, অনতিকালের মধ্যেই সে অবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তন সুরু হইল—এই পরিবর্ত্তন রামমোহনের বাণীতে ঘটে নাই। হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর দুই-পুরুষের মধ্যে, য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্র, শিক্ষিত হিন্দুসমাজে যে নৈতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল, তাহা রামমোহনের আবির্ভাব না হইলেও ঘটিত; এবং রামমোহনের দৃষ্টি যদি সত্যই তেমন ঋষিসুলভ দূরদৃষ্টি হইত, তাহা হইলে তিনিই এই ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধানমূলক একটা কিছু সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। রামমোহনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক চিন্তা ও ভাব—রামমোহন যাহা কল্পনা করেন নাই—তাহারই সহায় হইল, সমাজ হইতে পৃথক একটা Protestant বা বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল। ইহারাই আসল

সমস্যাকে যেন বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়ধ্বজা উত্তোলন করিল। হিন্দু-রামমোহনকে তাহাদের সেই নবধর্ম্মের দীক্ষাগুরু বলিয়া, তাহারা তাঁহার আদর্শ ও অনুষ্ঠানসকলের এক স্বপক্ষ-সমর্থন-মূলক ব্যাখ্যা করিল। তাহার পর হইতেই হিন্দুসমাজের পক্ষে রাম-মোহনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, পরবর্ত্তী ইতিহাসে হিন্দুজাগরণ যে ভাবে ও যে উপায়ে আরম্ভ হইল, তাহাতে রামমোহনের তত্ত্ব-সর্ব্বস্ব, কল্পনা ও সহানুভূতিহীন ব্যক্তিতান্ত্রিক আদর্শবাদ কোন কাজে লাগিত না; লাগেও নাই। রামমোহনের মনীষা যতই অনন্য-সাধারণ হউক, এবং তাহার সাক্ষাৎ প্রভাবের ফলে নবভাব ও নবচিন্তার যে ধারাই উদ্ভূত হউক, তাহার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বিশাল বাঙালী হিন্দুসমাজের কোন সম্বন্ধ ছিল না; বরং সেই ধারার প্রতিমুখে ও প্রতিকূলে পুরাতন হিন্দুসমাজেরই হৃদয়-মৃণালে যে নবভাব, নবসংস্কৃতি, নবজাতীয়তা-ধর্ম্ম—নূতনতর আত্মসংবিৎ—সহস্রদল পদ্মের মত বিকশিত হইয়াছিল, তাহা যেমন রামমোহনের ব্রাহ্ম-আদর্শ হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও প্রাণবান, তেমনই সেই আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যাঁহারা রামমোহনকে নব্যবঙ্গের স্রষ্টা—এবং হয়তো সেই হেতুই, তাঁহাকে নব্য বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম আদিস্রষ্টা—বলিয়া ঘোষণা করিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া রাত্রিকে দিন করিবার বিফল সাধনায় শক্তিক্ষয় ও আত্মক্ষয় করিতেছেন মাত্র। বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ যদি রামমোহন-শিষ্য হন, তবে বুদ্ধ শঙ্কর ও চৈতন্য তাহা হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; কারণ, রামমোহনের পরে জন্মিলে তাঁহারাও তাহাই হইতেন! রামমোহনের কালে যাহার সূচনা হইতেছে মাত্র—সেই কালের

অব্যবহিত পরেই সেই ইংরেজী-শিক্ষার ফলে, এবং ইংরাজ-শাসনের অন্তর্গত নীতির অলক্ষ্য প্রভাবে, বাঙালীর প্রতিভা ও আত্মচৈতন্য যে ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রামমোহনের বাণীর প্রয়োজন যে হয় নাই—সে যুগের ইতিহাস যাঁহারা ভাল করিয়া আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই তাহা স্বীকার করিবেন। রামমোহন যদি পূর্ব্বাহ্ণেই কয়েকটি চিন্তার অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আমরা তাঁহার সেই অসাধারণ বোধশক্তির জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মান করিব; কিন্তু সে চিন্তাও যেমন তত্ত্বসর্ব্বস্ব—তাহাতে কবি বা ঋষির দৃষ্টি ছিল না, তেমনই, তাহা অনতিদূর ভবিষ্যতের বাস্তব সমস্যাসমাধানে মুখ্যত বা গৌণত কোন কাজে লাগে নাই বলিয়া, তাঁহাকে বাংলা তথা ভারতের নবযুগপ্রবর্ত্তক গুরু বলিয়া স্বীকার করিব না।

চৈত্র, ১৩৪৭

বিচিত্র কথা

১। জীবন-জিজ্ঞাসা

কলকাতায় আপনাদের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, তারপর থেকেই স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রকট হয়ে উঠেছে ; আশ্চর্য্যের বিষয়, এখনও টিকে আছি এবং সম্ভবত এ বছরটা টিকে গেলাম। এই স্বাস্থ্যভঙ্গ থেকেই একটা মানসিক বিপ্লব চলেছে। নিজের জীবন, চরিত্র, ভাগ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ও সজ্ঞান হয়ে পড়েছি ; যত-কিছু পাপ, তাপ, ব্যথা, দুর্গতি, দুর্ব্বলতা ও দুর্ভাগ্যকে সৃষ্টিবিধানের অখণ্ডনীয় নিয়মের অনুযায়ী ব'লে—নিজের ব্যক্তিগত চেতনাকে বিশ্বচেতনার অন্তর্ভূত ব'লে—উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি ; বলা বাহুল্য, আমার জীবনের যত-কিছু ব্যর্থতাকে একটা Law-এর fulfilment হিসাবেই মেনে নিতে চাই। কোনখানে কোন বিরোধ আছে, কোন অন্যায় আছে—এটা আমি স্বীকার করব না। এই জগৎটার আদিকারণ চিরদিনই দুর্জ্ঞেয় থাকবে, কিন্তু এর আদিকে না জানলেও 'মধ্য'কে জানা যায়। বীজ কোথা থেকে এল, কেমন ক'রে অঙ্কুরিত হ'ল, এ কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে, এই বিকাশ-ধারায় সেই বীজরূপী অনাদি ও অনন্ত সত্তা আপনি আপনাকে realise ক'রে চলেছে ; এ realisation-এর শেষ নেই, বিরামও নেই। আমার জীবনের যেটুকু উপলব্ধি তাও সেই বিশ্বচেতনায় একটা contribution। যা

'মহতো-মহীয়ান্' তা 'অণোরণীয়ান্'ও বটে; আমার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মধ্যে, আমার এই আমি-রূপেই সেই সত্তা একটা অদ্বিতীয়, অসাধারণ, অতিশয় বিশেষ উপলব্ধি-ধনে ধনী হচ্ছে—আমার মত আর কেউ আগে ছিল না, পরে হবে না; কাজেই আমাকেও প্রয়োজন ছিল। 'অনন্তবাহূদরবক্ত্রনেত্র' যিনি—আমিও তাঁরই একটি বিশেষ প্রত্যঙ্গ, আমাকে না হ'লে তাঁর চিৎস্ফূর্ত্তির একটা 'অণোরণীয়ান' অংশ blank থেকে যেত। এইটুকুই আমার জীবনের প্রয়োজন; এর হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ আমার নয়, আর একজনের; এবং এর কিছুই ব্যর্থ নয়, তাই ক্ষোভের কারণ কোথাও নেই।

মানুষের 'আমি' বা অহংসংস্কারই যে প্রধান অবিদ্যা, এ কথা যে কত সত্য তা বুঝানো যায় না, নিজে না বুঝলে উপায় নেই। দেখুন, জগতের একটা প্রধান সংস্কার মানুষের মঙ্গল-বুদ্ধি; এ থেকেই যত পাপ-পুণ্য, ভার-অভাব, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভের ধারণা আমাদের কিছুতেই ছাড়ে না,—আধ্যাত্মিক চিন্তায় পর্য্যন্ত! কিন্তু এ সকলের মূলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির 'অহং'। আমি পরলোক বা পরকালে বিশ্বাস করি না (সংস্কার হয়তো আছে), তাই আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় ব'সে আমাকে এই জীবনের একটা অর্থ আবিষ্কার করতে হচ্ছে, নইলে অব্যাহতি নেই। প্রাণ হাহাকার করলেও আমাকে তা নিবারণ করতে হবে। যতটুকু স্থূলভাবে দেখছি, তাতেই নিরস্ত হ'লে নাস্তিক হতে হয়। আমি নাস্তিক নই। আমি এই সৃষ্টিকে বিশ্বাস করি; এবং এ ছাড়া আর কিছুকে সত্য ব'লে মানি না। কাজেই এই সৃষ্টির মধ্যেই সৃষ্টির অর্থ আমায় খুঁজতে হবে। একটা বড় কথা আমি হিন্দুর বংশে জন্মে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি, সে হচ্ছে এই যে—অহং-সংস্কার বা ব্যক্তিচেতনাই অবিদ্যা।

এইটিকে সম্বল ক'রে আমি যে একটি অর্থের আভাস পাচ্ছি, তা যুক্তি বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ; কারণ, আমি যে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করেছি, তাতে Matter ও Spirit-এ ভেদ নেই—Matter-ই Spirit ; এই সৃষ্টির নিয়তিই ভগবানের নিয়তি—আমার নিয়তিও ভগবানের নিয়তি। এই সৃষ্টির বিকাশ-ধারায় সেই 'আপনি' আপনার পরিচয় সাধন করছে ; সে পরিচয়ের শেষ নেই—প্রতিমুহূর্ত্তের পরিচয় সে পরিচয়কে পুষ্ট করছে ; এমনই ক'রেই চলেছে, অব্যক্ত ব্যক্তই হচ্ছে—কখনও 'ব্যক্তি' হয়ে উঠবে না। আমার মধ্য দিয়েও সেই 'আপনার-সঙ্গে-আপনার-পরিচয়ে'র একটা কণা পুষ্ট হচ্ছে। যতক্ষণ মানুষের অহং-সংস্কার থাকবে, ততক্ষণ এ চিন্তা রুচিকর হবে না, এতে শ্রদ্ধা হবে না। মানুষের সর্ব্বচিন্তা,—সূক্ষ্মতম চিন্তাও materialistic ; এবং এই materialism-এর মূলে আছে ব্যক্তি-চেতনা বা অহং-সংস্কার—এরই নাম অবিদ্যা। কিন্তু এই জগৎকে অখণ্ড আত্মার একমাত্র রূপ ব'লে বুঝতে পারলে, materialism-ই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকতা হয়ে দাঁড়ায়। যারা পরলোকবাদী, তারাই ঘোরতর materialist,—অতি দুর্ব্বল, কৃপার পাত্র তারা। তারা ইহলোককে, অর্থাৎ এই অহং-অনুবিদ্ধ জীব-সংস্কারকে পরলোকে প্রসারিত করেছে। Spiritualism-এর পাণ্ডারা মোহিনী প্রকৃতির অশেষ ছলনায় মুগ্ধ হয়ে, এই জগতেরই একটা ছায়া রচনা ক'রে, অবিদ্যাজনিত দুঃখকে মুলতুবি ক'রে রাখবার চেষ্টা করছে। সবচেয়ে দুঃখ হয়, যখন কোন বুদ্ধিমান হিন্দুও পাশ্চাত্যের এই শিশুসুলভ 'কানা-মাছি'-খেলায় আকৃষ্ট হয়—যা Science-এর বহির্ভূত, তাকেও Science-এর অধিকারে নিয়ে এসে প্রকৃতির অবগুণ্ঠন মোচনের উল্লাস করে। যাদুকরী যে এখানেও তাদের ঠকাচ্ছে, এ খেয়াল কারও হয় না ;

যত-কিছু experiment বা প্রমাণের মূল্য যে কত সামান্য, তা এই আত্ম-প্রবঞ্চিত হতভাগ্যেরা বোঝে না। সেগুলোও phenomena, এবং তার অন্যতর ব্যাখ্যা সম্ভব, এবং একদিন তা পাওয়া যাবে। প্রকৃতির একটা ঘাগ্‌রি science খুলেছে, আরও খুলবে, কিন্তু তাকে কখনও উলঙ্গ করতে পারবে না। ওসব প্রমাণকে অতিশয় অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে পারে এমন অনেক ব্যক্তি আমাদের দেশে এখনও আছে—আমি প্রকৃত যোগীদের কথা বলছি, তা অসম্ভব নয়। আসলে ওসবই জড়বাদী materialist-দের সুখস্বপ্ন—'wish is father to the thought'। তারা ব্যক্তি-হিসাবে বাঁচতে চায়, বড় সত্যের সম্মুখীন হবার শক্তি, সাহস বা অভিলাষ তাদের নেই। আমি এদের বিশ্বাস ও মতামত কিছু কিছু জানি—কতকগুলা দেহাত্মবাদী অহংমুগ্ধ শিশু বা পশু। তারা Spirit-দের প্রমুখাৎ পরলোকের ও সেখানকার জীবনের যে বিবরণ শোনায়, তা এতই তুচ্ছ এবং এতই বালকোচিত যে, অতিশয় প্রাকৃত-সংস্কারসম্পন্ন অশিক্ষিত অতিবিশ্বাসীর দল ছাড়া আর কেউ এক মুহূর্তের জন্যও ওসব কথায় কান দেবে না। এই Spiritism সম্বন্ধে এত কথা বললাম তার কারণ, মানুষের মোহবুদ্ধির এ একটা নতুন হুজুগ উঠেছে; সেই পুরানো morality-র সংস্কারকেই এই সব অখ্রীষ্টানবেশী খ্রীষ্টানেরা আরও দৃঢ় ক'রে তুলে, মানুষকে আবার অবিদ্যার নরকে নিক্ষেপ করবার চেষ্টায় আছে। এই মত যদি মূলবিস্তার করে, তবে আবার একটা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম—পূরা materialistic সংস্কার—প্রবল হয়ে উঠবে। ইহলোকের অধিকার নিয়েই এত বাদ-বিসম্বাদ, এবার পরলোকের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকের সৃষ্টি হবে; হিন্দু-ভূত ও খ্রীষ্টান-ভূত আবার এক communal মারামারি বাধিয়ে

দেবে। কি দুর্ব্বল অসহায় আমরা! বাঁচতে হবেই, একটা পরলোক বা স্বর্গ চাইই চাই; এবার সেটাকে science-এর দাবি দিয়ে শোধন ক'রে নিতে হবে !!

কিন্তু আমি যে তত্ত্বের আভাস ও আশ্বাসের কথা বলেছি, তাতে আমি এই সৃষ্টি-বিধানের মধ্যে একটা Justice-এর সান্ত্বনামাত্র পাই, এখনও আনন্দ পাই নি। অহং-বুদ্ধি যে কিছুতেই যায় না! এই জীবনটার প্রতি আমার ব্যক্তিগত মমতা কতদিক থেকে আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে! অতীতকে বড় মধুর মনে হয়, প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে; সেই বাল্য, সেই যৌবন, তার যত ব্যথা, যত দুঃখ—এমন কি যত misery ও squalor—আজ পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। মনে হয় জীবনে যা পেয়েছি বা পাই নি তার জন্যে শোক নয়—আরও পাওয়া এবং আরও না-পাওয়া এরই মধ্যে শেষ হ'ল, এই দুঃখ। মৃত্যুর জন্য সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত আছি ব'লে যেমন মনকে প্রবোধ দিই, তেমনই হঠাৎ কোনও সময়ে এই ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক বিনাশ চিন্তা ক'রে নিদ্রাহীন নিশীথে বড় ভয় পাই। বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে যাব বা মহাসত্তায় লীন হব, তাতে সুখ-দুঃখ কোন চেতনাই থাকবে না—এইটাই আশা হয় বটে, তবু 'the dread of something after death' যেন অন্তরের মধ্যে কোথায় বাসা বেঁধে রয়েছে। মহাকবির কি অব্যর্থ ভাবনা! মানুষের প্রাণের অন্তস্তলের সর্ব্বশেষ চিন্তাকে কেমন যথার্থ ক'রে প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে সেই আর এক কথা—

We must endure
Our going hence even as our coming hither.
Ripeness is all.

—এতবড় সত্য কথা এমন ক'রে আর কে বলতে পেরেছে? Shakespeare-এর সমগ্র কাব্য-কল্পনার মধ্যে যে নাটকীয় objectivity-র পরম রস উৎসারিত হয়েছে, তার মূলে আছে ওই attitude। জীবনকে তিনি এমনি ক'রে দেখতে পেরেছিলেন ব'লেই তাঁর কাব্যে subjectivity-র সঙ্কীর্ণতা এত কম। এই সৃষ্টির মধ্যে তিনি আপনাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে, এই জড়ের মধ্যেই সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করেছিলেন। এ আশ্বাস ধর্ম্মের আশ্বাস নয়, morality-র আত্মপ্রসাদও নয়—কোনও idealism-এর মোহও নয়; জগতের প্রাণ-প্রেরণার সঙ্গে নিজ প্রাণ-প্রেরণা যুক্ত ক'রে একটি পরমা নির্বৃতি লাভ। তাঁর কল্পনায় কোন ব্যক্তি-সংস্কার ছিল না ব'লে তিনি কোন God-ব্যক্তির ধার ধারতেন না।

'Ripeness is all' কথাটার অর্থ আমার মতে এই যে, বিশ্ব-বিকাশধারার সঙ্গে নিজ প্রাণের বিকাশকে এক ক'রে দেখার যে রসময় উপলব্ধি,—যার ফলে সকল সুখদুঃখ একটি অপূর্ব্ব চেতনায় লয় হয়ে যায়—মনুষ্যজীবনের সেই সার্থকতাই পরম ও চরম বস্তু। আমি এই তত্ত্বের যে উপলব্ধি করেছি তার মধ্যে Law ও Justice-বোধটাই প্রধান ও প্রবল; সে উপলব্ধি রসময় নয়, তার মধ্যে একটা intellectual satisfaction আছে—প্রেমের প্রেরণা নাই। তাই আমার 'আমি'টা এত ক'রেও শান্ত হচ্ছে না—আমার সমস্ত সত্তা রসবিগলিত হয়ে সমাধি বা harmony-তে ডুবে যেতে পারছে না। এই প্রেম যে-কোনও পাত্রকে আশ্রয় ক'রে মানুষকে সেই অবস্থায় পৌছে দিতে পারে। এ বিষয়ে সকল যুগের সকল ভাবুক, সকল কবি যে কথা বলতে চেয়েছেন—তা সে যেমন ক'রেই বলুন, তার implication যেখানে যত সঙ্কীর্ণই

হোক—তাতে তাঁরা একটি সহজ সত্যকেই প্রকাশ করেছেন, হয়তো তার গভীরতর মর্ম্ম উপলব্ধি না ক'রেও। Tennyson-এর সেই দুটি লাইন স্মরণ করুন—

Love took up the harp of life and smote
On all the chords with might,
Smote the chord of Self, that trembling
Passed in music out of sight.

তাই যেমন ক'রে যে দিক দিয়েই জীবনের রহস্য সমাধান করবার চেষ্টা করি না কেন—ঘুরে ফিরে ওই একটা তত্ত্বকেই আশ্রয় করতে হয়, ওটাকে এড়িয়ে যাবার যো নেই। প্রেমই মৃত্যুঞ্জয়—মহাকবি Shakespeare থেকে মহাতাপস বুদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সাধনার সিদ্ধিমন্ত্র ওই এক। বুদ্ধ এই প্রেমের বলেই জীব-সংস্কার ত্যাগ ক'রে 'ব্রহ্মবিহার' করেছিলেন ; Shakespeare এই প্রেরণার বশেই কাব্য-সাধনার পথে প্রাণের সেই পরমা নির্বৃতি লাভ করেছিলেন। অতএব, the problem of life is to live—মৃত্যু, পরলোক বা পরকাল নয় ; 'Ripeness is all'। কিন্তু এ সব কি আপনার ভাল লাগছে ? আমার মত আপনি তো বৈতরণীর কূলে দাঁড়িয়ে তার প্রথম তরঙ্গের আঘাত প্রতীক্ষা করছেন না ! অথবা আপনি তো আমার মত অপ্রেমিক নন। আপনার এসব চিন্তায় কি প্রয়োজন ? আপনার যা কিছু চিন্তা, সে আত্ম-সমস্যামূলক নয়, পর-সমস্যামূলক ; তাই তর্কে পরকে হারিয়ে দিতে পারলেই আপনি খুশি—নিজের কাছে জবাবদিহির কোন প্রয়োজন নেই। প্রার্থনা করি, আমার মত এই রকম প্রাণের দায়ে আপনাকে যেন কখনও কোনও চিন্তার আশ্রয় নিতে না হয়। * *

পৌষ, ১৩৪৮

২। প্রশ্ন ও তাহার উত্তর

তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে, তার সোজাসুজি উত্তর আমি দিই নি, আমার স্বভাব তা নয়। কারণ, যে কথাটা বড়, তার পিঠ-পিঠ উত্তর দেওয়া চলে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। প্রশ্নটাকে মাঝে রেখে খুব দূর থেকে প্রদক্ষিণ করতে করতে শেষে খুব নিকটে এসে তাকে ধরি, তখন সেটা একেবারে যেন গ'লে অদৃশ্য হয়ে যায়। কোন বড় প্রশ্নেরই মীমাংসা কখনো হতে পারে না; যতক্ষণ প্রশ্ন আছে ততক্ষণ উত্তরও আছে, দুটিরই অস্তিত্ব সমান—একটা আর একটাকে 'নাস্তি' করতে পারে না! কাজেই উত্তর নয়—প্রশ্নটাকেই দূর করতে হবে, 'নস্যাৎ' করতে হবে—তাকেই বলে আসল মীমাংসা। আমার কিন্তু সে ক্ষমতা নেই, কাজেই আমি তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তরে আমার একটা অনুভূতিমাত্র তোমাকে জানাব। তাই ব'লে মনে ক'র না যে, অনুভূতির কথাটা প্রশ্নের উত্তর হিসাবে অবান্তর। তর্ক ক'রে কোন সত্যের প্রতিষ্ঠা কখনো হয়েছে? যাকে যুক্তিতর্কের মীমাংসা বলে, সে তো মস্তিষ্কের ব্যাপার। কিন্তু সত্যকে যে প্রাণে পেতে হয়! আমি তর্কের সাহায্যে তোমাকে না হয় একটা মত গ্রহণ করালাম, অর্থাৎ তুমি বুঝলে যে, ওটাকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। তাতে কি হ'ল? যতক্ষণ তোমার প্রাণ তাতে সায় না দিল—সেটা তোমার আত্মগত না হ'ল, ততক্ষণ সেটা কি তোমার পক্ষে সত্য? প্রাণের মধ্যে যতক্ষণ না 'পাওয়া' যায় ততক্ষণ কেবল 'জানলে'ই কোন একটা বস্তু কারও পক্ষে সত্য হয়ে ওঠে না। এটা মনে রেখো যে, 'জানার মত জানা' আর 'পাওয়া'র মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আমরা 'জানার মত জানতে'

পারি নে ব'লেই তর্ক ও কথার সর্দ্দার হয়েই রইলাম—পেলাম না, হলাম না। যতক্ষণ প্রশ্ন করি ততক্ষণ নিশ্চয়ই পাই নি,—পেলে কিন্তু একেবারে চুপ ক'রে যাই, মনের মধ্যেও প্রশ্ন ও উত্তরের দ্বন্দ্ব আর থাকে না।

কথা উঠতে পারে—তবে কি এত সব জানা, এত সব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ—তা মিথ্যা?—তা কি জ্ঞান নয়, তা কি 'জানা' নয়? না; কারণ, যা জানলে সব জ্ঞানই সত্য হয়ে উঠে, সেইটিকে কেউ জানছি না—তার আশপাশের ছোট টুকরো খণ্ড বিজ্ঞানগুলিই আমাদের মানসগোচর হচ্ছে। চাবিটা খুব ছোট, তাই এত হাতড়াচ্ছি তবু হাতে ঠেকছে না। সেই অতি ছোট, অতি সরল, অতি সহজ জিনিসটিকে পেলেই, এই প্রকাণ্ড অন্ধকার স'রে যায়—এ মহা অরণ্য ধেনু-চরানো বেণু-বাজানো গোষ্ঠভূমিতে পরিণত হয়। সেই সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান হঠাৎ একদিন ভাগ্যবানের প্রাণের মধ্যে অতি সহজেই এসে পৌঁছয়; বহু তপস্যা, বহু অনুশীলনেও যাকে পাওয়া যায় না, সে ধরা দেয় শক্তিমানের প্রাণের আনন্দ-বিশ্বাসে, সে খেলা করে স্বপন-দেখা শিশুর মুখের হাসিতে, সে বেজে ওঠে বাঁশের বাঁশীর মেঠো সুরে। সকল জ্ঞানের পরাভব যেখানে, সকল আর্টের অপ্রয়োজন যেখানে—সেই অযত্নসিদ্ধ অনাড়ম্বর সহজ সুন্দর পরিপূর্ণতার মধ্যে তিনি প্রকট হন—যিনি জ্ঞানীর সত্য, যোগীর আত্মা, ভক্তের ভগবান। সারা রাত্রি বর্ষণ হয়েছে, গভীর নিদ্রায় তা জানতে পারি নি; সকালে উঠে দেখি—দীঘির জল কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে! যে ছিল রিক্ত সে হঠাৎ এমন পূর্ণ হয়ে উঠল কি করে—আশ্চর্য্য হয়ে যাই। তেমনই কোন এক নিবিড় বর্ষা-নিশীথের অতর্কিত অভিসারে কখন যে হৃদয়-হ্রদ

সব-হারানো অথচ সব-ফিরে-পাওয়ার আনন্দে কূল ছাপিয়ে উঠবে, তার কিছুই ঠিক নেই। কেবল এইটুকু জানি---সে 'পাওয়া' মনে হবে না, প্রাণে হবে।

আমার বিশ্বাস—এইটেই পাওয়ার পথ, প্রেমের পথ। কিন্তু প্রেমও কামনারই পরিণাম। কামনা মানে—ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উন্মেষ ; ইন্দ্রিয়গুলো যত অনুশীলিত হয় কামনা তত সূক্ষ্ম হতে থাকে, ততই সুন্দর-বোধ জাগে। এও এক রকমের জ্ঞান—এ-ও মনোবৃত্তিরই উৎকর্ষ, হৃদয়-বৃত্তির নয়। সুন্দর-বোধ জাগ্রত হ'লে একে বহুরূপে উপভোগ করবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়—একের মধ্যে মন বাঁধা পড়ে না। যাকে আমরা সাধারণত প্রেম বলি—সেই সাংসারিক হৃদয়-বন্ধন মনোবৃত্তির উৎকর্ষ প্রমাণ করে না ; বরং সেই মনোবৃত্তি যখন সংকীর্ণ এবং হৃদয়বৃত্তি প্রবল হয় তখনই এইরূপ হৃদয়-বন্ধন সম্ভব হয়। সে অবস্থায় একের মধ্যে বিশ্ব ক্ষুদ্র হয়ে থাকে ; এজন্য বড় কবি বা বড় শিল্পীর মত, সাধারণ মানুষের কামনা বিশ্বগ্রাসী হয় না ; অবাধ কল্পনা ও সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা নেই ব'লে তাদের সেই সাংসারিক প্রেম, বা একের প্রতি আসক্তি, ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু মন যখন সারা বিশ্ব ঘুরে বহুর মধ্যে এককেই ভাল ক'রে চিনে নেয়—তখন ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাট, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু, ব্যক্তির মধ্যে পরম পুরুষকে দেখে চরিতার্থ হয়। তখন কিন্তু আসক্তি আর থাকে না। তাই, সে প্রেম যেমন ধীর তেমনই গভীর। ঘরের মানুষ পথে বার হয়, তারপর সর্ব্বতীর্থ ঘুরে যখন সে আবার ঘরে ফিরে আসে, তখন ঘরটাও তীর্থ হয়ে গেছে ; তাই আলাদা ক'রে গৃহ-বিগ্রহের পূজো আর হয় না।

মনোবৃত্তির উৎকর্ষের ফলে যার সুন্দর-বোধ জেগেছে, যার কাম বিশ্বলক্ষ্মীকে কামনা করে, তার ব্যক্তিত্ব-বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, সে

উদ্দাম, স্বেচ্ছাচারী, চরিত্রহীন হয়ে ওঠে। বাঁধনের মধ্যে যে সুখ, সে সুখ তার ভাল লাগে না; কিন্তু বাঁধন-হারা হয়ে চির-অতৃপ্তির উল্কা-দহন সে সহ্য করে—যতক্ষণ না তার সেই 'বিশ্বরূপ-দর্শন' ঘটে ততক্ষণ তার শান্তি নেই। এই স্বর্গ-মর্ত্ত্যহারা জীবনের কি বিরাট ক্রন্দন, কি অশান্ত উল্লাস!

আসক্তি মানে গণ্ডি। কিন্তু আর এক রকম গণ্ডি আছে—সে গণ্ডিকে মুক্ত পুরুষেরাও স্বেচ্ছায় বরণ করেন। জলের স্বরূপ যখন বুঝেছি, তখন কূপোদকও যা গঙ্গোদকও তাই; এককে যখন পেয়েছি, বুঝেছি, তখন খণ্ডের মধ্যেও পূর্ণ তৃপ্তির বাধা আর থাকে না। তখন আমার গৃহলক্ষ্মীর মধ্যেই বিশ্বের নারীমূর্ত্তি দেখি—যত-কিছু সৌন্দর্য্য, যত-কিছু মহিমা ঐ ক্ষুদ্র সসীম ব্যক্তিদেহের গণ্ডির মধ্যেই পূর্ণ-প্রকাশ হয়; তখন সুন্দর-কামনার সেই বিশ্বান্বেষী কল্পনা ঐ যেমন-তেমন দুটি চোখ, আঁকা-বাঁকা ভুরু, সামান্য ওষ্ঠাধর, ও অসম্পূর্ণ স্নেহের মধ্যেই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে; তখন কবি Wordsworth-এর মত—"To me the meanest flower that blows hath a meaning that lies too deep for tears"। এখানে বাইরে একটা গণ্ডির মত দেখায় বটে, কিন্তু অন্তরে সে সত্যিই মুক্তি লাভ করেছে, তার কাছে কোন বস্তুর মধ্যেই সঙ্কীর্ণতা আর থাকে না। যে সুস্থ তার কাছে সুস্থ-অসুস্থের ভেদ আর থাকে না; যে মুক্ত সে বন্ধন-অবন্ধনের বাইরে; যে বুদ্ধ তার আর কোন ভেদ-বুদ্ধি থাকে না। মন যখন সেই একে পৌঁছেছে তখন বহুর মধ্যে ফিরে এলেও যে কোন একই তার চক্ষে বহু—সুন্দর-পিপাসা নিবারণ হয়ে গেলে সর্ব্ব ঘটে পূর্ণ সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠান হয়, বৈচিত্র্যের মায়া, নবত্বের মাদকতা আর থাকে না। সে মন আর ফুলে ফুলে

বেড়ায় না, যে কোন একটি পুষ্পপাত্রের মধু-মাধুরীতে মশগুল হয়ে যায়।

তোমার প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর আমি দিলাম না। এমন কি, তোমার প্রশ্নটি যে কি তা-ও আমি কোনখানে উল্লেখ করলাম না। তবু দেখ, ঐ প্রশ্নের প্রসঙ্গে আমার মনে কত কথা জেগেছে, এবং আশা করি, সে কথাগুলো এত দূরের কথা হ'লেও অবান্তর ব'লে মনে হবে না। তব সর্ব্বশেষে তোমার প্রশ্নেরই উত্তর হিসেবে আমি একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করলাম, তা এই যে, কামনার দিক দিয়ে মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম, যারা ফুল পেলেই সন্তুষ্ট, মধুর খবর এখনও পায় নি; দ্বিতীয়, যারা মধুর সন্ধানে ঘুরছে, এখনও পায় নি—তাই এক জায়গায় বসতে পারছে না; এবং শেষ, যারা মধুর সন্ধান পেয়েছে, আস্বাদও জেনেছে। যারা প্রথম শ্রেণীর—তারা জড়-প্রকৃতি; যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর—তারা বাঁধন-হারা; আর যারা তৃতীয় শ্রেণীর—তারাই স্বস্থানগত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

৩। আমার কাব্য-সাধনা

জগৎকে ও জীবনকে মহিমান্বিত করাই সকল কবিকর্ম্মের আন্তরিক প্রেরণা। এই রকম মহিমান্বিত করার দুটি উপায় আছে—(১) মানুষের জীবনের বা ভাগ্যের যে দিকটা মহান্ সেই দিকটাই কাব্যে প্রতিফলিত করা, (২) যা মহৎ নয়, অতিশয় সামান্য ও ক্ষুদ্র, তার মধ্যেও প্রাণধর্ম্মের মহিমা আবিষ্কার ক'রে দেখানো। এই দুই দিক ছাড়া সাহিত্যের আর

কোনও দিক নেই। কারণ, সাহিত্যে মানুষের আত্মার স্বাস্থ্য চাই—যার থেকে মানুষের প্রাণ সঙ্কুচিত হয়, সেই অতি নীচ, ক্ষুদ্র, নিষ্ঠুর ও কুৎসিত fact-গুলোকে অস্বীকার করা নয়, তাদের সংঘর্ষে মানুষকে সুন্দরতর মহত্তর দেখানো চাই। সেটা মিথ্যা রচনা নয়—সেইটাই সত্য কল্পনা। কারণ, মানুষের জীবন যেমনই হোক, তার অন্তরে অন্তরে অমৃতের কামনা আছে—এটা fact; যদিও এর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কোনও ব্যাখ্যা নেই। এই অমৃতের আকাঙ্ক্ষাকে যে মিথ্যা মনে করে, সে নিজেই স্বাস্থ্যহীন, বিকারগ্রস্ত রোগী।···

সত্যকার প্রাণধর্ম্মী মানুষ এই যথাপ্রাপ্ত জীবন ও জগতের মধ্যেই প্রাণের আশ্রয় চায়। এজন্য জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বৈরাগ্যও যেমন তার পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনই এই জগৎ ও জীবনকে অতিশয় সংকীর্ণ, অতিশয় ছোট ও হেয় ক'রে তার মধ্যেই মানুষের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ ক'রে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান মানুষের প্রাণ আশ্বস্ত হয় না। জীবনকে ভোগ করতে হ'লে মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধি করলে চলবে না, ক্রমাগত নিজ প্রাণের প্রসারের দ্বারা মৃত্যুকে জয় করতে হবে—অমৃতের আকাঙ্ক্ষাকে বলবৎ রাখতে হবে। হৃদয়দৌর্ব্বল্য যাতে দূর হয়, যাতে fact-কে সর্ব্বদা বৃহত্তর কল্পনার আবেগে অমৃতরসে সিঞ্চিত ক'রে নেওয়া যায়, প্রাণের সে শক্তি অটুট রাখা চাই।

আমার এখন যে এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে, তার থেকে প্রমাণ হয়, আমার প্রাণশক্তি ক'মে আসছে। আমার মনে হয়, এত দিন আমি নিজেও চলছিলাম, তাই এই চলমান জগৎটাকে 'চঞ্চলা' ব'লে মনে হয় নি; আজ হঠাৎ আমি থেমে গেছি, আমার চলা ফুরিয়েছে—তাই জগৎটাকে বড্ড বেশি চঞ্চল অনিত্য অস্থায়ী ব'লে মনে হচ্ছে। জীবন্তর

সঙ্গে মরন্ত আর পাল্লা দিতে পারছে না। তাই এই অবসাদ, এই বৈরাগ্য। কিন্তু এই জগৎ ও জীবনকে আমি কখনও ছোট ক'রে দেখি নি—এর বাইরে আর কোনখানে কোনও ভরসা আছে ব'লে বিশ্বাস হয় না। আজ যদি আমাকে বিদায় নিতে হয়, তা হ'লেও একেই প্রণাম ক'রে বিদায় নেব। এই দুঃখ থাকবে যে, এই অনন্ত রস-প্রস্রবণের কতটুকুই বা আস্বাদন করলাম!—যার এক কণাতেই সারাজীবন টলমল ক'রে উঠেছিল!

কিন্তু সহসা সব বন্ধন যেন খুলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, আমি আর তোমাদের কেউ নই! তোমরা জীবিত আমি মৃত।...তোমাদের বয়সই তোমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ও বয়সে আশা অপরিসীম, দুঃখও দুঃখ নয়—দুঃখের উত্তাপে প্রাণের বয়লারটা আরও বাষ্প সঞ্চয় করে, তার শক্তি বেড়ে যায়। সৌন্দর্য্যপুরীর রাজকন্যা গোপনে স্বয়ংবর-মালা গলায় পরিয়ে দেয়—তারই গর্ব্বসুখে দুনিয়ার কোনও দুঃখ একেবারে অভিভূত করতে পারে না! যত দুঃখ পাও, তত সেই নিভৃত বাসর-কক্ষে স্বপ্নাভিসারিণীর অধর-পীযূষ প্রাণটাকে গভীরতর আশ্বাসে আশ্বস্ত করে। ব্যথার সুরভি-ঘ্রাণে প্রাণ আকুল হয়, কানে যে নূপুর বাজতে থাকে, তার ছন্দটি ধরবার চেষ্টায় সব দুঃখ ভুলে যেতে হয়—এমনই ক'রে জীবনের কুড়ি বৎসর কাটিয়েছি। কম কি? আমি কবিতা লিখতাম আমার আনন্দে—সেই কবিতাই আমার রতিসম্ভোগ; আমার কাব্যলক্ষ্মীর অধর-সুধা—তার চেয়ে বেশি আমি কিছু চাই নি। যদি চেয়ে থাকি, তবে আমার সে প্রিয়তমাকে অপমান করেছি। তার চেয়ে বেশি কিছু যে চায়, সে কবি নয়,...অধিকাংশ কবিতা-লেখক কাব্যসুন্দরীর তোষামোদ ক'রে তার একটু কৃপাকটাক্ষ পেলেই ধন্য—

তাই নিয়ে তারা বাহিরে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য ব্যাকুল! কেউ বা চিরদিন courtship ক'রেই কাটালে। কিন্তু ওসব কিছু নয়, শুধু courtship বা তোষামোদ ক'রে একটু কৃপাকটাক্ষ পেয়েই যে সন্তুষ্ট, তার মত আত্মপ্রবঞ্চিত আর কেউ নেই। তার সঙ্গে গাঢ় মিলন চাই—একেবারে রতিসুখ! সেই ব্রহ্মানন্দের পরমক্ষণ না হ'লে কবিতা লেখা যায় না। কবিতার আসল definition এই—কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে আত্মার রতিসুখ-সম্ভোগকালে রসমূর্চ্ছিত মানবের দিব্যভাববিধুর গদগদ-ভাষ। কবিতা লেখার সময়টাই সেই পরমক্ষণ। তারপর আর সে সমাধির অবস্থা থাকে না। তখন সেই প্রিয়সম্মিলনের সুখস্মৃতি একটু ধ'রে রাখবার জন্য সেই কবিতা পড়ি, এবং পরকে পড়াতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যে সেই সত্যকার মিলন-সুখ ভোগ করেছে, সে আর কিছু চায় না; সে আবার সেই আনন্দই পেতে চায়—তার আত্মা সেই অপার্থিব সম্ভোগ-সুখ কামনা ক'রে 'নিশি নিশি শয়ন-রচনা' করে। যে সেই আনন্দের চেয়ে কবি-যশের জন্য লালায়িত, তাকে রাধিকার মুখে বৈষ্ণবকবির সেই ভৎর্সনা শুনিয়ে দিতে হয়। কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গোপনে রাত জেগে ভোরের সময় রাধিকার কাছে এসেছেন। চন্দ্রাবলী রাধিকার ঈর্ষ্যা বাড়াবার জন্যে ছল ক'রে দূতী পাঠিয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছে যে, তার যে নূপুরটি পাওয়া যাচ্ছে না, তা কি কৃষ্ণ প'রে এসেছেন? নূপুরটি তা হ'লে কৃষ্ণ যেন দূতীর হাত দিয়ে ফেরত পাঠান। তাই শুনে রাধিকা কৃষ্ণকে ভৎর্সনা ক'রে বললেন, "তুমি যে এমন ইতরের সঙ্গ কর, তা জানতাম না—ছি, ছি! কৃষ্ণহারা হ'য়ে নূপুরের জন্য লালায়িত!—এমন লোকের সঙ্গেও তুমি পীরিত কর!"—এখানেও ঠিক তাই। যে কাব্যলক্ষ্মীর অধর-সুধার চেয়ে নিজের কবিতার

শ্রুপাতা—যে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে যশোবঞ্চিত হওয়াটাই বড় দুর্ভাগ্য মনে করে, সে কি কম ইতর! তিনি যখন চুম্বন করেন, সেই চুম্বন-স্থখে প্রদীপ্ত আমার যে মুখ-জ্যোতি—যা আমি দেখতে পাই না, লোকে দেখে—তারই নাম যশ। সে জ্যোতির যদি কোন মূল্য থাকে, তবে সে এইটুকু মাত্র যে, সে আমারই স্থখের অকৃত্রিমতার প্রমাণ। সেই স্থখই যদি না রইল, তবে যশের মূল্যই বা কি, সার্থকতাই বা কি? বরং সে যশ চাই না, সেই স্থখ চাই—নিভৃত বাসরে সঙ্গোপনে সেই স্থখ আস্বাদন ক'রে মরজন্ম সফল করব, আমার মুখের সেই আনন্দজ্যোতি কারও দেখবার দরকার নেই। আজ আমি সেই স্থখ থেকে বঞ্চিত হয়েছি—যশে আমার কি প্রয়োজন?

কিন্তু চিঠি যে শেষ হয় না। এ আমায় কি যে পেয়ে বসেছে আজ! এর যেন শেষ নেই। লিখতে লিখতে প্রাণটা কেমন ক'রে উঠছে—বাইরে আকাশ অন্ধকার, কখনও ধারাবর্ষণ হচ্ছে, কখনও বৃষ্টিকণা চূর্ণ হয়ে ঝরছে, মাঠের পারে দূর বৃক্ষশ্রেণী কুয়াসায় আচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। নিঃশব্দ বৃষ্টি থেকে থেকে সশব্দ হয়ে উঠছে। বেলা বাড়ছে না, ঠিক একভাব আছে। বর্ষা আমার কখনও ভাল লাগে না। ভেবেছিলাম অমাবস্যা কেটে গেলে আকাশ একটু পরিষ্কার হবে। আজ প্রতিপদ, সে আশা দেখছি না। কিন্তু শীঘ্র আকাশে চাঁদের ফালি দেখতে পাব —মাঝে মাঝে অন্তত। চাঁদ চিরদিন আমার নির্জ্জন-বাসের সঙ্গী। ওর রূপ আর পুরানো হ'ল না।···বর্ষার অন্ধকারকে রঙিন ক'রে তোলে কিসে?—'A flask of Wine, a book of Verse. and Thou! 'Book of Verse' হ'লেই আমার চলবে, 'Flask of wine'-টা অধিকন্তু; আর শেষেরটি আমায় পক্ষে চিরদিনই গরহজম! তবে

Book of Verse-এর সঙ্গে একজন সম-প্রাণ শ্রোতা চাই—কবিত্বার নেশাই আমার একমাত্র নেশা। কিন্তু বর্ষার রাত্রি আমার ভাল লাগে। খুব অন্ধকার গভীর রাত্রি—আর অবিশ্রান্ত সশব্দ বর্ষণ। বাইরে থেকে যূঁই, বেল, হেনার গন্ধ—ঘরে মিটমিট করছে প্রদীপের আলো। জেগে থাকব না, ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে বর্ষারাত্রির অভিসার-সঙ্কেত শুনতে পাব। কিন্তু সে রকমটি এখানে হয় না। যত উৎপাত দিনের বেলায়—রাত্রে গুমোট। মনে হয়, এখানকার প্রকৃতিও অতিশয় অরসিক। এখানকার বর্ষায় একরাশ বকুল ফুল নিয়ে মালা গাঁথা, বা একরাশ ভিজে চুল নিয়ে কোন রকমে খোঁপা বাঁধা—যূঁইফুলের কেয়াফুলের গন্ধ, নীলাম্বরী—এ সব মনে পড়ে না। এ আমাদের মত ধূমিত-দশা দীপাধারের উপযুক্ত নির্ব্বাসন-স্থান।

শ্রাবণ, ১৩৩৭